গেরিল্লা যুদ্ধের নীতি ও রীতি

করুণা মুখার্জী

পুথিঘর

২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

ভবানী সেন

আব্দুল হালিম

ও

তুষার চ্যাটার্জ্জীকে

ভূমিকা

'গেরিল্লা যুদ্ধের নীতি ও রীতি' বইখানি প্রত্যেক স্বদেশ সেবকেরই পড়া উচিত।

জাপদস্যু বর্মার প্রান্তে সজ্জিত হচ্ছে সোনার বাংলার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়বার জন্য। দেশের ভিতর থেকে বিশ্বাস ঘাতক পঞ্চমবাহিনী তার জাপানী মনিবদের নির্দেশে দেশময় অরাজকতা সৃষ্টির জন্য উঠে প'ড়ে লেগেছে। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধ'রে এদেশে যে স্বাধীনতার সংগ্রাম গড়ে উঠেছে তা আজ বিপন্ন। জাপদস্যুদের বাংলায় ঢুকবার সাহস যদি কখনও হয়, তবে প্রত্যেক স্বদেশ সেবককেই দেশরক্ষার জন্য লড়তে হবে।

দেশরক্ষার জন্য আজ স্বদেশ প্রেমিকদের প্রধান কাজ জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা, পঞ্চমবাহিনীকে কোণঠাসা করা, সংকট সমাধানের জন্য ফসল বাড়ানো, উৎপাদন বাড়ানো এবং দুস্থদের জন্য খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা।

এই কাজের সঙ্গে 'গেরিল্লা যুদ্ধের নীতি ও রীতি' শিখে রাখা উচিত। এই বই খানিতে এ বিষয়ে যথেষ্ট শেখ্‌বার জিনিষ আছে। এই জন্যই পার্টির তরফ থেকে এই বইখানি অনুমোদন করা হয়েছে। আশা করি স্বদেশপ্রেমিক কর্মীরা, অন্ততঃ পক্ষে কমিউনিস্ট কর্মীরা এই বইখানি পড়বেন।

ভবানী সেন,
২৪৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

উপক্রমণিকা

১৯৪২-এর মে মাস, দিল্লীতে নিখিল-ভারত ছাত্র সম্মেলনে হাজির রহিয়াছি, শুনিলাম লাহোরে "গেরিল্লা যুদ্ধ" শিক্ষা দেওয়া হইবে, ইচ্ছা করিলে নাম লিখাইতে পারি। অধীর আগ্রহে নাম দিয়া বসিলাম।

লাহোর এফ সি. কলেজের সম্মুখে সুবিস্তীর্ণ ধূ ধূ মাঠ, সারি সারি প্রায় একশত খানি গৈরিক ও শ্বেত তাঁবু বিছাইয়া দিয়া তিন শতাধিক শিক্ষার্থী ছাত্র ও অধ্যাপক বৃন্দ সমাগত হইয়াছেন, কলম্বো হইতে জম্মু এবং বান্নু হইতে করিমগঞ্জ পর্যন্ত বিচিত্র ভাষাভাষী সকলে একত্রে কল-কল সুরু করিয়া দিয়াছে।

যতদূর সম্ভব কতক সামরিক কৌশল আয়ত্ব করা গেল। এই পুস্তকে ৩য় পরিচ্ছেদে যে সামরিক শিক্ষার বিষয় লেখা হইয়াছে এবং ৪র্থ ও ৫ম পরিচ্ছেদে যে যুদ্ধ-কৌশলগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছি, তাহার যাবতীয় বিষয়ই আমি লাহোরে শিখিয়াছিলাম।

তাহার পর বিগত দেড় বৎসর ধরিয়া রণ-কৌশল এবং বিশেষ করিয়া চীনা গেরিল্লাদের কীর্তি কাহিনী ও কার্যাদি সম্পর্কে যতগুলি পুস্তক ও রচনাবলী পাইয়াছি সেগুলি গিলিয়া খাইয়া এই সিদ্ধান্তেই আজ আমি উপস্থিত হইয়াছি যে, রাজনীতিই গেরিল্লা-যুদ্ধের মূলমন্ত্র। জাগ্রত দেশপ্রেম, নির্ভুল রাজনীতি জ্ঞান ও দেশরক্ষার কার্যে গণ-উদ্যমই গেরিল্লা যুদ্ধের প্রথম ও শেষ কথা। সামরিক শিক্ষা নিতান্তই প্রয়োজন, সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু তাহা গৌণ। আসল কথা হইল যে, প্রতি গ্রামখানিকে প্রতিরোধের দুর্গ এবং প্রতিটি গৃহকে ব্লক-হাউস-এ পরিণত করিবার বুকের পাটা থাকিলে তবেই গেরিল্লা যুদ্ধের কৌশলে "সুদীর্ঘ ও ব্যাপক গণ-প্রতিরোধ" (Total mass protracted resistance) সৃষ্টি করা সম্ভব। ভারতের বুকে একমাত্র জাতীয় সরকারই এই অবস্থা ঘটাইতে পারে।

এই পুস্তকে ভুল থাকিলে তাহার জন্য দায়ী আমি নিজে। 'পুথিঘর' কর্তৃপক্ষ এই পুস্তকখানি ছাপাইয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন।

কুষ্টিয়া টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, কুষ্টিয়া ছাত্র-ফেডারেশান, বিশেষতঃ শ্রীমান সত্যেন সরকার; কুষ্টিয়া জিমন্যাসিয়াম ক্লাব ও ইহার সেক্রেটারী বন্ধুবর রামগোপাল চৌধুরী প্রভৃতির নিকট হাতে-কলমে নানা বিষয়ে সাহায্য পাওয়ায় পুস্তকখানি রচনা করা সম্ভব হইয়াছে। বহু গ্রন্থকারের সাহায্য লইয়াছি, পুস্তক পঞ্জিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে।

লাহোরে গেরিল্লা শিক্ষা আমার সামরিক জ্ঞানের পটভূমিকা; ভবানী সেন এবং বিশ্বনাথ মুখার্জি আমার রাজনীতিজ্ঞানের অঙ্গনে পায়ে-পায়ে বেড়াইয়া মনের খোরাক যোগাইয়াছেন; কুষ্টিয়ার শ্রমিক, কিষাণ, ছাত্র ও পার্টি কর্মীরা আমার নির্দেশে সকাল-বিকালে প্যারেড করিয়া, কতদিন কতরাতে কত নিঃশব্দ উত্তেজনায় নৈশ অভিযান ও যুদ্ধের নকল মহড়ায় নামিয়া আমার সীমাবদ্ধ রণনীতির শিক্ষাকে বাস্তবক্ষেত্রে যাচাই করিবার সুযোগ দিয়াছেন।

কলিকাতা
৩০ শে জুলাই:
১৯৪৩

করুণা মুখার্জী

সূচী-পত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

গেরিল্লা (Guerrilla) কাহাকে বলে ?

যাহারা যোদ্ধা তাহাদিগকে যুদ্ধ বিষয়ে কতকগুলি আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন মানিয়া পরস্পর লড়াই করিতে হয়। ১৮৯৯ সালে "হেগ্ সম্মেলনে" আলোচনার ফলে ঠিক হইয়াছিল যে, সেই যুদ্ধই আইনসম্মত বলিয়া গণ্য হইবে যাহা পরিচালনা করিতে যাইয়া যোদ্ধারা (১) নিজেদের পরিচয় (identity) গোপন করিবে না এবং তদুদ্দেশ্যে প্রত্যেকে সুনির্দিষ্ট চিহ্ন বা ব্যাজ ব্যবহার করিবে: (২) কোনও দায়িত্বশীল নেতার অধীনে সকলে পরিচালিত হইবে; (৩) প্রকাশ্যে অস্ত্রশস্ত্রাদি বহন করিবে; এবং (৪) যুদ্ধের সময়ে লড়াইয়ের প্রচলিত আইনকানুন বা রীতি-পদ্ধতি মানিয়া চলিবে। শত্রুর হঠাৎ আগমনে যদি সাজিয়া গুজিয়া, নেতা নির্বাচন করিয়া, নিয়মিত বা সুশৃঙ্খলভাবে বাধা দিবার অবকাশ না মিলে, তবে অন্ততঃপক্ষে পূর্বোক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ নিয়ম দুইটিই মানিয়া চলিতে হইবে।

নেতার অধীনে পরিচালিত হইলেও গেরিল্লা যোদ্ধারা ইহার আর কোন নিয়মই মানিয়া চলে না। গেরিল্লারা সম্মুখ সমর এড়াইয়া চলে। সুযোগ বা সুবিধাই হইল তাহাদের কাযের নিয়ামক; ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারাই হইতেছে তাহাদের মূলমন্ত্র; আত্মগোপন করাই তাহাদের রীতি এবং ব্যাজ ও 'ইউনিফরম্' বা যুদ্ধের পোষাকের পরিবর্তে সাধারণ গৃহস্থের পোষাক—এমন কি প্রয়োজন হইলে, শত্রুকে ঠকাইবার উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশ পরিধান করাও তাহাদের নিজস্ব একটি কৌশল। গেরিল্লা যুদ্ধ মূলতঃ বে-আইনী যুদ্ধ। গেরিল্লারা সর্বদাই নেতার অধীনে পরিচালিত হয় এবং একান্ত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কায করে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে পরস্পরের

সম্পর্কটি একেবারে ভাই-ভাইএর সম্পর্ক—চিরাচরিত প্রথায় গুরুশিষ্য বা নেতা-অনুচর অথবা কম্যাণ্ডার-প্রাইভেট ইত্যাকারের সম্পর্ক নহে। তাহারা কখনও দলবদ্ধ হইয়া, কখনও বা একাকী, কিংবা কখনও খণ্ড, বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে নিজের উদ্যোগে (initiative) দুষমণকে ঘায়েল করিতে রত থাকে।

কিন্তু, 'গেরিল্লা' কথাটির অর্থ কি? শব্দতত্ত্বের দিক দিয়া দেখা যায় স্পেন দেশীয় "guerra" শব্দটির অর্থ হইল "যুদ্ধ"। এই 'guerra' শব্দের diminutive বা ক্ষুদ্রতা-বোধক শব্দ হইল "guerrilla" ("খণ্ডযুদ্ধ")। শব্দটি 'গোরিল্লা' (gorilla) বা 'গরিলা' নহে, ইহা দ্বারা 'বন মানুষ' বা আফ্রিকার গভীর জঙ্গলের বৃহদাকার বানর বুঝাইয়া থাকে না। তবে উচ্চারণের সুবিধার জন্য বাংলা দেশে "গরিলা" শব্দটিরই ইতিমধ্যে প্রচলন হইয়া গিয়াছে।

'গেরিল্লা' কথাটির প্রচলিত অর্থ হইল, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া অনিয়মিত (irregular) ও অতর্কিত (surprise) ভাবে শত্রুকে আক্রমণ করা। অথচ, সম্মুখ-সমর তাহাদিগকে সর্বদাই পরিহার করিতে হইবে। আক্রমণাত্মক যুদ্ধ অবশ্য গেরিল্লা যুদ্ধের প্রধান বিশেষত্ব—হঠাৎ আঘাত করিয়া আহত হইবার পূর্বেই পলায়ন করা বা আত্মগোপন করা গেরিল্লা বা গেরিল্লাযোদ্ধাদের রীতি। কিন্তু মাঝে মাঝে সুনির্দিষ্ট ঘাঁটি স্থাপনা ও সেগুলিকে রক্ষা করা এবং দরকার হইলে স্থানান্তরিত করাও এই যুদ্ধে একান্ত প্রয়োজনীয়। ১৯৩৫-৩৬ সালে চীনা গৃহ বিবাদের যুগে দক্ষিণ-পূর্ব চীনের গেরিল্লাবাহিনীর নেতা হ্যান-ইং নিজের অভিজ্ঞতার কথা যাহা বলিয়াছেন এখানে তাহার উল্লেখ করা অবান্তর হইবে না: "আমরা আমাদের বাহিনীকে নিতান্ত ছোট ছোট দলে ভাগ করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিলাম এবং আমাদের ঘাঁটিগুলি আগলাইবার কল্পনা একেবারেই ত্যাগ করিয়া শত্রুর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রবাহিনী-গুলির উপরে আচম্বিতে দ্রুত আক্রমণের কৌশল অবলম্বন করিলাম। এই উপায়ে কোনো গতিকে আমরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাইয়া চলিলাম বটে, কিন্তু কোনও সুনির্দিষ্ট ঘাঁটি না থাকিবার ফলে আমাদের অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া আসিল।" (Edgar Snow : Scorched Earth, pp. 128-29).

শত্রুকে পর্যুদস্ত করা ও ব্যতিব্যস্ত রাখা, তাহার রসদ, গোলাবারুদের ঘাঁটি ও যানবাহনের গতিবিধিকে নষ্ট ও ধ্বংস করিয়া দেওয়াই গেরিল্লাবাহিনীর উদ্দেশ্য। মুষ্টিমেয় লোক, এমন কি দুই অথবা একজন লোকও এই উদ্দেশ্য সাধনে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। কিন্তু দলে পুষ্ট হইলে জোরালো আক্রমণের সুবিধা হয় এবং শত্রুর পার্শ্বদেশ (flank) বা পশ্চাৎভাগে (rear) পরিকল্পনা অনুযায়ী গতিশীল যুদ্ধ (planned mobile warfare) চালানো সম্ভব হয়, এবং কৌশলী যুদ্ধেও (manoeuvring battle) সাফল্যের সম্ভাবনা থাকে।

সাধারণতঃ স্বদেশে শত্রুর অধিকৃত স্থানে তাহাকে পশ্চাৎ হইতে তড়িৎগতিতে আক্রমণ করিয়া প্রতিনিয়ত ব্যস্ত রাখা হইল গেরিল্লাদের কাজ। শত্রুকে কখনও নিশ্চিন্ত কায়েমী হইয়া এদেশে বসিতে দিব না, বরং তাহার দুর্বল জায়গায় বারে বারে আঘাত করিয়া তাহাকে হীনবল করিয়া দিব ; অধিকৃত প্রদেশগুলিতে যাহাতে সে আহার ও বাসস্থান না পায় তাহার জন্য নিজেদের জিনিষপত্র, ধানচাল ইত্যাদি সরাইয়া, প্রয়োজন হইলে গ্রামকে গ্রাম পুড়াইয়া অন্যত্র সরিয়া আশ্রয় লইব এবং সেখান হইতে যোগাযোগ রাখিয়া সুযোগের মুহূর্তে শত্রুকে তাহার চলিবার রাস্তায় বা স্থাপিত স্বকীয় শিবিরে নির্মম আঘাত করিব—ইহাই গেরিল্লা যুদ্ধের কৌশল (tactics).

দেশের যে অংশগুলি এখনও শত্রুর কবলে যাইয়া পড়ে নাই সেখানেও গেরিল্লাবাহিনী গড়িয়া দেশের বৃহত্তর ও প্রধান স্থায়ী সেনাবাহিনীর দোসর হিসাবে আগুয়ান শত্রুসেনার উপরে অপ্রত্যাশিত ভাবে আক্রমণ করিয়া ভীতিবিহ্বল ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে ; অথবা কৌশলী সংগ্রামে পথ ভুলাইয়া শত্রুকে দেশীয় সেনাবাহিনীর ফাঁদে আনিয়া ফেলা চলিতে পারে। চীনের "নিউ ফোর্থ আর্মী" ১৯৩৮-৩৯ সালে কিয়াংশি-অ্যানহুই-চেকিয়াং সীমান্তে ও ইয়াংসী নদীর উত্তরে "সম্মিলিত ফ্রন্টের" (United Front) উদ্যোগে এবং কেন্দ্রীয় চীনা সরকারের আজ্ঞাধীনে প্রধানতঃ এই প্রকারের যুদ্ধই চালাইয়াছিল। (Epstein : Peoples' War, Ch. XI).

সাধারণ যোদ্ধা ও গেরিল্লা যোদ্ধার মধ্যে প্রভেদ কি ?

দুই জনেই শত্রুর ধ্বংসের কাজে আত্মনিয়োগ করে, কিন্তু সাধারণ যোদ্ধার মত গেরিল্লারা মাহিনাভোগী হইয়া, মাসের পর মাস কুচকাওয়াজে ব্যস্ত থাকিয়া, পরে মাঠে মাঠে তাঁবু খাটাইয়া সর্বক্ষণ যুদ্ধরত থাকে না। ট্রেঞ্চ-কাটা বিরাট প্রান্তর, সাঁজোয়া গাড়ী, অগণিত কামান, বিমান, ট্যাঙ্ক, হাজারে হাজারে গুলিগোলা, রসদের সুপ্রচুর সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি চোরা গেরিল্লার কিছুই নাই! সে শত্রুর "শিল-নোড়া কাড়িয়া" তাহারই "দাঁতের গোড়া" ভাঙিয়া থাকে। সে গ্রামে-ঘরে, বনে-জঙ্গলে, পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে সর্বত্র ছড়াইয়া থাকে; গ্রামের লোকেরাই তাহার যোগায় আহার। গ্রামবাসীদের মধ্যে দশের একজন হইয়া, তাহাদের নিতান্ত সাধারণ সুখ-দুঃখের অংশী হইয়া, নানা উপায়ে জনসাধারণের কল্যাণমূলক কাজে রত থাকিয়া, তাহাদের স্নেহ, দরদ ও ভালবাসার অধিকারী হইয়া গেরিল্লারা নিজের কাজ করিয়া থাকে। জনসাধারণকে শত্রুর বিরুদ্ধে অনুপ্রাণিত করা এবং তাহাকে আঘাত করিবার জন্য দেশাত্মবোধের ভিত্তিতে তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া তোলা গেরিল্লার কর্তব্যের একটি বৃহৎ অংশ। যে-গ্রাম বা নগর শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইবে মনে হয়, আগে-ভাগে সেখানকার মেয়ে ও শিশুদের স্থানান্তরিত করা এবং আহার্য দ্রব্যাদি লুকাইয়া পুঁতিয়া ফেলিবার কাজে গেরিল্লারা জনসাধারণকে সহায়তা করিবে। সকলে মিলিয়া হয়ত গ্রাম ছাড়িয়া সুদূর বনে আশ্রয় লইল এবং সময় বুঝিয়া সদলে অতর্কিত আক্রমণ করিয়া শত্রুর আহার ও গোলাবারুদ বন্দুক প্রভৃতি যাহা পাইল লইয়া পলাইল।

সাধারণ যোদ্ধা শুধু লড়িয়াই দায়মুক্ত; কিন্তু গেরিল্লার কর্তব্য সুকঠোর: এক হাতে শত্রুকে আঘাত হানিতে হইবে; আর এক হাতে নিদ্রিত, ভীত, নিশ্চেষ্ট বা দ্বিধাগ্রস্ত দেশবাসীকে জাগাইয়া তুলিয়া দলে টানিতে হইবে। দল পুষ্ট হইলে তখন সহস্র হস্তে শত্রুকে অবশ্য রোখা চলিবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা, দেশপ্রেম, সমাজ-প্রীতি অতি ক্ষীণভাবে মনের কোণে ঘুমাইয়া থাকে; অনেকে আবার জানিয়া শুনিয়াই দেশদ্রোহী বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন

অথবা প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া থাকেন। এই সব লোকের চিন্তার ও কাজের মোড় ঘুরাইয়া দলে টানিয়া আনা বড় কম কথা নহে। তাই গেরিল্লা যুদ্ধকে একটি প্রগতিশীল "আন্দোলন" বলা চলে। এ যেন দু-ধার তলোয়ার, একদিকে শত্রুকে নিঃশেষ করে, আবার অন্য দিকে দেশবাসীর অজ্ঞতা, শৈথিল্য ও জড়ত্বের বন্ধনকে খণ্ডিত করে। দেশপ্রেমের আদর্শে সাধারণ কার্যপদ্ধতির মধ্য দিয়া গেরিল্লা দল জনগণের সঙ্গে এক হইয়া মিশিয়া যায় এবং শত্রুর সম্মুখে দেশব্যাপী সর্বাত্মক প্রতিরোধের প্রাচীর তুলিয়া ধরে। ফলে, অধিকৃত প্রদেশে শত্রু কখনই শিকড় গাড়িয়া বসিতে বা সামরিক জয়ের সুবিধাগুলি ভোগ করিতে পারে না। অর্থাৎ এদেশে সে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে নিজের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিয়া পরাজিত জাতির উপর শোষণকার্য চালাইতে পারে না। কেননা, বিপ্লবী জনগণ শত্রুর সেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে কখনই মানিয়া লয় না। ইহাই হইল গেরিল্লা যুদ্ধের নীতি (Strategy)। মহাচীনের দিকে দৃষ্টিপাত করুন: সমগ্র ভূখণ্ডের প্রায় অর্দ্ধাংশ এতদিনে জাপানী দস্যুর করতলগত হইয়াছে। কিন্তু সেই বিজিত প্রদেশগুলিকে সত্যই কি সে "জয়" করিতে পারিয়াছে? আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় চীন বুঝি শেষ হইতে চলিল! কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হইল যে, অধিকৃত স্থানেও জাপানী-গুণ্ডারা শিকড় গাড়িতে পারে নাই শুধু বীর চীনা গেরিল্লাদের অবিরত আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের ফলে। নিজের অক্ষমতার কলঙ্ক ঢাকিবার জন্য জাপানীরা বিজিত চীনের স্থানে স্থানে এক একটা দর্শনধারী শাসনব্যবস্থা দেশদ্রোহী চীনাদের দিয়া খাড়া করিয়াছে। কিন্তু এই প্রকার বিভীষণের দলেরও রক্ষা নাই; জাপানী বেয়োনেট পরিবেষ্টিত থাকিয়াও দেশীয় গেরিল্লাদের হাত হইতে তাহারা রেহাই পায় না।

কোন্ উপায়ে গেরিল্লা যুদ্ধের উদ্ভব হয়?

যে দেশে সাধারণ যোদ্ধারা মাহিনার লোভ ছাড়িয়া দেশপ্রীতিহেতু শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িতে থাকে এবং যেখানে সেই সেনাবাহিনীর পিছনে জনমতের সমর্থন

আছে—এমন দেশে গেরিলা বাহিনীর উদ্ভব খুবই সহজ হইয়া থাকে। শত্রু-পরিবেষ্টিত হইলেই যোদ্ধারা অস্ত্র ত্যাগ করিয়া শত্রুর শিবিরে বন্দী হইয়া ধরা দেয় না; অস্ত্রশস্ত্র লুকাইয়া সাধারণ গৃহীর পোষাক পরিয়া গ্রামে ঘরে দশজনের মধ্যে নিবিড়-ভাবে মিশিয়া যায়—যেন কোন কালে যুদ্ধ সে করে নাই। কোন সময় বা বনে জঙ্গলে পাহাড়-পর্ব্বতের গুহায় আশ্রয় লইয়া গোপনে গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। গ্রামবাসীরাও সকল প্রকারে ঐ লুক্কায়িত সৈনিককে সাহায্য করে এবং পরিবর্তে তাহার নিকট হইতে যুদ্ধের কৌশল শিখিয়া লইয়া তাহাকে সামরিক নেতা হিসাবে মানিয়া নিজেদের উদ্যোগে স্থানীয় গেরিল্লাদল গঠন করে।

আবার ইহাও হইতে পারে যে, দেশের স্থায়ী সৈন্যবাহিনী সম্মুখ সমরে শত্রুকে রুখিতেছে বা রুখিবার চেষ্টা করিতেছে, অথচ গেরিলা যুদ্ধ কখনও করে নাই বা করিবার কৌশল শিখে নাই। এহেন সৈন্যদল শত্রু-পরিবেষ্টিত হইলে আর রক্ষা পায় না এবং তাহার ফলে দেশের সামরিক শক্তি ক্ষীণতর হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় দেশপ্রেমিক নরনারী, যাহারা নাম লেখাইয়া ঘরবাড়ী ছাড়িয়া সৈন্যদলে যোগ দেয় নাই, অথচ যাহারা দেশকে অসহায় শত্রুর হাতে চলিয়া যাইতেও দিতে চাহে না, তাহাদের কর্তব্য সুস্পষ্ট। তাহারা দেশরক্ষার তাগিদে নিজেদের উদ্যোগে কোমর বাঁধিয়া আগাইয়া আসে, দল বাঁধে, ঘাঁটি তৈয়ারী করে, সামান্য কুচকাওয়াজ—যাহা দল বাঁধিয়া চলাফেরা করার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় তাহা শিখিয়া লয়; হাতের কাছে যে হাতিয়ার পায় তুলিয়া লয়, মেয়ে-পুরুষ ছেলে-বুড়া সকলকে রাজনৈতিক চেতনায় জাগাইয়া তোলে। তাহারা নিয়মিত খোঁজখবর রাখে—কোন্খানে আমাদের সৈন্যের শত্রু-পরিবেষ্টিত হইয়া পলাইবার পথ পাইতেছে না, তাহাদের কাছে গিয়া আশ্বস্ত করে, বলে, আমরা আছি, তোমাদের ভয় কী? তুমি শত্রুর হাতে ধরা দিও না। আমরা তোমাকে খাওয়াইব, সেবা শুশ্রূষার ভার লইব, গৃহে আশ্রয় দিব, শত্রুর চোখের আড়ালে লুকাইয়া রাখিব। তুমি আমাদিগকে রাইফেল ছুড়িবার কায়দা ও সামরিক নিয়মকানুন শিখাইয়া আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ

কর, আমরা এক হইয়া দুষমণকে রুখিব ; এদেশ আমাদের, অপরের হাতে চলিয়া যায় তাহা সহিব কেমন করিয়া ? এমনি করিয়া গেরিল্লা দল গড়িয়া উঠে।

এমন কি যদি এই প্রকার শত্রুকবলিত দেশী সৈন্যের সন্ধান ও সহযোগিতা নাও মিলে, তবুও, জাগ্রত জনগণ দেশরক্ষার প্রয়োজনে, নিজেদের ঘরবাড়ী ও মাবোনের সম্মান বাঁচাইবার তাগিদে আগাইয়া আসিয়া দলে দলে দিকে দিকে গেরিল্লা বাহিনীর সৃষ্টি করিতে পারে।

গেরিল্লা যুদ্ধের প্রয়োজন কখন হয় ?

যখন সামরিক শক্তি - সুসজ্জিত বিরাট সেনাবাহিনী, ট্যাঙ্ক, বোমারু বা জঙ্গী বিমান, গোলাগুলি ইত্যাদি—তত সুপ্রচুর নহে, সেইক্ষেত্রে সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুকে হঠাইয়া দেওয়া অসম্ভব। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রশক্তি ছিল মারাঠা নৃপতি শিবাজীর। ঔরঙ্গজীবের সুসম্পন্ন সামরিক শক্তির তুলনায় তাহা নিতান্ত হীনবল। বাধ্য হইয়া গেরিল্লা যুদ্ধের নীতি ও কৌশল শিবাজীকে অবলম্বন করিতে হইল। চীনেও অনেকটা তাহাই ঘটিয়াছে। ১৯৩৭ সালে যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে দেখা গেল চীনাদের সমর-সম্ভার জাপানের মত আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুসজ্জিত শক্তির কাছে অতি নগণ্য। কাজেই চীনের সম্মিলিত জনশক্তি ঘাঁটি গড়িয়া সামনাসামনি সুপরিকল্পিত বড় বড় লড়াইগুলি যতদূর সম্ভব এড়াইয়া কোন প্রকারে ঠেকাইতে ঠেকাইতে শত্রুর অগ্রগতিকে মন্দীভূত করিয়া আনিল এবং একই সময়ে পিছন হইতে শত্রুকে প্রতিনিয়ত উদ্‌ব্যস্ত রাখা এবং "হাতে যতো না পারি" তাহার চেয়ে "ভাতে মারিবার" গেরিল্লা-কৌশল গ্রহণ করিল। (Edgar Snow : Scorched Earth, p. 47).

কিন্তু রাশিয়া তো বিপুল সমরসম্ভার রচনা করিয়াছে ; তবে সেখানে গেরিল্লা যুদ্ধের খবর পাই কেন ? আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। আধুনিক যুদ্ধের প্রকৃতি যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, বর্ত্তমানে এই ব্যাপক সর্বাত্মক যুদ্ধে জয়লাভ শুধু স্থায়ী সেনাবাহিনীর সাহায্যে সম্ভব নয় : আজকাল

ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় প্রকারান্তরে অন্ততঃ শতকরা ৯৫ জন লোক যুদ্ধের আওতায় জড়াইয়া পড়িতেছে। আগে রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হইত। মুষ্টিমেয় অনুগত বা তাঁবেদার ভাড়াটিয়া লোক নিয়া রাজা বা সেনাপতি উন্মুক্ত প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ করিতেন। প্রথমে একদফা বাক্‌যুদ্ধ হয়ত ঘটা করিয়া চলিল; তাহার পরে হয়ত একটি গদার আঘাতে এক সেনাপতি অপরকে ঘায়েল করিয়া বিজয় ডঙ্কা বাজাইয়া দিলেন; ভাড়াটিয়া সেনারা বিজিত সেনাপতির বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাহার দলে মাহিনাভোগী সৈনিক হিসাবে যোগ দিল অথবা ঘরে ফিরিয়া গেল। মাথায় ভিন্ন রঙের পাগড়ী পাল্টাইয়া পেয়াদা বা বরকন্দাজ আসিয়া গ্রামের "মণ্ডল" বা "মোড়ল"কে জানাইয়া গেল যে, আজ হইতে এই এলাকা পরমপূজ্য-পাদ প্রজাধিপ নরপতি শ্রীশ্রীঅমুকেশ্বরের রাজত্বাধীন হইল, সেইমত বিহিত করিবে—অর্থাৎ খাজানাদি দিবে! ইহাতে জনসাধারণের কিছুই আসিয়া গেল না; মনিব বদলাইল মাত্র। "রাজার" যুদ্ধে "উলুখাগড়া" রক্ষা পাইল।

কিন্তু আজ কৃষিশিল্প, বাণিজ্যব্যবসায়, লাভলোকসানের হিসাবনিকাশ, জমিজমা, ঘরবাড়ী ইত্যাদি জীবনযাপনের বহুপ্রকার সুযোগসুবিধাগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। আমি আমার ধনসম্পত্তি লইয়া যে দেশ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে কালযাপন করি, সে-দেশ ও রাষ্ট্র শত্রুর হস্তগত হইলে আমার সম্পত্তির উপরে—আমার জীবনযাত্রার উপরে—বিজেতার জুলুম আসিয়া পড়িবে; অতএব কেমন করিয়া এ দেশ না রক্ষা করিয়া পারি? বিশেষতঃ আজ স্বায়ত্ত-শাসনের যুগ; আমার দেশের উপরে আঘাত মানে আমারই উপরেই আঘাত আসিয়াছে—সে আঘাত মাথা পাতিয়া, বুক পাতিয়া লইতে হইবে। সুতরাং যুদ্ধ ব্যাপক হইয়া দাঁড়াইল। দলে দলে লোকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিল; চাষী মাঠে মাঠে অতিরিক্ত চাষ করিয়া যোদ্ধার রসদ যোগাইল; উপরি খাটিয়া কলকারখানার শ্রমিকেরা রাইফেল, বুলেট, ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে থরে বিথরে পাঠাইতে লাগিল।

ইহার চেয়েও বড় কথা, আজ পঞ্চম বাহিনী বা বিভীষণবাহিনী বলিয়া দেশদ্রোহী

একদল লোক শত্রুর মাহিনাভোগী হইয়া প্রত্যেক দেশেই বাস করে। তাহারা নানা কিছু গুজব রটাইয়া দেশের লোকের মন দুর্বল করিয়া দেয় এবং নানা উপায়ে রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা আনিয়া ফেলে এবং অতি কৌশলে দেশের লোকের বিশ্বাসভাজন হইয়া দেশরক্ষার গোপন তথ্য সংগ্রহ করিয়া শত্রুকে জানাইয়া থাকে; আর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শত্রুর গুণ গাহিয়া, তাহার মহত্ত্ব প্রচার করিয়া দেশের লোকের মনোভাব শত্রুর অনুকূল করিয়া তোলে। এই সব শয়তানদের মুখবন্ধ করিতে পারে দেশের লোকেরাই—প্রতি-প্রশ্ন করিয়া, সন্দেহ হইলে পুলিশে খবর দিয়া ধরাইয়া দিয়া। শত্রুর এই পঞ্চম বাহিনীকে নির্মূল করিতে হইলে জনসাধারণের সহযোগিতা আবশ্যক। শত্রু যাহাতে আমাদের ঘরের খবর ঘুণাক্ষরেও না পাইতে পারে তাহার জন্য সকলকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। ইহাই সামগ্রিক যুদ্ধের (Total War) প্রথম কথা।

কিন্তু আরও বড় কথা এই যে, আধুনিক যুদ্ধের আক্রমণ-কৌশল—যাহা ফ্যাশিষ্ট শত্রুরা অবলম্বন করিয়াছে—তাহা সম্পূর্ণ অভিনব। ইহাকে বলা হয় "tactics of infiltration" বা অনুপ্রবেশ রীতি। ব্যাপারটি এইরূপ: শত্রু-ব্যূহ ভেদ করিতে হইবে, কিন্তু সমস্ত সামরিক শক্তিকে একত্রিত করিয়া সজোরে শত্রুর ঘাঁটিতে ঝাঁপাইয়া পড়িবে না; এবং শত্রু-ব্যূহের দুর্বল অংশগুলি খুঁজিয়া বাহির করিয়া আস্তে আস্তে অলক্ষ্যে একই সময়ে বহুস্থানে মাথা গলাইয়া ক্রমশঃ শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে বহুদূর ঢুকিয়া অতর্কিতে অপ্রত্যাশিত আক্রমণ করিয়া তাহার মনঃশক্তি (morale) এবং সঙ্গে সঙ্গে রসদ, বারুদ, তেলের ঘাঁটি ও চলাচলের রাস্তাঘাট নষ্ট করিবে। এই অভিযানের প্রথমের মহড়ায় অনেকগুলি দল বিপক্ষের দ্বারা নিশ্চিহ্ন হইবে। হউক! কিন্তু তাহার পিছনে দলের পরে দল, আরও দল, যেন পিপীলিকার শ্রেণীর মত 'পিল্‌পিল্' করিয়া ঢুকিতে থাকিবে। এবং তাহাদেরই পিছনে সুসজ্জিত বিরাট ট্যাঙ্ক বাহিনী, মোটোরাইজ্‌ড্ পদাতিক দল ডাইভ্ বম্বারের সাহায্যে পথ প্রশস্ত করিয়া সাঁড়াশীর চাপের মতই ভিতরে ঢুকিতে থাকিবে এবং শত্রু সৈন্যকে ঘেরিয়া ফেলিবে। এ যেন 'সূঁচ্' হইয়া ঢুকিয়া 'ফাল্' হইয়া বাহির হওয়া!

কিন্তু এই 'সূঁচ' 'ফালে' পরিণত হইতে পারে না, যদি স্থায়ী যোদ্ধাদের ন্যায় দেশবাসীরা সকলেই সজাগ থাকে। যেই দেখা কয়েকজন শত্রু সৈন্য ছড়াইয়া পড়িয়া আমাদের ব্যূহ পার হইয়া দেশের অভ্যন্তরে আগাইয়া আসিয়াছে, অমনি গলা টিপিয়া মারো। ইহার অর্থ এই যে, যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর সহায়ক স্বরূপ দেশের ভিতরে প্রতিটি লোকালয়ে শতকরা অন্তত: ২০।২৫ জন লোক আধা-সৈনিক আধা-গৃহস্থ হইয়া নিয়ত অবস্থান করিবে। তাহারা সামান্য কিছু কুচকাওয়াজ, অস্ত্র ব্যবহারের সামান্য কিছু কৌশল এবং মোটামুটি দলবদ্ধভাবে কাজ করিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি জানিয়া রাখিবে। শত্রু যতদিন না আসিতেছে ততদিন গৃহস্থ হিসাবে, গ্রামবাসী হিসাবে যাহা দৈনন্দিন করণীয় তাহা করিতে থাকিবে; কিন্তু শত্রু আসিলেই তাহাকে রুখিবে, মারিবে বা পর্যুদস্ত করিবে। যুদ্ধের techniqueএর দিক দিয়া বলিলে ইহারই নাম 'জনযুদ্ধ' বলিতে হয়। বিলাতে অবশ্য প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে দৃঢ় করিবার জন্য 'হোম গার্ড' গঠন করা হইয়াছে; কিন্তু গেরিল্লা বাহিনীর আসল যুদ্ধকৌশল হইল আক্রমণাত্মক—অধিকৃত এবং অনধিকৃত স্থানে, শত্রুর পার্শ্বে, পশ্চাতে, সর্বদিকে যেমন করিয়াই হউক আক্রমণ করিয়া শত্রুকে কমজোর করিতে হইবে। কাজেই শত্রুর tactics of deep infiltration বা attack in depth কৌশলের একমাত্র উত্তর জনবাহিনী সৃষ্টি করা। এই জনবাহিনীর পুরোভাগে থাকিবে গেরিল্লা বাহিনী। গেরিল্লাবাহিনী ও জনবাহিনী উভয়ে মিলিয়া দেশের অভ্যন্তরে যে প্রতিরোধের সৃষ্টি করে তাহারই নাম Defence in depth। মূলকথা, আমাদের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে স্বদেশের গভীর অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত দেশরক্ষার ব্যবস্থা সর্বত্রই বিস্তৃত থাকিবে—যাহার ফলে আগুয়ান শত্রু সৈন্য প্রতি পদে বাধা পায়। কিন্তু বাধা দেওয়ার আধুনিক কৌশল হইল প্রতি-আক্রমণ (counter-attrck), তাই দেশরক্ষা করিতে হইলে ট্রেঞ্চ গড়িয়া বসিয়া না থাকিয়া সদাই মারমুখী হইতে হইবে। আর ইহাই হইল গেরিল্লা যুদ্ধের কৌশল। গেরিল্লা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইতে চায় না, শত্রুকে শুধু আক্রমণই করিতে চায়।

গেরিল্লা যুদ্ধের সাফল্য কিসের উপর নির্ভর করে ?

(১) গেরিল্লারা যতবেশী দুর্ধর্ষ, কৌশলী এবং সুশৃঙ্খল হইবে তত বেশী দ্রুত ও কার্যকারী ভাবে তাহারা শত্রুকে পর্যুদস্ত করিতে পারিবে। এইজন্য প্রয়োজন, যাহারা গেরিল্লা যুদ্ধ করিবে তাহাদের অনমনীয় বিপ্লবী মনোভাব যেন সর্বদাই জাগ্রত থাকে। দেশাত্মবোধ, আদর্শানুরক্তি এবং রাজনৈতিক চেতনাই এই প্রকার মনোভাবের একমাত্র ভিত্তি। যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যাহার ধারণা যত সুস্পষ্ট সে ততখানি সাহসের সঙ্গে দেশরক্ষার কাজে আগাইতে পারে।

(২) Self-discipline বা স্বতস্ফূর্ত নিয়মানুবর্তিতা গেরিল্লা বাহিনীর প্রধান অবলম্বন! সামরিক কড়াকড়ির ফলেই ইহা জন্মে না। কর্তব্য বিষয়ে যে সচেতন তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া কাজ করাইতে হয় না। তাই কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতাই সব চেয়ে বড় কথা।

(৩) Personal Initiative বা নিজস্ব উদ্যোগ: গেরিল্লা নেতা তাহার আয়ত্তাধীন সৈনিকের ব্যক্তিত্ব এবং স্বাধীন চিন্তাকে খর্ব করিবেন না। গেরিল্লা যুদ্ধে আদেশ নির্দেশের দৃঢ় গণ্ডী বাঁধিয়া যোদ্ধাকে মেসিনে পরিণত করা হয় না। ফলে সংকটময় অবস্থা বিশেষের সম্মুখীন হইয়াও গেরিল্লা যোদ্ধা কখনই বিহ্বল বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে না। তার পর, বলিষ্ঠ দেহ ও কষ্টসহিষ্ণু না হইলে কাযতঃ গেরিল্লা যোদ্ধা হওয়া যায় না। যাহারা আরাম প্রিয় ও লঘুচেতা, তাহারা গেরিল্লা যুদ্ধের পরিকল্পনা ত্যাগ করিলেই ভাল করিবেন। তবে একথা সত্য যে, গেরিল্লা-জীবনের অনিশ্চয়তা ও দুঃখ কষ্ট ক্রমশঃ সহিয়া যায়। ইচ্ছার প্রাবল্যই আসল কথা।

(৪) সর্বোপরি গতিশীলতা (mobility) নিতান্ত প্রয়োজন; সঙ্গে সঙ্গে আরও পাঁচটি জিনিষ দরকার: নির্ভীকতা, ক্ষিপ্রগতি, কৌশলপূর্ণ পরিকল্পনা, গোপনে চলাফেরার অভ্যাস, এবং সহসা কাজ করিবার ক্ষমতা।

(৫) কিন্তু আরও বড় কথা হইল, দেশের প্রতি ইঞ্চির জমির সঙ্গে ও দেশবাসী

জনসাধারণের সঙ্গে গেরিল্লাদের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক থাকে যেন। যে এলাকাকে কেন্দ্র করিয়া গেরিল্লাদেশ গড়িয়া উঠিবে বা গেরিল্লা যুদ্ধ চলিতে থাকিবে তাহার চারিপাশে অন্ততঃ ৪০।৫০ মাইল ভূভাগের নিখুঁত ভৌগলিক জ্ঞান থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কোথায় কোন্ গ্রাম আছে, সেখানে কত লোক, কাহার বাড়ীতে কয়টি ধানের গোলা, কোথায় হাট বাজার বসে, কোন নদীর কোন বাঁকে খেয়া মিলে, কোথায় অন্যান্য যানবাহনের সুবিধা আছে (যথা সাইকেল, ঘোড়া, হাতী গরুর গাড়ী, পাল্কী, লরী বা মোটর কার), কোন গ্রামে কয়টা বন্দুক আছে, কোথাকার লোকেরা ভাল শিকারী বা তীরন্দাজ বা লাঠিয়াল, কোথায় কামারশালায় দাও, কাতান (কৃপান) প্রভৃতি তৈয়ারী হয়, কোথায় জমি উঁচুনিচু, কোন রাস্তা কোথায় মিশিয়াছে, কোথায় পাহাড়, জঙ্গল বা জলাভূমি আছে, কোনদিকে খুব উঁচু গাছ আছে যাহাকে লক্ষ্য করিলে দিক ঠিক করা যায়, কোন পথদিয়া যাইলে দূরত্ব অল্প হইবে ইত্যাদি প্রকারের বিবরণ গেরিল্লাকে নখাগ্রে রাখিতে হইবে।

গেরিল্লারা রসদ ও অস্ত্র পাইবে কি করিয়া ?

গ্রামবাসীরাই গেরিল্লাদের রসদ যোগাইয়া থাকে।. যদি কাজের ভিতর দিয়া তাহাদের পরমাত্মীয় হইয়া যাইতে পারি তবে তাহারা নিজেদের একমুঠা ভাগ করিয়া আধমুঠা দিবে ও আধমুঠা খাইবে। গেরিল্লার জীবন বড় কঠোরতার জীবন। উদাহরণ স্বরূপ চীনা গেরিল্লাদের কথা বলা যাইতে পারে: "We learned to fast with nothing to eat for four or five days. And yet we become strong and agile as savages. Some of our look-outs practically lived in trees. Our young men could go up and down mounntains with incredible speed". (Interrview between Edger Snow and Han-Ying, the Field Commander of the New Fourth Army in China).

সঙ্গে লইয়া চলা ফেরা যায় এমন অল্প সল্প খাওয়ার জিনিব প্রত্যেক গেরিল্লার কাছে সম্ভব হইলে রাখা উচিত (মুড়ি, চিড়া, ছাতু, ভুট্টা, ছোলা, চিনাবাদাম, নারিকেল, কলা, গাজর, মুলা, আলু ইত্যাদি)। শত্রুর রসদ কাড়িয়া লইয়া ব্যবহার করাও গেরিল্লার পদ্ধতি; তবে সাবধান হইতে হইবে, তাহা যেন বিষ মাখানো না হয়। অপর পক্ষে নিজের রসদ, এমন কি পানীয় জল পর্য্যন্ত, শত্রুর হাতে পড়িবার পূর্বে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখা প্রয়োজন।

বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে সব রকমের যুদ্ধেই চারিটী জিনিষের প্রয়োজন: (১) যোদ্ধা, (২) 'যুদ্ধং দেহি' মনোবৃত্তি (morale), (৩) রসদ, এবং (৪) অস্ত্র।

গেরিল্লাদের প্রথম দুইটা যোল আনার উপর আঠারো আনা আছে। ইহারা হইবে রক্তবীজের ঝাড়। এক মরে ত দশ উঠে, ইহাই জনবাহিনী সৃষ্টির মূল কথা। এই অবস্থার সৃষ্টি হইলেই গণ-প্রতিরোধ সম্ভব হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক চেতনা-প্রসূত লড়াইয়ের মনোবৃত্তি গেরিল্লার জীবনে কখনই নিষ্প্রভ হয় না, লাখো বাধা বিপত্তি ও কষ্টের মধ্যে তাহার বিপ্লবী মনোভাব তাহাকে সদাই শত্রুর প্রতি মারমুখী করিয়া রাখে। তৃতীয় বস্তু উপাদান অর্থাৎ রসদ সম্পর্কে আগেই আলোচনা করিয়াছি। চতুর্থ জিনিষটা, অর্থাৎ অস্ত্র, প্রধানতঃ শত্রুর নিকট হইতে কাড়িয়া আনাই হইল গেরিল্লাদের কাম।

অপর পক্ষে দেখা যায় গেরিল্লার উৎপাতে শত্রু সৈন্যেরা পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় নম্বর জিনিষটা (অর্থাৎ morale) দিনের পর দিন হারাইতে থাকে। তারপর তাহারা রসদ হারাইতেছে তো বটেই, কিন্তু আরও বড় কথা, অধিকৃত দেশে শত্রু সৈন্যেরা আহার সংগ্রহ করিতে পারিতেছেনা। গেরিল্লারা খাদ্যাদি সরাইয়া ফেলিতেছে এবং নিরুপায় হইলেই ঘরবাড়ী, গোলা, বাগান, ক্ষেত, খামার জ্বালাইয়া পুড়াইয়া রাস্তা, রেল এবং টেলিগ্রাফ ও বেতার ঘাঁটী ইত্যাদি যাবতীয় জিনিষ ধ্বংস করিয়া শত্রুকে জব্দ করিতেছে। উপরন্তু শত্রুসৈন্যের বারুদ, তেল ও রাইফেল প্রভৃতির ঘাঁটি পুড়াইয়া অস্ত্র-শস্ত্র অপহরণ করিয়া লইতেছে এবং অল্প বিস্তর শত্রু পল্টনও

মারা পড়িতেছে। গেরিল্লার অতর্কিত আক্রমণের আসল উদ্দেশ্য হইল শত্রুর জীবন নাশ করা হউক আর নাই হউক, তাহার রসদ ও ঘাঁটি পুড়াইয়া উড়াইয়া দিয়া তাহার ক্ষতিগ্রস্থ করা এবং লুট করিয়া আনা। সাহস থাকিলে এই উদ্দেশ্যে বাবুদের শিকারী বন্দুক, রাম দাও, কুড়াল, তলোয়ার, নেপালী কুকরী, ভোজালি, খাঁড়া, সড়কী, বল্লম, জোরালো তীর, ধনুক, কোচ, এমনকি ভারী লাঠি প্রভৃতি পর্যন্ত কাজ আরম্ভ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। যাহারা মরিয়া হইয়া উঠিতে পারে তাহাদের পক্ষে যে কোন হাতিয়ারই দু-চার-দশ জনের জীবন লইবার পক্ষে যথেষ্ট। গাড়ী উলটাইয়া শত্রুর রসদ নষ্ট করা, পথ আটকাইয়া তাহার অগ্রগতিকে মন্থর করা ইত্যাদি কাজতো বুদ্ধি থাকিলে সামান্য চেষ্টাতেই করা যায়। মনে রাখিতে হইবে যে রাশিয়ার মত এমন যন্ত্রশিল্পে প্রগতিশীল রাষ্ট্রেও প্রত্যেক গেরিল্লাকে অস্ত্র দেওয়া সম্ভব হয় নাই। কিন্তু একথা অবশ্য সত্য যে গেরিল্লাদের হাতে কিছু কিছু অস্ত্র-শস্ত্র তুলিয়া দিবার সম্পর্কে দেশের গভর্ণমেণ্টের একটা বিশিষ্ট দায়িত্ব আছে।

গেরিল্লা যুদ্ধের তাৎপর্য

গেরিল্লা বাহিনীকে বলা যাইতে পারে জনবাহিনী। শত্রু কর্তৃক অধিকৃত প্রদেশে শত্রু সেনাকে আঘাত হানিবার পক্ষে উদ্যত জনশক্তির কার্য্যকরী অংশ ও অগ্রদূত হইতেছে সুশিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত গেরিল্লাবাহিনী। এই গেরিল্লা বাহিনী জন্ম লইবে জনসাধারণের ভিতর হইতে—এ কথার অর্থ কি? ইহার অর্থ হইল, গেরিল্লা যোদ্ধারা জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন (isolated) হইয়া বাঁচিতে পারেনা। তাহাদিগকে জনগণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে; তাহাদের ভিতর শিকড় গাড়িয়া, তাহা হইতে রস সংগ্রহ করিয়া নিয়ত পরিবর্ধিত ও পুষ্ট হইতে হইবে। এই উপায়েই গেরিল্লার শিশু দলগুলি নবজাত বৃক্ষের মতই অবিলম্বে মহামহীরুহে পরিণত হইয়া থাকে। চীনা লাল ফৌজের প্রধান অংশ—যাহার নাম বর্ত্তমানে Eighth Route Army বা অষ্টম রুট বাহিনী—তাহার কম্যাণ্ডার চু-তে যথার্থই বলিয়াছেন যে, গেরিল্লা

আন্দোলন যেন একটি মাছের মত ; নিজ রসদ ও সার সংগ্রহের জন্য এবং স্বাধীনভাবে বৃদ্ধিলাভের প্রয়োজনে ইহা সুপরিসর জনসমুদ্র কামনা করে। গেরিল্লা আন্দোলনের লক্ষ্য শুধু খুচরা ভাবে দুই চারিটী শত্রুকে নিহত করা নয়। গেরিল্লা যুদ্ধ কখনই ব্যক্তিগত বা মুষ্টিমেয় লোকের দল-গত সন্ত্রাসবাদ নহে। পূর্বেই বলিয়াছি যে শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করিতে হইবে, প্রতিনিয়ত আঘাত হানিতে হইবে, কিন্তু দেখিতে হইবে তাহা ব্যাপক ও কার্যকরী ভাবে এবং যথেষ্ট পরিমানে হইতেছে কি না। আসলকথা হইল এমন দেশব্যাপী গণ আন্দোলনের প্রয়োজন যাহার ফলে শত্রু শিকড় গাড়িয়া এ দেশের মাটিতে বসিতে না পারে।

স্বনামধন্য কর্ণেল লরেন্স (Colonel Lawrence) আরবের মরুভূমিতে বেদুইনের যে দুর্ধর্ষ গেরিল্লাদল গড়িয়াছিলেন, সেখানে তিনি গেরিল্লা যুদ্ধকে ব্যাপক সামরিক কৌশলেরই একটী অংশ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু চীনা লাল ফৌজের নিকট হইতে আমরা এ বিষয়ে নূতন আলোক পাইলাম। বহু দুঃখলব্ধ অমূল্য অভিজ্ঞতা এবং বহু ত্যাগ স্বীকারের ফলে এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রায় তিন লক্ষ সভ্যের প্রাণ দানের বিনিময়ে চীনা লাল ফৌজ [যাহার বর্ত্তমান নাম নব চতুর্থ বাহিনী ও অষ্টম রুট বাহিনী] এই গেরিল্লা যুদ্ধকে সামরিক প্রচেষ্টার একটি গৌণ কৌশলের পর্যায় হইতে এক মুখ্য রণনীতির পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। জেনারেল পেও-তে-হোয়াই সেই নীতির নামকরণ করিয়াছেন "সুদীর্ঘ ও ব্যাপক গণপ্রতিরোধ" (Total mass protracted resistance)। আজ পর্যন্ত মানবেতিহাসে বহুবার দেখা গিয়াছে যে একমাত্র এই নীতিকে আশ্রয় করিয়াই ব্যাপক আক্রমণকারীর (Totalitarian invade) সামরিক প্রচেষ্টা ও সামরিক সাফল্যকে নিস্ফল করিয়া দেওয়া গিয়াছে। মনে পড়িতেছে—একজন সুবিখ্যাত মার্কিন গ্রন্থকার প্রশ্ন করিয়াছেন, "কে বলিতে পারে যে এই নীতিকে গ্রহণ করিয়াই এসিয়া এবং ইউরোপের অগন্য পরাধীন জাতিগুলি নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করিবেনা ? আর কেই বা বলিতে পারে যে জেনারেল লুডেনডর্ফের রণনীতির অপেক্ষা এই গণ-

প্রতিরোধের সামরিক কৌশলই জগতে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে বেশী কার্যকরী হইবেনা ?

কিন্তু এই ব্যাপক গণপ্রতিরোধের স্বরূপ এবং কৌশলটা কি ? ভারতবর্ষের কথাই ধরা হউক। এদেশের ভূমিভাগ বহুদূরপ্রসারী এবং জনসংখ্যা অপরিসীম। শত্রুকে প্রতিরোধ করিতে আমরা এই দুইটা বস্তুর পুরাপুরি সুযোগ লইতে পারি। মনে করুন ভারতের অর্দ্ধেক জমি অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ গ্রাম জাপানীর হাতে যাইয়া পড়িল। কিন্তু রহস্য হইল এই যে, ইহার অর্দ্ধ সংখ্যক গ্রামেতেও খবরদারী করিবার জন্য পুলিশ মোতায়েন রাখিবার মত কার্যকরী লোকসংখ্যা জাপানের নাই। টাকা খরচ করিয়া ভাড়াটিয়া পুলিশ আমদানী করাও বাস্তব হিসাবের বাহিরেই। অতএব শত্রু চেষ্টা করিবে যাহাতে প্রথম হইতেই দেশের ভিতরে সমস্ত প্রতিরোধের টুঁটি চাপিয়া মারা যায় এবং যাহাতে এদেশে তাহার নিজস্ব শক্তি সহজে এবং শীঘ্রই কায়েম হইয়া বসে। কিন্তু কায়েম করিবার উপায় কী ? সর্বপ্রধান উপায় হইতেছে রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডা ও নানা প্রকারের স্তোকবাক্য—এই রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক চালবাজীর মারফৎ আক্রান্ত দেশের জনসাধারণের হৃদয় মন জয় করিয়া লওয়া অর্থাৎ এই কথা প্রমাণ করা যে আক্রমণকারী রাষ্ট্রশক্তি আসলে আমাদের শত্রু নহে, আমাদের পরম হিতাকাঙ্খী। এখনও তেমনই শোনা যাইতেছে যে ভারতকে স্বাধীন দেখিবার জন্য এবং তদুদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার সাহায্য করিবার জন্য জাপানের নাকি প্রাণ ফাটিয়া পড়িতেছে ! পঞ্চম বাহিনীর বিকৃত প্রচারের ফলে দেশের লোকের মনেও ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতেছে যে বুঝি বা জাপান আসিয়া স্বাধীনতাই দিবে। এই মনোভাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করাই হইতেছে গেরিল্লা আন্দোলন এবং গেরিল্লা সংগঠনের প্রাথমিক সূত্র।

তারপর শত্রু অভিযানের সামরিক, দিকটার প্রতি নজর দেওয়া যাউক। শত্রু এদেশের ভিতরে অগ্রসর হইবার সময়ে বড় সহর, রাস্তা, রেল লাইন, বিমান ঘাটি ও কলকারখানাগুলিতে জমিয়া বসিতে চেষ্টা করিবে সন্দেহ নাই।

এই ঘাঁটিগুলি শত্রুর দখলে আসিলে ইহাদের অভ্যন্তরস্থ জনপদ বা এলাকাগুলি চতুর্দিক হইতে সামরিক চাপে পড়িয়া স্বভাবতঃই বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু এই জনপদগুলি যদি গেরিল্লা লড়াইয়ের কেন্দ্রে পরিণত হয় তবে ব্যাপার একটু ঘোরালো হইবে। প্রতিটী গ্রামে প্রতিটী গৃহই যদি শত্রু-প্রতিরোধের ঘাঁটি বা দুর্গে পরিণত হয় তাহা হইলে গ্রামবাসী বশ্যতা স্বীকার না করিয়া শত্রুকে পদে পদে আঘাত হানিতে পারিবে। ইহার ফল হইবে এই যে, এই দেশে স্থানীয় লোকের সহযোগিতা, অন্ততঃ নিরপেক্ষতা হইতে বঞ্চিত হইয়া শত্রু কেবল নিজস্ব বাহুবলের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইবে। আর দায়ে পড়িয়া এই সব প্রতিরোধের দুর্গস্বরূপ গ্রামগুলিকে একে একে দখলে লওয়া ব্যতীত তাহার আর গত্যন্তর থাকিবে না। কিন্তু একেবারে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত শত্রু এই সব অঞ্চলে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। দুর্দান্ত জনবাহিনী তিলে তিলে শত্রুর শক্তিক্ষয় করিয়া যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করিবে, ইহাতে শত্রুর অগ্রগতি মন্থর হইয়া আসিবে এবং ক্রমশঃ সে হীনবল হইয়া পড়িবে। ইহাই হইল "সুদীর্ঘ ও ব্যাপক গণ প্রতিরোধের" কৌশল ও রহস্য এবং ইহাই হইল চীনা প্রদর্শিত গেরিল্লা যুদ্ধের তাৎপর্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গেরিল্লা যুদ্ধের ইতিহাস

গেরিল্লা যুদ্ধের নামান্তর হইতেছে 'জনযুদ্ধ'। গেরিল্লবাহিনী জনগণের মধ্য হইতে জন্ম লয় বলিয়াই পরাক্রান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ সম্ভব হয়। এই প্রকার জনযুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করিয়াই যুগে যুগে আক্রমণকারীর বিরাট সৈন্যবাহিনীকে সাফল্যের সঙ্গে পর্যুদস্ত করা গিয়াছে দেখিতে পাই।

ইতিহাসের শৈশবে মানুষের আদিম যুদ্ধপ্রেরণা ও কলাকৌশলের কথা ছাড়িয়া একেবারে মধ্যযুগের শেষভাগে আসিয়া উপস্থিত হওয়া যাউক। এখানে দেখি, গেরিল্লা যুদ্ধের নীতি-কৌশল প্রথমে ভারতের জনসাধারণ সৃষ্টি করিতেছে। তখন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ। মারাঠা নৃপতি হিন্দুরাজত্ব পুনঃস্থাপনের সুখস্বপ্ন দেখিতেছেন, অপরপক্ষে পরাক্রান্ত মোগল সেনানীর বাহুবলে দাক্ষিণাত্য জয়ের উদ্দাম উল্লাসে মাতিয়াছেন সাম্রাজ্যেশ্বর শাহান শা ঔরঙ্গজীব। শিবাজীর নেতৃত্বে মোগল সৈন্যেরা ভারতের মাটিতে গেরিল্লা যুদ্ধের পত্তন করিল। বিরাট সজ্জিত মোগল বাহিনীকে রুখিতে 'পর্বত মূষিক' এই যে বর্গীদার ও শিল্লিদার গেরিল্লা বাহিনী সৃষ্টি করিল—ভারত সম্রাটের শিক্ষিত সেনানী তাহাকে পরাহত করিতে পারিল না। দূরে ঐ সুসজ্জিত মোগলপল্টন আসিতেছে--এদিকে মুষ্টিমের মাওয়ালী সৈন্য। নগ্ন অশ্ব, নগ্ন সোয়ার, হাতে দীর্ঘ বল্লম ও কটিদেশে বস্ত্রাঞ্চলে শুষ্ক আহার্য একমুঠা ছোলা। শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত খর্বাকৃতি সেনাপতি শিবাজীর আদেশ—'সরিয়া পড়ো'! নিমেষে বর্গীরা পাহাড়ের গুহায় নিশ্চিহ্ন হইল। সন্ধ্যা নামিয়াছে; ক্লান্ত শরীর, মোগল সেনানী বিশ্রামের আয়োজন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে বর্গীদের অশ্বের খুরে পর্বতে পর্বতে স্ফুলিঙ্গ খেলিয়া

গেল। আচম্বিতে নির্মম আঘাত হানিয়া মোগলসৈন্তকে বিমূঢ় ও ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়া "পর্বত মূষিকের" গেরিল্লা বাহিনী কোথায় যেন নিমেষে উধাও হইয়া গেল।

জগদ্বিখ্যাত চীনা গেরিল্লা নেতা কমরেড্ 'চুতে' বলিয়াছেন: গেরিল্লা যুদ্ধ প্রণালীর ভিতরে নূতনত্ব কিছু নাই। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ অধিকৃত আমেরিকার জনসাধারণ যখন স্বাধীনতা লাভের জন্ম যুদ্ধ করিয়াছিল, তখন তাহারা এই গেরিল্লা যুদ্ধের পন্থাই অবলম্বন করিয়াছিল। তারপর ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের দিনেও 'ন্যাশন্যাল গার্ডের' বিরুদ্ধে এই পন্থা ফরাসী জনগণ গ্রহণ করিয়াছিল। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ১৮০৭ সালে স্পেন আক্রমণ করেন; কিন্তু তাঁহার শেষদিন পর্যন্ত তাহাকে মাদ্রিদেই পড়িয়া থাকিতে হয়। তাঁহার জীবনে আর স্পেন দখল হইল না; ইহার একমাত্র কারণ ছিল স্পেনীয় গেরিল্লাদের জীবনমরণ প্রতিরোধ। ১৮১২ সালে তিনি যখন রাশিয়া আক্রমণ করেন, সেই সময় স্পেনীয় গেরিল্লা যুদ্ধের কৌশলে রাশিয়ায় দলে দলে গেরিল্লা বাহিনী গড়িয়া উঠে এবং তাঁহার সামরিক অভিযানকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। তারপর ইতালীর জাতীয় মুক্তির যুদ্ধে জননায়ক গ্যারিবল্ডির অবদান যিনিই স্মরণ করিবেন তাঁহাকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, রাইও (Rio) ও মন্টেভিডিও (Montevadeo) হইতে সুরু করিয়া সিসিলির বিজয় অভিযানেও গেরিল্লাকৌশলই গ্যারিল্ডির চরম সাফল্যের হেতু হইয়াছিল। এই ঘটনা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের।

ইহার পর দেখিতে দেখিতে কিছুদিনের মধ্যে ভারতের বুকে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ১৮৫৭ সালে সেই তাণ্ডবতার মাঝখানে এদেশে আর একবার গেরিল্লা যুদ্ধের নির্মম লীলাভিনয় আমরা দেখিয়াছি। এই যুদ্ধের কৌশলেই মধ্যভারতে তান্তিয়া তোপী ব্রিটিশ বাহিনীকে অসংখ্যবার বিপর্যস্ত করিয়াছে। "কতবার যে কোম্পানী সৈন্সের কাছে সে নিজে হারিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু হারিবার সঙ্গে সঙ্গে মধ্য ভারতের নিবিড় জঙ্গলে আশ্রয় লইয়া অনতিবিলম্বে আবার কোথা হইতে সৈন্য যোগাড় করিয়া অদূরে আর একটি ঘাঁটিতে আঘাত হানিয়াছে। নিজেরও বিশ্রাম নাই, শত্রুকেও বিশ্রাম করিতে

দেয় নাই। কাণপুর, শেওরাজপুর, কল্পি, কুঞ্চ, জগুয়া, পাটান, ঈশাওয়াগড়, প্রতাপগড়, দেওঘর প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধকাহিনী আজিও তাঁতিয়া তোপীকে মধ্যভারতের লোকের কাছে 'যাদুকর' বানাইয়া রাখিয়াছে।"

কিন্তু পুরাতন অস্ত্রের সম্মুখে গেরিল্লানীতি সাফল্যমণ্ডিত হইলেও আধুনিক মারাণাস্ত্রের মুখে ইহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে সকলে সন্দিহান ছিল; তাহারও পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর চরিত্রের অধিনায়কত্বে। বিগত মহাযুদ্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কর্ণেল লরেন্স্ স্বাধীনতার আহ্বানে আরবের দুর্ধর্ষ বেদুইনদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুর্কীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিলেন। এখানে শিবাজীর অশ্বারোহী গেরিল্লা যোদ্ধা নাই, আরবের ধূ ধূ মরুপ্রান্তরে উষ্ট্র বাহিনীর উদ্দামতা আছে; মরুভূমির বালুর-ঝড়ের মতো ত্রিশ মাইল পঁয়ত্রিশ মাইল বেগে বেদুইন উষ্ট্রবাহিনী তুর্কীর রেলযাত্রী সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়া পুনরায় উষ্ট্রপদবিক্ষেপে বালুকারাশি শূন্যে উড়াইয়া সীমাহীন মরুবক্ষে গা ঢাকা দিল। দুর্দান্ত মরুর মাঝে কে তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিবে?

প্রথম মহাযুদ্ধের গতি অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে, "তুর্কী সৈন্যেরা সিরিয়ার ভিতর দিয়া প্যালেষ্টাইন ও আরবের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। সেনাপতি 'এলেন বি' সেনাই উপদ্বীপের পথে তুর্কী সৈন্যকে আক্রমণ করিবার জন্য পরিকল্পনা করিতেছেন। লরেন্স তখন একজন নগণ্য সৈনিক; বেদুইনদের একত্রিত করিয়া তুর্কী বাহিনীকে বিপর্যস্ত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া সকলেই উপহাস করিল। তুর্কী সৈন্যদল প্যালেষ্টাইনের পথে দক্ষিণে থামিল। মদিনার রেলপথ তাহাদের দখলে আসিয়াছে। লরেন্স তখন আরবের মরুভূমিতে এই রেলপথের পূর্বপ্রান্তে ইতঃস্ততঃ গেরিল্লা দল সৃষ্টি করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। সকলেই বলিল, এই রেল লাইন উড়াইয়া দাও, তাহা হইলে তুর্কীরা আর অগ্রসর হইতে পারিবেনা। লরেন্স বলিলেন—না, এই রেল লাইন ধ্বংস করিলে তুর্কীরা অন্যপথ বাছিয়া অন্যদিকে অগ্রসর হইবে। তাহা অপেক্ষা এই রেল লাইন উহাদের রাখিতে দাও। আমাদের মক্কার দিকে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া উহারা এই রেলপথে অজস্র সৈন্য, গোলাগুলি,

খাদ্যসম্ভার পাঠাইবে এবং সেই সুযোগে আমরা গেরিল্লানীতিতে উহাদের অস্ত্র কাড়িব, উহাদের সৈন্য ধ্বংস করিব, উহাদের খাদ্যাদি হস্তগত করিব। এই নীতি দিনে দিনে কার্যকরী প্রমাণিত হইল, এবং ইহার ফলে তুর্কী সৈন্যবাহিনী যে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহা পরবর্ত্তী প্যালেষ্টাইন যুদ্ধে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।"

. [Encyclopeadia Britanica—Lawrence]

ইহারই সমপর্যায়ে দেখা দিল রুশবিপ্লব। ১৯১৭ সাল। তখন হইতে সুদীর্ঘ চার বৎসর ধরিয়া চলিল গৃহযুদ্ধ ও বিদেশী আক্রমণ। অক্টোবর বিপ্লবের উত্তরাধিকার রক্ষা করিবে কে? একদিকে চতুর্দশ শ্বেত শক্তির যুগপৎ আক্রমণ, অন্যদিকে দেশীয় কুলাকশ্রেণীর ষড়যন্ত্র। সেদিন কোলচাক ডেনিকিনের কবল হইতে সোভিয়েট বিপ্লবকে রক্ষা করিতে চাপায়েভ ও শোর্‌স্‌এর নেতৃত্বে অগণিত গেরিল্লা দল গড়িয়া উঠিল। ইউক্রেইনে, ককেশাসে, এমন কি সুদূর সাইবেরিয়ার শ্বেত মরুক্ষেত্রেও গেরিল্লাবাহিনীর সৃষ্টি হইল।

সেই যুগের রুশ গেরিল্লাদের সঙ্গে বর্তমান নাৎসী সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সোভিয়েট গেরিল্লার পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করিবার বস্তু। এখন যে কোনও গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া সোভিয়েট জনসাধারণ গেরিল্লা লড়াই চালাইতে সক্ষম; কেননা, আজ গৃহশত্রু কুলকশ্রেণী নির্মূল হইয়াছে; আজ আর মুষ্টিমেয় বিপ্লবী ও দরদী ব্যক্তির সাহায্য নহে, আজ অগণিত দেশবাসীর শ্রেণীহীন জনসাধারণের স্বতঃ-প্রণোদিত লক্ষ প্রকারের সহযোগিতা ও সাহায্য আসিয়া পৌঁছে এই লাল গেরিল্লার তাঁবুতে। আজ আর রাশিয়াতে গেরিল্লাদের প্রতারিত করিয়া শত্রুহস্তে সঁপিয়া দিবার লোক মিলে না। কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের যুগে মিলিত।

চীনের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। চীনা গেরিল্লার আদি ইতিহাস হইতেছে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির ও চীনা লালফৌজেরই জন্মের ইতিহাস। জাতীয় বিপ্লবের পটভূমিকায় জন্ম লইয়াছে চীনের বিপ্লবী গণবাহিনী। ১৮৫০–১৮৬৫ সালের তাইপিং কৃষক বিদ্রোহ, ১৯০০ সালের বক্সার বিদ্রোহ, সান্‌-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে ১৯১১ সালের সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের ভিতর দিয়া

চীনের বিপ্লবী ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত বৈপ্লবিক আন্দোলনের মাঝখান হইতে যে সব শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী সন্তানরা চীনের মাটীতে জন্ম লইয়াছিলেন, ১৯২০-২১ সালে তাঁহারা এবং তাঁহাদের বংশধরেরাই মহাচীনে কম্যুনিষ্ট পার্টি সর্বপ্রথম কায়েম করেন। ১৯২১ সালে যখন পার্টির প্রথম কংগ্রেস হয় তখন পার্টিতে মাত্র কয়েক ডজন সভ্য ছিল। ১৯২৫ সালের বিপ্লবের পূর্বে পার্টির সভ্যসংখ্যা প্রায় ৯০০ জনে দাঁড়ায়। ১৯২৫-২৭ সালের বিপ্লবের ভিতর দিয়া পার্টি শক্তিশালী হইতে থাকে এবং সভ্যসংখ্যা প্রায় লক্ষের কাছে গিয়া দাঁড়ায়। তারপর জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী বা ধনিক শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতায় ১৯২৭ সালে বিপ্লবের গতি প্রতিহত হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে চীনের বুর্জোয়াজী, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র নির্মম অত্যাচার চালাইতে লাগিল বিপ্লবী জনসাধারণের উপর। কিন্তু এই অত্যাচারের ভিতর দিয়া একদিকে যেমন কম্যুনিষ্ট পার্টি শক্তিশালী হইতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনি কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বে গেরিল্লা ফৌজ ও বিপ্লবী জনবাহিনী গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এই জনবাহিনী বা গেরিল্লা দলের রোমাঞ্চকর কাহিনী যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

অন্যদিকে স্পেনের আধুনিক ইতিহাসও কম বিপ্লবময় নহে। ১৯৩৬ হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন বৎসর ব্যাপী স্পেনের গৃহযুদ্ধে আর একবার বিপ্লবী গেরিল্লাদলের অপূর্ব কীর্তিকাহিনী বিশ্বের জনসাধারণকে চমকিত ও উৎসাহিত করিয়াছে। এব্রো নদীর কূলে কূলে, মাদ্রিদ সহরের রাজ পথে পথে, পিরেনিজ পর্বতের শিখরে শিখরে গেরিল্লার রণকৌশল রিপাব্লিকান সৈন্যদলের অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে। টমাস উইন্টিংহামের "স্পেনীয় ইণ্টারন্যাশন্যাল" বাহিনীতে যে ৫০০ যোদ্ধা যোগ দিয়াছিল তাহাদের অনেকেরই সম্বল ছিল মাত্র দশদিনের অস্ত্র ও যুদ্ধশিক্ষা, কয়েকটী মেসিনগান, কিছু পুরাতন রাইফেলও কয়েক শত হাতবোমা। এই যোদ্ধাদের বয়স ত্রিশ বৎসরের বেশী কাহারও নহে। ইহাদের বিরুদ্ধে রাইখ্‌ভের শিক্ষিত অফিসার দ্বারা পরিচালিত ফ্র্যাঙ্কোর সুশিক্ষিত ২০০০ যান্ত্রিক পদাতিক দল, প্রচুর মেসিনগান, ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমানের সাহায্যে মাদ্রিদের সর্বশেষ রাজপথ দখল লইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। সম্মুখে বিদ্যুৎবেগে ফ্র্যাঙ্কোর ঐ বিশাল ট্যাঙ্ক বাহিনী

অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, তাহারা নিমেষে এই পাঁচশত বালকের ক্ষুদ্র দলটিকে ছন্নছাড়া করিয়া দিয়া গেল। কিন্তু যেই ট্যাঙ্কবাহিনী চোখের বাহিরে গেল, অমনি আবার কল্‌মি লতার একটি টানে দলবলে উঠিয়া আসার মত এই পাঁচশত গেরিল্লার দুর্ধর্ষ বাহিনী চকিতে মিলিত হইয়া গুপ্ত ঘাঁটি ও শত্রুর দখলী এলাকা পুনর্দখল করিল। ফ্র্যাঙ্কো যে অবশেষে জয়লাভ করিল সে কেবল ফ্যাসিষ্টদের সাহায্যে এবং মিত্রপক্ষীয় ষড়যন্ত্রের ফলে।

চীনা গেরিল্লার জন্ম কথা

১৯২৭ সালে কুয়োমিনটাঙ ও কম্যুনিষ্ট পার্টির "সম্মিলিত ফ্রন্ট" ভাঙিয়া গেল কুয়োমিনটাঙের বুর্জোয়াদের চাপে। কিন্তু এই ভাঙনের ভিতর দিয়া, কম্যুনিষ্ট পার্টির পরাজয়ের মধ্য দিয়া জন্ম লইল চীনা সোভিয়েট ও চীনা গেরিল্লা। ঐ বৎসর আগষ্টের প্রথমে চীনা কমুনিষ্ট পার্টির বর্তমান সেক্রেটারী ও তাঁহার সহকর্মীরা চাংশাতে চলিয়া যান এবং হুনান প্রদেশকে ভিত্তি করিয়া কৃষক সমিতিগুলির মারফৎ এক ব্যাপক বিপ্লব আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। হ্যানিয়াঙ খনির মজুর, হুনানের কৃষক সম্প্রদায় ও কুয়োমিনটাঙের বিদ্রোহী সৈন্যদের লইয়া কৃষক ও শ্রমিকের বিপ্লবী ফৌজের প্রথম ইউনিটের সংগঠন এই খানেই হয়। ধীরে ধীরে পার্টির হুনানস্থিত প্রাদেশিক কমিটির তত্ত্বাবধানে কৃষক ও শ্রমিকদের আরো অনেকগুলি ইউনিট গড়িয়া উঠে।

১৯২৭ সালে হুনানের একপ্রান্তে চা'লিনে চীনের প্রথম সোভিয়েটের প্রতিষ্ঠা হয় এবং প্রথম সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হয়। ইতি মধ্যে কৃষক ও শ্রমিকদের বিপ্লবী ফৌজের আপ্রাণ চেষ্টায় হুপে প্রদেশে, কিয়াংশি সীমান্তে ও কিয়ানে সোভিয়েট আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে এবং কিয়ানে চীনা সোভিয়েট কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের প্রধান ঘাঁটী হইয়া দাঁড়ায়। ১৯৩০ সালের মে মাসের মধ্যে অগণিত কম্যুনিষ্টদের স্বার্থত্যাগ ও জীবন বিসর্জনের ভিতর দিয়া চীনের এক চতুর্থাংশে সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন হয়। কিন্তু ১৯৩০ সালের শেষের দিকে ফ্যাসিষ্ট মনোভাবাপন্ন

চিয়াংকাইশেক বিদেশী সাম্রাজ্য-তন্ত্রের সহিত মিতালী করিয়া সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের প্রথম অধ্যায় সূচনা করেন।

চিয়াংএর প্রথম অভিযান সুরু হয় তাঁহার অনুচর লুতি-পিংএর অধিনায়কত্বে কুয়োমিনটাঙের একলক্ষ সৈন্য লইয়া। পাঁচ দিক হইতে তাহারা চীনের সোভিয়েট চিহ্নিত দেশগুলিকে আক্রমণ করিল। কিন্তু দুই তিন মাসের মধ্যে (১৯৩১ জানুয়ারি) কুয়োমিনটাঙের সৈন্য লালফৌজের গেরিল্লা লড়াইয়ের ফলে হার মানিল। এই যুদ্ধে হারিয়া পুনরায় একমাস পরেই (১৯০১ জুলাই) চিয়াং স্বয়ং তিন লক্ষ সৈন্য লইয়া "চীনের লাল দস্যুদের" (চিয়াং কম্যুনিষ্টদের 'লাল দস্যু' আখ্যা দিয়াছিলেন) ধ্বংসের উদ্দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। অক্টোবর পর্যন্ত লড়াই চালাইয়া পরাজয়ের গ্লানি লইয়া চিয়াং নানকিংএ ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন।

১৯৩৩ এপ্রিলে চিয়াং সুরু করেন তাঁহার চতুর্থ অভিযান : বিদেশী সাম্রাজ্য-তন্ত্রের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়া চিয়াং এ অভিযানে চেন-চেংএর নেতৃত্বে আড়াই লক্ষ সৈন্যের সমাবেশ করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লালফৌজ চিয়াংএর সৈন্য-বাহিনীকে শোচনীয় ভাবে পরাস্ত করিল। চতুর্থ অভিযানের সমাপ্তি এইখানেই ঘটিল। আবার পঞ্চম অভিযানের তোড়জোড় সুরু হইল। জার্মানী হইতে ফন্ সেক্ট আসিলেন ; আরও অনেক সেরা সেরা নাৎসী সেনানায়ক আসিয়া যুদ্ধের নূতন খসড়া তৈয়ারী করিলেন। গ্রেট ব্রিটেন নানকিং সরকারকে পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড ধার দিল। অর্থ ও যুদ্ধ সম্ভার দিয়া জাপান নানকিং সরকারকে লালফৌজের বিরুদ্ধে লড়িতে সাহায্য করিবে প্রতিশ্রুতি দিল। আমেরিকা "গম ও তুলা ঋণ" হিসাবে পাঁচ কোটী ডলার এবং "বিমান পরিকল্পনা ঋণ" হিসাবে চার কোটী ডলার নানকিং সরকারের হাতে তুলিয়া দিল। ১৯৩৩ এবং ১৯৩৪ সালের মধ্যে তিন শত আমেরিকান ও ক্যানেডিয়ান বিমানপোত চালক চীনে আসিয়া উপস্থিত হইল—চিয়াংএর সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করিতে। ইহা ছাড়া পুনরায় আফিংয়ের ব্যবসা অনুমোদন করিয়া চিয়াং বার্ষিক বিশলক্ষ ডলার পাইতে লাগিলেন। এমনি করিয়া সবদিক সুসজ্জিত হইয়া নয় লক্ষ সৈন্য নিয়া চিয়াং তাঁহার পঞ্চম

অভিযান সুরু করিলেন। এ অভিযান চলিয়াছিল ১৯৩৩ এর অক্টোবর হইতে ১৯৩৪ এর অক্টোবর পর্যন্ত—প্রধানতঃ কিয়াংশি প্রদেশকে কেন্দ্র করিয়া। লালফৌজ প্রথমে এ আক্রমণকে প্রতিহত করিতে না পারিয়া অনেক ক্ষেত্রেই হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। সকলেই ভাবিল লালফৌজের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লালফৌজই জয়ী হইল। তাহারা তাহাদের গেরিল্লা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করিয়া কুয়োমিনটাঙের সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করিয়া উহাদেরই অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া নিয়া সোভিয়েটের জনগণকে সুসজ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল। লালফৌজের জয়ের অন্যতম কারণ হইল চীনা সোভিয়েটের সুসংবদ্ধ শক্তি, বৈপ্লবিক প্রগতি ও সোভিয়েটের উপর জনগণের অটুট বিশ্বাস।

যুদ্ধরীতির দিক দিয়া চীনা সোভিয়েটের জনগণ চারিটি শ্লোগান ব্যবহার করিত:—(১) শত্রু যখন আগাইবে তখন আমরা পিছু হটিব ; (২) শত্রু যখন আসিবে এবং বিশ্রাম লইবার সঙ্কল্প করিবে তখন তাহাদের আমরা আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিব ; (৩) শত্রু যখন এড়াইয়া যাইতে চাহিবে, তখন তাহাদের আমরা আক্রমণ করিব ; (৪) যখন শত্রু পিছু হটিবে তখন আমরা পশ্চাদ্ধাবন করিব। প্রধানতঃ এই যুদ্ধরীতি অবলম্বন করিয়াই চীনা গেরিল্লারা চিয়াং কাইশেকের বিরাট সৈন্যবাহিনীকে বারে বারে পরাস্ত করিয়াছিল।

চিয়াংএর পঞ্চম অভিযান যখন ব্যর্থতায় পরিণত হইল, তখন চীনা লালফৌজের গেরিল্লারা জাপানের আক্রমণ হইতে চীনকে রক্ষা করিবার কাজে মনোনিবেশ করিল। কম্যুনিষ্টরা দেখিল যে, জাপানের সঙ্গে লড়িতে হইলে উত্তর পশ্চিম চীনে সোভিয়েটের ঘাঁটী করা দরকার। তাই তাহারা স্থির করিল উত্তর পশ্চিম 'সেনসি'তে সোভিয়েটের ভিত্তি গড়িতে হইবে।

১৯৩৪—৩৫ এর শীতকালে চীনা সোভিয়েট দক্ষিণ পশ্চিম হইতে শেচুয়ান ও কানসু পার হইয়া ১৮৮৮০ লি (তিন লি ১ মাইল) বা ৬০০০ মাইলের অধিক রাস্তা অতিক্রম করিয়া শেনসিতে অধিষ্টিত হইল। দক্ষিণ চীন হইতে শেনসিতে আসিতে চীনা সোভিয়েট ও লালফৌজের ৩৬৮ দিন লাগিয়াছিল। এই ৩৬৮ দিনের ভিতর

এমন একটি দিনও ছিল না যে সেদিন লালফৌজকে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িতে হয় নাই। তুষারমণ্ডিত আঠারোটি উত্তুঙ্গ পর্বতমালার ভিতর দিয়া চব্বিশটি খরস্রোতা নদনদী পার হইয়া, বারোটি প্রদেশের মধ্য দিয়া, বাষট্টিটি নগর অধিকার করিয়া, দশটি প্রদেশের সামন্ততন্ত্রের সৈন্যদের পরাস্ত করিয়া, কুয়োমিনটাঙের সৈন্যদের বিপর্যস্ত করিয়া, চীনের দুর্ধর্ষ আদিম অধিবাসীদের অধিকারস্থ ছয়টি সহরের (যাহার ভিতর কোনো চীনা সরকারী ফৌজ এ পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে নাই) ভিতর দিয়া পথ করিয়া, শত দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া চীনা লালফৌজ তাহাদের গন্তব্যস্থানে পৌছিয়াছিল। ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আর নাই—হ্যানিবলের আল্পস্ অতিক্রম ইহার তুলনায় ছেলেখেলা বলিয়া মনে হয়। নেপোলিয়নের মস্কো হইতে প্রত্যাগমনের সাথে ইহার খানিকটা তুলনা করা যাইতে পারে। নেপোলিয়ানের মস্কো হইতে প্রত্যা-গমণের ভিতর ছিল পরাজয়ের গ্লানি, আর লালফৌজের এই 'মার্চ' ছিল বিজয় অভিযান।

লালফৌজ শুধুই ৬০০০ মাইল অতিক্রম করিয়া তাহাদের গন্তব্যস্থানে আসিয়া পৌছায় নাই—পথিমধ্যে তাহারা তাহাদের আদর্শকে চীনের জনসাধারণের ভিতর প্রচার করিতে করিতে আসিয়াছে। কুড়ি কোটী চীনা জনগণের ভিতর দিয়া পথ করিয়া তাহারা আসিয়াছে যুদ্ধ করিতে করিতে। যেখানেই তাহারা নূতন গ্রাম বা সহর অধিকার করিয়াছে, সেইখানেই বড় বড় সভার ব্যবস্থা করিয়া কম্যুনিজমের আদর্শ, সোভিয়েটের কর্মপন্থা, সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের মূলনীতি, কৃষক আন্দোলনের তাৎপর্য, কৃষকদের ভিতর সোভিয়েট কি ভাবে জমি বিলি করিয়া দিয়াছে, চীনকে জাপানের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সোভিয়েটের কর্মধারা—ইত্যাদি খুব ভাল করিয়া জনগণকে বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের সোভিয়েটের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে ও সোভিয়েটের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে। শুধু ইহাই নয়—ঐ সকল স্থানে ধনীদের ধনদৌলত সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছে, জমিদারের জমি কৃষকদের ভিতর বিলি করিয়া দিয়াছে, দাসপ্রথার অবসান ঘটাইয়াছে, মেয়েদের পর্দাপ্রথা রহিত করিয়াছে, আর শত শত কৃষকদের অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়াছে।

লালফৌজের এই অভিযান, এই কৃতিত্ব দেখিয়া মনে প্রশ্ন জাগে—এমনিতর ক্লেশকর এবং অভূতপূর্ব্ব ঘটনা কি করিয়া সম্ভব হইল? উত্তরে বলা যায়—ইহার প্রধান কারণ কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব; সোভিয়েট জনগণের অদ্ভুত সমর-কৌশল, অনমিত তেজ ও সাহস, সুদৃঢ় সঙ্কল্প ও বৈপ্লবিক প্রেরণা। ইহার কাছে ফ্যাসিষ্ট মনোভাবাপন্ন চিয়াং কাইশেক যে একদিন মাথা নত করিবে তাহা ছিল সুনিশ্চিত—চীনের পরবর্ত্তী ইতিহাস তাহারই সাক্ষ্য দেয়:

উপরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, গভর্ণমেণ্টের সাহায্য তো দূরের কথা, তাহার সকল সশস্ত্র অভিযানকে ব্যর্থ করিয়াই চীনা লাল গেরিল্লার জন্ম হইয়াছিল। গরীব, কাঙাল, শ্রমিক এবং কৃষক চীনা নিজেদের বুকের রক্ত দিয়া বিপ্লবী মনোভাবের সাহায্যে একমাত্র নিজেদের উৎসাহে ও তাগিদে অপরিমেয় শক্তির অধিকারী এই লাল গেরিল্লার দল সৃষ্টি করিয়াছিল।

সেই গেরিল্লাদলই আজ অষ্টম আর্ম্মী, নিউ ফোর্থ আর্ম্মীতে পরিণত হইয়া সুবিপুল দুর্ধর্ষ স্থায়ী সৈন্য বাহিনীতে পরিণত হইয়াছে এবং চিয়াংএর সহিত "সম্মিলিত ফ্রণ্ট" গঠন করিয়া জাপানী তস্করদের রুখিতেছে। ইতিহাসে গেরিল্লাবাহিনী সৃষ্টির আর একটি দিকও কিন্তু চোখে পড়ে: গেরিল্লা সংগঠন সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধতা না থাকিলেও, যদি ঔদাসীন্যও থাকে, তথাপি সেই ঔদাসীন্য উপেক্ষা করিয়া নিভীক বিপ্লবী জনসাধারণের স্বীয় অনুপ্রেরণায় গেরিল্লাদল গড়িয়া উঠিতে পারে। নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিবে।

জাপ-আক্রমণের প্রারম্ভে (১৯৩৭ সাল, ৭ই জুলাই) চীনের দুইটি শক্তিকেন্দ্র ছিল—উপরে বর্ণিত লালফৌজ (যাহা ইতিমধ্যেই বিরাট স্থায়ী সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হইয়াছিল) এবং চিয়াং কাইশেকের জাতীয় সরকার। কিন্তু জাপ অধিকৃত অঞ্চলে ১৯৩৭ সালের পর হইতে গেরিল্লাদল একে একে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহারা প্রথমে এই দুইটি শক্তিকেন্দ্রের অথবা অপর কোনো ষ্টেট্ বা সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা পায় নাই। ক্ষুদ্র হোপেই প্রদেশের বিভিন্ন গেরিল্লা দলগুলির কথা জানা থাকিলে তথ্য আরও সহজ হইবে।

(১) পিপিং সহরের সংলগ্ন গ্রামগুলিতে চাওতুঙের নেতৃত্বে যে গেরিল্লাবাহিনী দেখা দেয় তাহার পশ্চাতে এক রোমাঞ্চকর ইতিহাস রহিয়াছে। জাপানী আক্রমণের দুই একদিন পরেই চাওতুঙের মাতা মাদাম চাও এক ধনীর গৃহ হইতে কিছু অর্থ ভিক্ষা করিয়া সহর হইতে কোনো মতে আটটি "মজার" ও দুইটি "ব্রাউনিং" পিস্তল ক্রয় করিয়া পুত্রের হাতে দিলেন। চাওতুং ও তাহার পাঁচজন সহকর্মী একদিকে এই স্বল্প সাহায্য সম্বল করিয়া জাপানীর হাত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইতে লাগিলেন এবং অন্যদিকে জাপানীর বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য গ্রামে গ্রামে কর্মীদের সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইহা ভাবিতেও আশ্চর্য লাগে যে, এই ১০টি বন্দুক ও ছয়টি প্রাণী বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই দেড় হাজার যোদ্ধাকে মারণাস্ত্রে সজ্জিত করিয়া মরিয়া হইয়া লড়িবার জন্য সমবেত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। (২) হোপেই প্রদেশের মধ্যাঞ্চলে লু-চেঙ্-সাওএর নেতৃত্বে দ্বিতীয় দল গড়িয়া উঠে। তাহারা এই দলের নাম রাখিয়াছিল "হোপেই জনরক্ষাবাহিনী" (Hopei People's Self Defence Army). অবসর প্রাপ্ত রেলের কুলি ও কর্মী এবং কৃষকেরা এই দলকে পুষ্ট করে। (৩) তৃতীয় দল টৌমিং সহরকে কেন্দ্র করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হয়। ইহাদের দলে এক হাজার যোদ্ধা একত্রিত হয়। এই দলের সহিত যোগ দিয়া ২০০ ছাত্র কর্মী গ্রামে গ্রামে প্রচার কার্যে সাহায্য করিয়াছিল। (৪) হোপেই ও হেনান সীমান্তে "জেহিসিনে" চতুর্থদল দেখা দেয়। ইহারা সংখ্যায় প্রায় চার হাজার ছিল। (৫) হোপেই-হেনান ও শন্‌সি প্রদেশ যেখানে একত্র মিলিত হইয়াছে সেইস্থানে তৈহাব পার্বত্য অঞ্চলে আর একটি দুর্ধর্ষ গেরিল্লাদল গড়িয়া উঠে। তিয়েনসিং ইঞ্জিনিয়ার কলেজের অধ্যাপক ডাঃ ইয়াং সিং লিং এই দলের নেতা ছিলেন। (৬) ইতিমধ্যে পিপিং এবং তিয়েনসিন্ সহরে "উত্তর চীন জাতীয় মুক্তি সঙ্ঘ" (North China National Salvation Association) নামে যে সমিতি ছিল তাহা জাপানীর বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য নূতনভাবে সংগঠিত হইল। এই নবগঠিত দল "উত্তর-চীন জাপবিরোধী রক্ষা বাহিনী" (North China People's Anti-Japaneese

Self-Defence Committee. এই নূতন নাম গ্রহণ করিল। ১৯৩৯ সালে হোপেই প্রদেশের এই দলগুলিতে মোট যোদ্ধার সংখ্যা বিশ হাজারে পৌঁছিল।

বর্তমান লালফৌজের নেতৃত্বে এই বিচ্ছিন্ন দলগুলি একত্রে সংযোজিত হইয়া জাপানী সৈন্যদলে এক ভয়াবহ আতঙ্ক সৃষ্টি করিলেও ইহারা আপন প্রেরণায় জন্ম গ্রহণ করিয়া বহুদিন অবধি সবপ্রকার সরকারী সাহায্য হইতে বঞ্চিত ছিল। ষ্টেটের সাহায্যের অপেক্ষা না রাখিয়া জনসাধারণ একান্ত বাঁচিবার তাগিদে, আপন উদ্ভব ও আপন পন্থায় শত্রুকে রুখিবার জন্য গ্রামে গ্রামে গেরিল্লাদল সৃষ্টি করিতে পারে—চীনের বর্তমান ইতিহাস যদি কোনো আমাদের শিক্ষা দিয়া থাকে তবে ইহাই সেই শিক্ষা। (Epstein, Peoples war, chapter IV ; গরিলা যুদ্ধ ও বঙ্গদেশ শি, শ, মিত্র)।

চীনা লালফৌজের নিকট আরেকটি বিষয় আমাদের শিখিবার রহিয়াছে। সে হইল ইহার সংগঠন ও শিক্ষাদান পদ্ধতি। সামরিক শিক্ষাই চীনা গেরিল্লাদের প্রধানতম কার্য নহে। কমরেড্ শেং তে হোয়াই বলেন, "আমরা জনগণকে সংগঠিত করিবার জন্য সামরিক কর্মচারী অপেক্ষা রাজনৈতিক কর্মীই পাঠাইয়া থাকি বেশী। এই যুদ্ধে সামরিক শিক্ষা অপেক্ষা রাজনৈতিক প্রচারের অনেক বেশী প্রয়োজন। সামরিক শিক্ষা অন্যান্য শিক্ষনীয় প্রোগ্রামের একটি অংশ মাত্র। রাজনৈতিক শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষাই জনগণকে বিশেষভাবে দেওয়া হয়। লালফৌজে যে সমস্ত নূতন যোদ্ধা ভর্তি হয় তাহাদের অধিকাংশই চীনা চাষী ও নিরক্ষর। ইহাদের সকলকেই লিখিতে পড়িতে শিখানো হয়। সকালে ৬৷৷০ টায় শয্যাত্যাগ ও প্রাতঃ-কৃত্য, ৭৷৷০ হইতে শারীরিক ব্যায়াম, ৯৷৷০ প্রাতঃকালীন আহার, ১০টা ও ৪৷৷ টায় আহার, তারপর খেলাধূলা, জলসা প্রভৃতি রাত ৯টা বা অনেক সময় ১০টা পর্যন্ত চলিয়া থাকে ; তারপর নিদ্রা। চীনা গেরিল্লাদের শিক্ষা যে কেবল ক্যাম্পে দেওয়া হয় তাহা নয় ; সৈন্যদল যখন এক যায়গা হইতে অন্য যায়গায় মার্চ করিয়া যায় তখনও তাহারা পথিমধ্যে ক্লাস বসায়। যেদিন বেশী হাঁটিতে হয়, সেদিন বিশেষভাবে

ক্লাস বসানো অসম্ভব না হইলেও পথে চলিতে চলিতে সকলে মিলিয়া অথবা ছোট ছোট দলে একত্র হইয়া তাহারা আলোচনা করে।

সোভিয়েট গেরিল্লা বাহিনী

১৯৪১ সালের ২২শে জুন সোভিয়েট রাশিয়ার উপরে জার্মান আক্রমণ সুরু হয়। ৩রা জুলাই বিশ্বমানবের দরদী নেতা ও রাশিয়ার গণমুক্তির প্রতীক কমরেড ষ্টালিন সোভিয়েট জনসাধাণকে আহ্বান করিয়া বলেন, "জার্মাণ সৈন্যদলের পশ্চাদ্ভাগে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি কর যাহাতে শত্রুর পক্ষে টিকিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে"। ষ্টালিনের এই আহ্বানে সোভিয়েট রাশিয়ার গেরিল্লা আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠে। আজ কেবল রুশদেশের অধিকৃত অঞ্চলেই নহে, উত্তরে ফিন্‌ল্যাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে যুগোশ্লোভাকিয়া ও গ্রীস্ দেশ পর্যন্ত হাজার হাজার গেরিল্লাদল গড়িয়া উঠিয়াছে। এই গেরিল্লাদলগুলি নিপীড়িত জনসাধারণকে লইয়া এক নূতন বিপ্লবী সৈন্যদলের সৃষ্টি করিতেছে। ইহারাই সুযোগ মত মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদলের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ফ্যাসিবাদ ধ্বংস করিবে।

নাৎসী সৈন্যদল কোনও বিশেষ এলাকার অভিমুখে আসিতেছে এই খবর পাইবামাত্র সেই রুশীয় গেরিল্লারা যাবতীয় ফসল, তৈল, যন্ত্রপাতি, খাবার প্রভৃতি গাড়ীতে বোঝাই করিয়া আরও পিছনের দিকে লইয়া চলিয়া যায় অথবা লাল পল্টনের কাছে লইয়া গিয়া পৌছাইয়া দেয়। কিছু লোক এই মাল বোঝাই গাড়ীগুলি পাহারা দিতে দিতে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হয়। ইহার পর গরু বাছুর, শূকর, হাঁস, মোরগ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুগুলিকে খেদাইয়া নির্দিষ্ট জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া রাখার ব্যবস্থা করা হয়। অনেক জায়গায় গেরিল্লারা গ্রামকে গ্রাম জালাইয়া দিয়া লোকজন সকলকে লইয়া জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় খুঁজিয়া বাহির করে ও ছোট ছোট জঙ্গী গেরিল্লা দল গড়িয়া তোলে। কোন কোন জায়গায় গ্রামের কিছু লোক জঙ্গলে আশ্রয় লইয়া গেরিল্লা দল গঠন করে এবং কিছু

লোক জার্মাণ বর্বরদের হাতে নানা অত্যাচারের আশঙ্কা সত্ত্বেও গেরিল্লাদের সাহায্য-কারী দল হিসাবে গ্রামেই থাকিয়া যায়।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্থানীয় বল্‌শেভিক পার্টিকমিটির সম্পাদক, গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সভাপতি, কৃষি-সমবায় বোর্ডের সভ্য বা সভাপতি, ট্রাক্টর ষ্টেশনের পরিচালক কিংবা কোনও কৃষি-বিশেষজ্ঞ গেরিল্লাদলের নেতা হন। কোন কোন জায়গায় আবার অতি সাধারণ কৃষক ও মজুর যাহারা সেদিনও শান্তিময় জীবন যাপন করিত, তাহারাই বীরত্বের সঙ্গে এই সব গেরিল্লাদলের নেতা হিসাবে সম্মুখে আগাইয়া আসে।

গেরিল্লাবাহিনীর সাধারণ যোদ্ধা (Rank and File) কাহারা?

সোভিয়েট জীবনের প্রতিটি বিভাগের লোকই গেরিল্লাদলে যোগ দেয়। কৃষি-সমবায়ের সভ্যেরাই অবশ্য বেশী সংখ্যায় যোগ দিয়া থাকে; কিন্তু সূত্রধর, কর্মকার, কারিগর, কলকারখানার ডিরেক্টর, ম্যানেজার, শিক্ষক, এমনকি অশ্বপালকেরাও দলে দলে গেরিল্লা বাহিনীভুক্ত হয়। এই বিষয়ে একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। ইউক্রেইণে "পলিটুডিয়েল" কৃষিসমবায়ের কৃষকেরা গেরিল্লা দলে যোগ দিতে চায় বলিয়া সমবায়ের ক্লাবের পরিচালকদের কাছে দরখাস্ত করে। তাহাদের মধ্য হইতে যাচাই করিয়া সবচেয়ে ভাল ২৪ জনকে লইয়া একটি গেরিল্লাদল গড়িয়া তোলা হইল। রাশো-ফিনিশ (রুশ ও ফিনল্যাণ্ডের) যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়া পুরস্কার পাইয়াছে এমন একজন ডক্ মজুরকে এই বাহিনীর তত্ত্বত্রাসীদলের নেতা করা হইল। একজন সহকারী ডাক্তার প্রাথমিক শুশ্রূষা কেন্দ্রের ভার নিলেন। যুদ্ধ বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন কৃষককে জঙ্গী গেরিল্লাদলের কম্যাণ্ডার করা হইল। এইভাবে গেরিল্লাদলের সংগঠনের দিকটা সম্পূর্ণ হইল।

এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে সোভিয়েট রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীরাও গেরিল্লাদলে যোগ দিয়াছেন। একথা অবশ্য সত্য যে বেশীর ভাগ গেরিল্লা যোদ্ধা মজুর, কৃষক ও কুটীরশিল্পীর দল হইতে আসিয়াছে। কিন্তু তা' বলিয়া বুদ্ধিজীবীরা

নিজেদের প্রাণ লইয়া পলাইয়া যায় নাই; তাহারাও গেরিল্লাদলে সমবেত হইয়া মজুর কৃষক ও জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থ এক করিয়া দিয়াছে। ইউক্রেইনের উমান জিলার "সোভিয়েট ইউক্রেইন" নামক গেরিল্লাদলে গ্রামের ও সহরের বহু শিক্ষক আছেন। এক হাঁসপাতালের প্রধান ডাক্তার এক গেরিল্লাদলে কাজ করিতেছেন। সেই দলের নেতা এক ভূতপূর্ব নগররক্ষী (militiaman)। গেরিল্লারা যখন বিশ্রাম করে, তখন এই ডাক্তার বাবু তাহাদের প্রাথমিক শুশ্রূষা বিধান শিখাইয়া থাকেন! তাঁহার দুইটি মেয়ে "গ্যালিনা" এবং "নিনা" নার্স হিসাবে ঐ গেরিল্লা দলে কাজ করিতেছে। আর এক গেরিল্লা দলের মধ্যে আছেন একজন জঙ্গল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (forestry expert)। ভ্রমণকারী নাৎসী সৈন্যদল যে সব পথ জানে না সেইসব লুক্কায়িত পথে ইনি গেরিল্লা দলকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলেন। সোভিয়েটের নারী এবং শিশুরাও এই বিষয়ে পশ্চাৎপদ নয়। শিশুরা দৌত্য কার্যে বিশেষ উপকারে আইসে। স্কাউট এবং গুপ্তচরের কাজগুলিও ইহারা সহজেই হাতে লয়। কখন কখন আবার ইহারা রঙ্গীন পোষাকের নীচে হাতবোমা লুকাইয়া গ্রাম্য নৃত্যকৌশলের চমকপ্রদ মোহড়ায় নাৎসী পল্টনদের অন্যমনস্ক করিয়া দেয় এবং চকিতে হাতবোমা ছুঁড়িয়া মুহূর্তে কোথায় যেন মিলাইয়া যায়! তেমনি সোভিয়েট লালপল্টনের ছোটখাটো দল কোন কোন সময় যখন মূল সৈন্য বাহিনী হইতে পিছাইয়া পড়ে, অথবা জার্মান সৈন্যদলের অগ্রগতির ফলে নাৎসীদের পশ্চাদ্ভাগে আসল লালফৌজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহারা হতাশ হইয়া আত্মসমর্পণ করে না। তাহারা খণ্ডযুদ্ধ চালাইতে চালাইতে স্থানীয় গেরিল্লাদলে গিয়া যোগ দিয়া তাহাদের শক্তিশালী করিয়া তোলে।

গেরিল্লারা কী করিয়া অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করে?

এই প্রশ্নের উত্তর একটি বাস্তব উদাহরণ হইতেই ভালরূপ পাওয়া যাইবে। কমরেড ভোরোনফ তাঁহার গেরিল্লাদল গঠন করিয়াছেন: পশ্চাদপসরণের সময় লালপল্টনের কয়েকজন সৈন্য কয়েকটা রাইফেল্ ও কিছু হাতবোমা দিয়া গেল।

আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে এইমাত্রই সম্বল, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকেরই হাতিয়ার হইল 'হেঁসো'। এই লইয়াই কাজ আরম্ভ হইল, তাহাদের স্কাউট দল খবর দিল যে, কাছের কোন এক গ্রামে আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত এক জার্মাণ সৈন্যদল আসিতেছে। জার্মাণরা রাত্রে গ্রামে আসিয়া আশ্রয় লইল; পিছনে পেট্রোল আসিতেছে তাই অপেক্ষা করিতেছে। ভোরোনফের গেরিল্লারা চুপি চুপি গ্রামের কাছে আসিয়া পৌঁছিল। অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে ভোরোনফ্ এবং তাহার আর একজন সাথী পাহারাদারদের মারিয়া ফেলিল! তারপর সম্পূর্ণ গেরিল্লা দলটি দুইভাবে বিভক্ত হইয়া গ্রামের উভয় দিক হইতে জার্ম্মাণদের উপরে আক্রমণ চালাইয়া ট্যাঙ্কচালক ও মোটর সাইকেল চালকদের কুঠার বা হেঁসো দিয়া কাটিয়া ফেলিল। এত আকস্মিক অথচ এমন তীব্রভাবে আক্রমণ চালান হইল যে জার্মাণরা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। তাহাদের মাত্র তিনটি ট্যাঙ্ক গুলী চাইবার সময় পায়, কিন্তু হাতবোমার সাহায্যে নিমেষে তাহাদের শেষ করিয়া দেওয়া হইল। তারপর গেরিল্লারা জার্মাণদের 'মেসিনগান' দখল করিয়া তাহা জার্মাণদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। এই যুদ্ধের ফলে ৪০ জন জার্মাণ মারা পড়িল, গেরিল্লাদের হাতে যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র আসিল। সেই সব লইয়া তাহারা আবার জঙ্গলে ফিরিয়া গেল।

সন্ত-গঠিত যে-কোনও গেরিল্লাদল প্রথমে সাধারণতঃ শত্রুর ছোট ছোট দলকে আক্রমণ করে; তাহাদেরই অস্ত্রশস্ত্রে নিজেদের সজ্জিত করিয়া তবেই বড় কাজে হাত দেয়। জার্মাণদের স্কাউট বা তত্ত্বতল্লাসী দল বাহির হইয়াছে, তাহাদের আক্রমণ করো; জার্মাণ সংবাদ-বাহক খবর লইয়া চলিয়াছে, তাহাকে মারো; জার্মাণরা কোন গ্রামে আসিয়া রাত্রে আশ্রয় লইয়াছে—তাহাদের প্রহরীদের নিঃশব্দে আক্রমণ করিয়া গলাটিপিয়া শ্বাসরোধ করিয়া মারো অথবা জোর লাঠির আঘাতে একেবারে ঠাণ্ডা করিয়া দাও। প্রথমে এমনি ভাবে কাজ আরম্ভ করিয়া গেরিল্লারা ক্রমশঃ রাইফেল, হাতবোমা, হাল্কা মেসিনগান প্রভৃতি যোগাড় করে। এই অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে আবার বড় দল আক্রমণ করিয়া শত্রুকে পরাজিত করা হয়;

৩

ফলে আরও রাইফেল্, আরও হাতবোমা ও গুলীগোলা হাতে আসিয়া পড়ে। এই প্রকারে গেরিল্লাদের অস্ত্রশক্তি ক্রমাগত বাড়িতে থাকে।

যে সমস্ত গেরিল্লাদল ফ্রণ্টের কাছাকাছি থাকিয়া লালপল্টনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া কাজ করিবার সুবিধা পায়, তাহারা কোন কোন সময় লালফৌজের নিকট হইতেও কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাইয়া থাকে। কিন্তু গেরিল্লাদলের সাধারণ নিয়ম এই যে, তাহাদের স্বাবলম্বী হইতে হইবে এবং শত্রুর নিকট হইতে হাতিয়ার কাড়িয়া লইয়া নিজেদের সুসজ্জিত করিয়া তুলিতে হইবে।

সোভিয়েট গেরিলাদের কর্মকলাপ

জার্মাণ সৈন্যদলের রসদ, তৈল ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ ধ্বংস করা ও প্রায় দুই হাজার মাইলব্যাপী যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের মধ্যে পরস্পরের সংযোগ ছিন্ন করাই হইয়াছে গেরিল্লাদের প্রথম কাজ। তাহাদের দ্বিতীয় কাজ হইয়াছে, বিমান ঘাঁটি এবং পেট্রোল, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ জমা রাখিবার স্থানগুলি ধ্বংস করা। যতই ঢাকা দিয়া বা যে কোন উপায়ে লুকাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের দুর্গম অঞ্চলে যুদ্ধের উপকরণ রাখার বন্দোবস্ত করা হউক না কেন, কৃষকের নজর তাহা এড়াইতে পারে না। দেশের কৃষকশ্রেণী দেশের প্রতিটি ইঞ্চি জমির সঙ্গে পরিচিত। তাই তাহারা প্রতিটি খবর অতি শীঘ্র গেরিল্লাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারে এবং গেরিল্লাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ঐ সকল জায়গা ও জিনিষের ধ্বংস সাধন করে। গেরিল্লাদের তৃতীয় কাজ, সৈন্যদলের অফিসারদের হেড কোয়ার্টার্স বা আড্ডাগুলি আক্রমণ করিয়া অফিসাদের ধ্বংস করা। তাহাদের চতুর্থ কাজ হইতেছে, শত্রুর নৈতিক শক্তি ও সাহস নষ্ট করিয়া দেওয়া।

প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে কিছুদিন লড়াই করিবার পর সৈন্যেরা বিশ্রাম করিবার ছুটি পাইত ও যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাতে আসিয়া বিশ্রাম করিত। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধে সোভিয়েট গেরিল্লাদের হঠাৎ আক্রমণ জার্মাণ সৈন্যদলের মনের অবস্থা এমন করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহারা ভয়ে কোন জায়গায়ই নিশ্চিন্তে

বিশ্রাম করিতে বা চলাফেরা করিতে পারে না। প্রতি রাস্তার বাঁকে, প্রত্যেক ঝোপের আড়ালে, প্রত্যেকটি জলাভূমির নলখাগড়ার জঙ্গলে তাহারা গেরিল্লার ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে। গেরিল্লাদের কার্যকলাপের ইহা হইল প্রধান নীতি ও ধারা—উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহাদের কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। স্থান কাল পাত্র ও অবস্থা অনুযায়ী তাহারা স্বকীয় কৌশল ঠিক করিয়া নেয় ও সেই অনুযায়ী চলে। তাহাদের কাজের কয়েকটি নমুনা দেখিলেই আমরা তাহাদের কৌশল অনেকটা বুঝিতে পারিব। রাস্তা দিয়া জার্মাণ সৈন্যদলের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রসদাদি লইয়া ঘোড়া-টানা কয়েকটি মালগাড়ী যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চলিয়াছে। রক্ষীদলের অজ্ঞাতসারেই গেরিল্লা সন্ধানীরা দুই দিন ধরিয়া ঐ মালগাড়ীর পিছনে পিছনে চলিয়াছে এবং তাহারা স্থানীয় গেরিল্লাদলকে এই মালগাড়ীগুলি কোন রাস্তা দিয়া যাইতে পারে তাহার খবর দিয়া দিয়াছে। গেরিল্লারা আসিয়া পৌঁছিল এবং রক্ষীদলকে জঙ্গলের মধ্যে যাইতে প্রলুব্ধ করিবার জন্য কয়েকবার গুলী চালাইল; তবু নাৎসী সৈন্যেরা সেদিকে নজর দিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট-তত্ত্বতল্লাসী-বিমানের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য মালগাড়ীগুলি লইয়া জার্মাণরা জঙ্গলে ঢুকিল। গেরিল্লাদের মহা সুযোগ! তাহারা ঐ মালগাড়ীর সম্মুখের দিকে জঙ্গলে আগুন লাগাইয়া দিল ও পিছন দিক হইতে মেসিনগানের সাহায্যে গুলী বর্ষণ করিতে লাগিল। জার্মাণরা ঘাবড়াইয়া গিয়া পলাইতে লাগিল। ঘোড়াগুলি আগুন, ধোঁয়া ও গুলির চোটে বিগড়াইয়া গিয়া গাড়ী ভাঙিয়া, চালকদের মাড়াইয়া উর্ধ্বশ্বাসে এদিক-ওদিক ছুটিল। এই কাজের ফলে ৪২টি লরী এবং ৩২ গাড়ী বোঝাই খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র, এঞ্জিনিয়ারীং মালপত্র ও তিনটি বেতার যন্ত্র গেরিল্লাদের হস্তগত হইল। ৩৭ জন জার্মাণ সৈন্যকে গেরিল্লারা পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মারিয়া ফেলিল।

["We are Guerrillas"-এর আংশিক অনুবাদ]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতে গেরিল্লা সংগঠনের সূচনা

গেরিল্লা দল গঠনের ভিত্তি স্বরূপে আমাদের বর্ত্তমান কার্যপদ্ধতি নিম্নলিখিত ৪ ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে:—(১) অর্থনৈতিক (২) রাজনৈতিক (৩) এবং (৪) সামরিক।

অর্থনৈতিক ঃ আজ দিকে দিকে অন্ন বস্ত্রের অভাবে হাহাকার উঠিয়াছে। কেরোসিন নাই, চিনি ও লবণ পাওয়া কঠিন, চালের দর আগুন। খাদ্য সরবরাহ ও ন্যায্য মূল্য নির্দ্ধারণের কিছুমাত্র সুরাহা হইতেছে না। সস্তায় "ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়", গভর্ণমেণ্ট যাহা সরবরাহ করিবেন আশা দিয়াছিলেন, তাহা আজও তেমন জুটিল না। এদিকে ক্রমেই মজুরদের দুরবস্থা চরমে উঠিতে চলিল। এই সমস্যার খানিকটা সমাধান হইতে পারে যদি খাজনা, দেনা স্থগিত রাখা হয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে বিনা সুদে কৃষিঋণ দেওয়া হয়।

এই কাজে আমাদের শ্লোগান হইবে (অ) জিনিষ সরবরাহ কর ; (আ) দাম বাঁধিয়া দাও ; (ই) আরও খাদ্য উৎপন্ন কর ; (ঈ) ঋণ আদায় স্থগিত রাখ ; (উ) জমির খাজনা কমাও ; (ঊ) পতিত জমি বিনা সেলামি ও বিনা খাজনায় বিলি কর। এই শ্লোগানগুলিকে সার্থক করিবার জন্য সভা সমিতি, শোভাযাত্রা, ভূখ-মিছিল (Hunger March), গণ দরখাস্ত (Mass Petition) এবং জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট সদলে দরবার (Mass Deputation) করার প্রয়োজন হইবে। যেখানে দরকার সেখানে জমিদার ও কৃষকের মধ্যে আপোষে জমি ও ঋণ সম্পর্কীয় সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। ইহা ছাড়া, অতিলোভী ব্যবসাদারদের উপর নজর রাখা, তাহাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা, তাহাদের সঞ্চিত লুকায়িত মাল খুঁজিয়া বাহির করাও প্রয়োজন। তথা-কথিত মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধি বাতিল হইয়াছে। তবে যেখানে তাহারা ঘাঁটী আগলাইয়া

ছ্যাঁচামি জুড়িয়াছে দেখা যাইবে, সেখানে একমাত্র পথ হইল জনমতের সমষ্টিগত চাপ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এবং লোভী ব্যবসায়ীদিগের উপরে আনিয়া ফেলিয়া জনসাধারণের দাবীগুলি আদায় করা।

(২) **রাজনৈতিক :** জাপান আমাদের স্বাধীনতা দিবে না ; দিতে পারে না—ইহা সোজাসুজি বুঝাইয়া দিতে হইবে—কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, চীন প্রভৃতি জায়গা এ পর্যন্ত লুণ্ঠনই তাহাদের একমাত্র কাজ হইয়াছে, co-prosperity বা সম-সমৃদ্ধির শ্লোগান একটা ভাঁওতা ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহার সোজা অর্থ হইল সমৃদ্ধ জাপানের গোলামী কর। "এশিয়াবাসী এক হও"—ইহার অর্থ জাপানের তাঁবেদার হইয়া তাহারই অধীনে এক হও। সাদা ও হলদে শোষণ নীতি বা সাম্রাজ্যবাদ একই ভাবে ঘৃণ্য ও পরিত্যজ্য। পুরানো ব্যক্তিতান্ত্রিক সাম্রাজ্য বাদের অর্থাৎ বৃটিশ ও মার্কিণ শোষণনীতির দিন আজ ঘনাইয়া আসিয়াছে। বর্তমান যুদ্ধের ভিতর দিয়া জাগ্রত জনশক্তির যাঁড়াশী চাপে পড়িয়া ইহা নিষ্পিষ্ট হইবে এবং ইহাদের জরাজীর্ণ কাঠামো ঝুর ঝুর করিয়া তাসের ঘরের মত খসিয়া পড়িবে। অপর পক্ষে আজ মিত্র শক্তির পরাজয় হইলে অর্থাৎ সেই সঙ্গে ভারতবর্ষ ফ্যাসীবাদী শক্তির কবলে গিয়া পড়িলে আজ ফ্যাসিষ্ট সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেষণে আরো ২।৩ শত বৎসর পর্যন্ত আমাদের শিথিল শিকল কায়েম হইয়া বসিবে।

অতএব যখন "**জাপানকে রুখ্‌তে হবে**" বলিতেছি তখন মনে করা না হয় যে, আমরা জাপানী ও ইংরেজ শাসনের মধ্যে দ্বিতীয়টাকে মনোনীত করিতেছি। আজ দরকার জনশক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ ও সচেতন করিয়া তোলা, ঐক্যবদ্ধ জনদাবীর মারফতই আমাদের জাতীয় সরকার আসিতে পারে, আর তাহা আসিলেই পূর্ণ স্বাধীনতার সিংহদ্বার উন্মুক্ত হইল। অতএব যখন বলিতেছি, "হিন্দু-মুসলমান কংগ্রেস-লীগ এক হও" তখন মনে না করা হয় যে, স্বাধীনতা আন্দোলনকে আমরা এড়াইয়া যাইতেছি। জাতীয় সরকার পাইলেই তবে জাপানকে রুখা সম্ভব, এবং তাহা পাইবার উপায় হইল জাতীয় অনৈক্য দূর করা—যাহার উপর বাণিজ্য করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ

আজও পুষ্ট হইতেছে। আজিকের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটী সুবৃহৎ পট ভূমিকা রহিয়াছে : "এক হও" মানে "এক হইয়া জাতীয় সরকার কায়েম করো", জাতীয় সরকার কায়েম করার উদ্দেশ্য "জাপানকে রুখতে হ'বে," জাপানকে রুখার অর্থ হইল স্বাধীন ভারতকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে। অবশ্য আজ "জাপানকে রুখতে হবে," বলিলে সামরিক দিকটার অপেক্ষা রাজনৈতিক দিকটার গুরুত্ব বেশী করিয়া বুঝাইবে। অর্থাৎ হাতে হাতিয়ার নাই তবু "জাপানকে রুখতে হবে" বলি কোন অর্থে? এই শ্লোগান ব্যবহার করিয়া ভ্রান্ত দেশ প্রেমিকের জাপপ্রীতি খণ্ডন করাই মূল উদ্দেশ্য।

(৩) **কৃষ্টিমূলক:** দেশপ্রেমের উদ্বোধক ও জাপবিরোধী জনসঙ্গীত, জননাট্য, প্রাচীর চিত্র প্রদর্শনী প্রভৃতি হইতে মনের খাদ্যও যেমন মিলিবে, তেমনি ফ্যাসিবিরোধী মনোভাবও গঠিত হইবে। প্রত্যেকটি বড় বড় সভায় গান গাহিয়া এবং জনসাধারণের বহুবিধ দাবিদাওয়াকে ভিত্তি করিয়া নাট্য অভিনয় করিলে যতখানি লোকের চিত্তাকর্ষণ করা সম্ভব, অন্য হাজার হাজার বক্তৃতায় তাহা সম্ভব নয়। অতএব এদিকে আমাদের ভলান্টিয়ার বাহিনীর বিশেষ নজর রাখিতে হইবে।

(৪) **সামরিক:** এই শিক্ষা হইবে—(ক) আলোচনামূলক (theoretical) এবং (খ) ক্রিয়ামূলক (practical).

(ক) আলোচনামূলক—অর্থাৎ, (১) বিভিন্নপ্রকারের যুদ্ধ ও যুদ্ধের ঐতিহাসিক ধারা, (২) গেরিল্লা যুদ্ধের তাৎপর্য, নীতি ও কৌশল, (৩) বাংলায় (তথা ভারতে) গেরিল্লা যুদ্ধের সাফল্য কিসের উপর নির্ভর করে, (৪) গেরিল্লা ও জনগণের সম্বন্ধ (৫) এদেশে কেমন করিয়া গেরিল্লাবাহিনী গড়িতে হইবে, (৬) শত্রু আক্রমণের কৌশল ও নৈশ অভিযান, (৭) দেশের ভূগোল ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে হইবে।

(খ) ক্রিয়ামূলক শিক্ষা (Practical Training)—(অ) একটী দলে ড্রিল (Squad drill)—আমরা পায়ে পা মিলাইয়া লেফট্ রাইট্ করানোর

দিকে বেশী নজর দিব না, কেন না গেরিল্লাদের ড্রিলের মারফত শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্ত্তিতা শিখিতে হয় না, বিপ্লবী দেশকর্মীর স্বতঃপ্রণোদিত শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতাই গেরিল্লার সম্বল। বিশেষতঃ গেরিল্লা যুদ্ধে নিঃশব্দে লাইন ভাঙিয়া ছোট ছোট দলে—এমন কি দুইজনে বা এককও সময় সময় কাজ চালাইতে হয়। সেখানে ড্রিলের বাস্তব সার্থকতা কিছুই নাই। তৃতীয়তঃ আমাদের হাতে সময় অল্প, তাই নিতান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি কুচকাওয়াজ আমরা শিখিব যাহাতে এক সঙ্গে অনেকে মিলিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চলিতে ফিরিতে ও কাজ করিতে পারি। বাংলায় হুকুম দেওয়ার প্রচলন করিলে ভাল হয় মনে করিয়া নিম্নে তাহার রূপ লেখা হইতেছে :—

. ড্রিল :—(১) কমরেডস্—(আহ্বান—Squad Section, বা Comrades); (২) এক লাইনে বা দুই অথবা তিন লাইনে,—(বাঁ) ধো [ব্যাকেটের অক্ষর উহ্য রাখিয়া পরেরটি জোরো উচ্চারণ করুণ]; (৩) বামে বা ডাইনে দেখে লাইন—(সা) জো (Right or left dress); (৩) তৈয়ার হও Attention); (৫) আরাম হও (Stand at-ease); (৬) আরামে —(দাঁ) ড়াও (Stand-easy); (৭) ডাইনে বা বামে অথবা পিছনে—(ঘু) রো (Rt. or left or About turn); (৮) চ'ল্‌বার তাল্—(ঠু) কো (Quick Mark—time); (৯) (রু) খো (Halt); (১০) এক কদম সাম্‌নে—(বা) ড়ো (One Step forward Quick—march); (১১) দু কদম পিছে—(হ) ঠো (Two step backward Quick—march); (১২) আগে—(চ) লো (Quick—march); (১৩) জোড়ে —দৌড় (Double Quick—march); (১৪) ধীরে—(চ) লো (Break into Quick—march) (১৫) বামে বা ডাইনে অথবা পিছনে—(বাঁ) কো (left or right or about wheel); (১৬) পিছনে—(ঘু) রো (চলতি অবস্থায়, Turning or move); (১৭) ডাইনে বা বামে—(ঘু) রো (চলতি অবস্থায়, marching in a time); (১৮) লাইন—(ভা) ঙো (Break up); (১৯) ছুটি—লও (Dis-miss)।

এই দফাগুলি শিক্ষার্থীরা শিখিবার পর তাহাদের প্রত্যেকে এক এক জন করিয়া হুকুম বা কম্যাণ্ড দিবার কায়দা শিখিবে। প্লেটুন ড্রিল প্রভৃতির বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে জানিয়া রাখা দরকার যে, সাধারণতঃ ৮ হইতে ১০।১৫ জন ভলাণ্টিয়ার লইয়া একটী সেকশান হইবে; তিনটি বা চারটি সেকশান লইয়া একটি প্লেটুন রচনা করা যাইবে; তিনটি প্লেটুন লইয়া একটী কোম্পানী (Company) এবং দুই বা তিনটি কোম্পানী লইয়া একটি ব্যাটালিয়ান (Battalian) গঠন করিতে হইবে। প্রত্যেকটি ইউনিট বা দলের দলপতি বা নায়ক বা কম্যাণ্ডার এবং সহকারী কম্যাণ্ডার বা দ্বিতীয় নায়ক থাকে। সেকশান হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর উপরে ব্যাটালিয়ান কম্যাণ্ডার পর্যন্ত একে আরেকের উপর কর্তৃত্ব করিবে।

ক্রিয়ামুলক শিক্ষার দ্বিতীয় দফা

ক্রিয়ামূলক শিক্ষার বিষয় আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিষের আলোচনা করিতে হয়। নিয়ে তাহাই করা হইতেছে।

(১) দ্রুত সৈন্য সমাবেশ করা (Rapid deployment)—ইহার ড্রিল হইতেছে দলগুলি গুটাইয়া আনা (close)। আক্রমণ বা আত্মরক্ষার সময় প্লেটুন বা কোম্পানী প্রভৃতির ইউনিটগুলি দলে দলে ভাগ করিয়া দিকে দিকে প্রয়োজনানুযায়ী সন্নিবিষ্ট করিবার ইহাই হইল একটী কৌশল।

(২) ইউনিটগুলি এবং প্রত্যেক ইউনিটের যোদ্ধাকে ছড়াইয়া দেওয়ায় (Extend) এবং গুটাইয়া যথাস্থানে পূর্ব্ববৎ লইয়া আশা (close), প্রত্যেক সেকশান পরস্পর ১০।১৫ বা ২০ হাত দূরে এবং সেকশানের প্রত্যেক পরস্পর ৪।৫ হাত অন্তর ছড়াইয়া শত্রুকে সামনে রাখিয়া প্রায় একই লাইনে পাশাপাশি শুইয়া যথা সম্ভব আড়ালের আশ্রয় লইবে।

(৩) ব্যূহ রচনা (war formation)—শত্রুর সৈন্য সংখ্যা ও সমাবেশ প্রণালী জানিয়া লইয়া নিজের সৈন্যগুলিকে প্রয়োজন মত সম্মুখে পিছনে ও দুই পার্শ্বে

যথাক্রমে বেশী বা কম সংখ্যায় সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে। সমচতুষ্কোণ, ত্রিকোণ প্রভৃতি নানা আকারে ব্যূহ রচনা করা যাইতে পারে।

(৪) মাটি কামড়ানো বা শুইয়া পড়া (To lie down)—দাঁড়াইয়া থাকা কালীন প্রথমে বাম পা এক কদম সামনে বাড়াইয়া একটু আড়াআড়ি হেলিয়া আপনার ডান পাশে স্থাপন করুন; দ্বিতীয় কায়দা হইতেছে—সামনে ঝুঁকিয়া বাম হাত (এবং হাতে অস্ত্র না থাকিলে, ডান হাত ও) মাটিতে রাখুন ; তৃতীয়তঃ (ডান হাতে অস্ত্র থাকিলে ঐ হাতের কুনুই মাটিতে রাখুন এবং সঙ্গে সঙ্গে) দেহ পিছনে ছুড়িয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া শুইবেন। শুইবার সময়ে মনে রাখিবেন যে কোন প্রকার আড়ালের পিছনে আপনাকে শুইতে হইবে।

(৫) হাত বোমা ছুঁড়িবার কায়দা (হাত বোমার পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(৬) বুকে হাঁটা (crawling)—শোয়া অবস্থা হইতে অগ্রসর হইতে হইবে। ক্রমান্বয়ে ডান ও বাম পা দুখানি হাঁটু ভাঙ্গিয়া এবং পায়ের গোড়ালি নিতম্বের উপর হইবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখে প্রসারিত বিপরীত (oppiosite) হাতের উপর ভর রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সেই সময়ে আবার হাতখানি মাটি ঘেঁসিয়া সম্মুখে প্রসারিত রাখিবেন।

(৭) আড়াল লওয়ায় (Taking Cover) "আড়াল লইবার কায়দা" দেখুন।

(৮) দূরত্ব নির্ণয়—"দূরত্ব নির্ণয়" অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(৯) Cross firing and advancing (কোণাকুণি গুলি করা এবং নিজেদের গুলির আড়ালে নিজেরা শত্রুর অভিমুখে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া)—শত্রু যখন খোলা মাঠে সম্মুখে আড়াল রাখিয়া আমাদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে তখন তাহার দেহকে কোণাকুণি-ভাবে তাক করা উচিত ; ইহাতে তাহার সম্মুখের আড়ালকে যেমন ব্যর্থ করা যায়, তেমনি গুলির পরিসরে লক্ষ্যবস্তুও পাওয়া যায়। যখন সৈন্যের ছোট ছোট ইউনিটগুলি পাশাপাশি অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ করিতে থাকে তাহাদের পক্ষেও কোণাকুণি গুলি করিবার কৌশল অধিকতর প্রযোজ্য। পাশাপাশি পরপর অনুপ্রান্থিক বা কোণাকুণিভাবে গুলি করিবে। সকলেই যদি সোজাসুজি

সম্মুখে গুলি চালনা করিতে থাকে, দেখা যাইবে পরস্পরের গুলির গতিপথের মধ্যে বেশ খানিকটা প্রকাণ্ড নিরাপদ স্থান থাকিয়া যায় এবং শত্রুদল নির্বিবাদে এই পথগুলি বাহিয়া আগাইয়া আসিতে পারে। অনেক সময় এক মাইল বা দেড় মাইল দূর হইতেই শত্রুর অগ্রগতি অলক্ষ্যে থাকিলেও বাধা দিবার উদ্দেশ্যে গুলি চালনা করিতে হয়। এই অবস্থায় শত্রুকে দেখিয়া দেখিয়া গুলি করা সম্ভব নয়; এই সময় কোণাকুণি গুলি না করিলে পরস্পরের গুলির মধ্যবর্ত্তী পথে শত্রুদল অগোচরে ও নিরাপদে অগ্রসর হইতে পারে; কিন্তু কোণাকুণি গুলি চলিলে সম্মুখ ভাগে শত্রু আসিবার যে কোনও লাইনের ভিতর—একস্থানে না হয় আরেক স্থানে গুলির আঘাতে আহত হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে পাশাপাশি সেকশন্‌গুলি যদি ১নং দক্ষিণ দিকে, ২নং বাম দিকে, আবার ৩নং দক্ষিণ দিকে, ৪নং বাম দিকে এইভাবে বরাবর গুলি করিয়া যায়, দেখা যাইবে যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বস্থানে গুলির জাল বুনিয়া গিয়াছে। এই জালকে ভেদ করা শত্রুর পক্ষে সম্ভব নয়।

এই কোণাকুণি গুলি চালনার আরেকটি বিশেষ সুবিধা আছে। যখন দুই পার্শ্বে আমাদের সৈন্যদলগুলি কোণাকুণি গুলি চালাইতে থাকে তখন মধ্যস্থলে কয়েকটি সৈন্য ট্রেঞ্চ বা আড়াল হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে, দুই পাশ হইতে গুলি চালাইলে মধ্যস্থলে খানিকটা নিরাপদ স্থানের সৃষ্টি হয়। এই স্থানের সুবিধা গ্রহণ করিয়া সারা ফ্রণ্ট লাইন ব্যাপিয়া ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট সৈন্যদল অগ্রসর হয় এবং পরে ইহারাই আবার কিছুদূর অগ্রসর হইয়া থামিয়া নিজেদের আড়াল করিয়া পাশাপাশি ছড়াইয়া শুইয়া পর পর কোণাকুণি গুলি করিতে থাকে। তখন এই অগ্রবর্ত্তী দলগুলির দ্বারা কোণাকুণি গুলি চালনার ফলে পিছনের দলগুলি আবার সম্মুখে নূতন নিরাপদ স্থানের সুবিধা পাইয়া অগ্রসর হইতে থাকে। একে অপরের সাহায্যে অগ্রসর হওয়া। গুলি করিতে করিতে অগ্রসর হইবার এই কৌশল যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী হইয়া থাকে। অগ্রসর হইবার কৌশল নির্ভর করিবে জমির গঠনের উপরে—তবে সব সময়েই নিরাপত্তা ও নিঃশব্দতা রক্ষা রক্ষা করিয়া যতখানি সম্ভব দ্রুত অগ্রসর হইবার অভ্যাস করিতে হইবে।

(১০) স্কাউটিং ও পেট্রলিং—উক্ত পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(১১) যুদ্ধের মহড়া (Mock fight)—আপনার ভলান্টিয়ার বাহিনীকে দুই দলে ভাগ করিয়া এক দলকে নকল শত্রু হিসাবে কোন নির্দিষ্ট বাড়ী অথবা প্রাঙ্গনে বা বাগানে বসাইয়া আসুন। সেখান হইতে দু এক মাইল দূরে গেরিল্লা ঘাঁটি স্থির করিয়া অপর দলকে জমায়েত করুন। এই দলটি আক্রমণের মহড়া দিবে। ["নৈশ অভিজান" অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]

(১২) Comouflaging—আত্মগোপন বা শত্রু ঠকানো—"আড়াল লইবার কায়দা" পরিচ্ছেদ দেখুন।

(১৩) Signalling বা সঙ্কেত করণ ["নৈশ অভিযান" এবং "স্কাউটিং-পেট্রলিং" পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]

(১৪) জু-জুৎ-সু—["নিরস্ত্র অবস্থায় আত্মরক্ষা কৌশল" দ্রষ্টব্য]

(১৫) Topography—জমির গঠন বা দেশের ভৌগলিক আকৃতি, বিস্তারিত ম্যাপ ও স্থানীয় ভৌগলিক বিবরণ পড়িয়া এই সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করা সম্ভব। কিন্তু পায়ে পায়ে হাঁটিয়া ব্যক্তিগত বাস্তব জ্ঞান অর্জন করাই হইবে গেরিল্লার বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য। ম্যাপ তৈয়ারীর সাধারণ ইঙ্গিত এখানে দেওয়া হইল :—এক একটী এলাকায় স্কোয়ড বিভিন্ন রাস্তা ধরিয়া পাঠাইয়া দিন—তাহাদের হাতে কাগজ ও পেন্সিল থাকিবে। ঘড়ির কাঁটায় অনেকের কম্পাস থাকে তাহার সাহায্যে অথবা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিরা প্রথমে দিক ঠিক করিয়া লইবেন। বিভিন্ন বড় রাস্তা ধরিয়া একবার এলাকাটি ঘুরিয়া মোটামুটি সীমানা ঠিক করিয়া যান। চারিদিকে চোখা নজর ও সতর্কতার সঙ্গে চলিতে হইবে। Outer boundery (বাহিরের সীমানা) হইতে সুরু করিয়া এলাকাকে ক্রমশঃ squceze (ছোট) করিয়া পর পর রাস্তা প্রভৃতির—পারস্পারিক দূরত্ব নির্দেশ করিয়া ম্যাপটি আঁকিতে হইবে। বিভিন্ন, রাস্তা, গলি, চৌমাথা, তেমাথা, রাস্তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ইত্যাদি কাগজে স্কেল বা মাপ অনুযায়ী আঁকিতে হইবে। তারপর কোন রাস্তা সদর, কোনটা ভিতরে গিয়াছে, কোন রাস্তা পাকা বা পীচ ঢালা, কি

কাঁচা, রাস্তার দুই ধারে দ্রষ্টব্য প্রধান প্রধান বাড়ী, ইঁদারা, টিউব ওয়েল, জলের কল, পাঠশালা, হাট, বাজার, ডাক বাংলো, ডাক্তারখানা, মিউনিসিপ্যাল অফিস, খেলার মাঠ, ট্রেজারী, জেলখানা, কোর্ট বা কাছারি, জমিদারের সেরেস্তা, পুল বা সেতু, পায়ে চলার রাস্তা, বন-জঙ্গল, উঁচু নীচু জমি, জলা জমি, পুকুর, বিল বা খাল, ডাকঘর, রেল লাইন, রেলওয়ে গেট (level crossing), চারিপাশের জমির বর্ণনা (অর্থাৎ চারিধারে খোলা মাঠ কি ধানের না অন্য শস্যের জমি, মাঠ ফাঁকা কি তৃণ গুল্মে ঢাকা), গাছ পালার বিবরণ, নদী বা পয়ঃপ্রণালী আছে কিনা—তাহা বিশেষ বিশেষ চিহ্ন আঁকিয়া মানচিত্রে দেখাইতে হইবে। ঘণ্টায় তিন মাইল হিসাবে হাঁটিয়া সময় অনুযায়ী দূরত্ব ঠিক রাখিবেন এবং দিক ভুল না হয় তাহা দেখিবেন।

ক্রিয়ামূলক শিক্ষার তৃতীয় দফা

রাইফেল ড্রিল :—আমাদের রাইফেল নাই ; অতএব ৪৪ ইঞ্চি লাঠি রাইফেলের মাপে কাটিয়া ড্রিল করিতে হইবে। হুকুমের পদ্ধতি সবই Squad Drill এর মত—তবে রাইফেল লইয়া চলিবার, উঠাইবার বা নামাইবার স্বতন্ত্র কায়দা আছে—যথা,

(১) তৈয়ার হও—এই (attention) অবস্থায় রাইফেল ডান পায়ের পাতার ডান পাশে অথচ প্রায় মাথার সীমানায় রাখিয়া, পা কোণাকুণি জড় করিয়া এবং ডান হাতে রাইফেল টানিয়া শরীরের সমান্তরাল করিয়া, বাঁ হাত প্রস্তুত অবস্থায় রাখিয়া শরীর ঋজু করিতে হইবে এবং বক্ষস্থল স্বাভাবিকভাবে স্ফীত রাখিয়া সম্মুখে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(২) আরাম হও—শুধু বাঁ পা বাঁ দিকে বারো ইঞ্চি সরাইয়া, রাইফেলের গোড়া ঠিক রাখিয়া, উপরটা ডান হাতে ঠেলিয়া সামনে লউন ও ডান হাতে তীর্যকভাবে ধরিয়া রাখুন। বাঁ হাত স্বাভাবিকভাবে শরীরের বাঁ দিকে ঝুলিবে।

(৩) আরামে দাঁড়াও—সব ঠিক থাকিবে, কেবল ডান হাতটি একটু উঠিয়া স[illegible]রিয়া লাঠির মাথার দিকে সরিবে।

(৪) রাইফেল—(কাঁ) ধে (Snoulder Arms) অর্থাৎ প্রস্তুত অবস্থা হইতে রাইফেল ডান হাতে ছুঁড়িয়া সেই মুহূর্তে প্রায় ডান হাটুর উপর পর্যন্ত তুলিবেন, সঙ্গে সঙ্গে টাল রাখিবার জন্য বাম হাতে রাইফেলের উপর অংশটা ধরুন—ইহা হইল এক নম্বর অবস্থা ; পর মুহূর্তে বাঁ হাত সট্ করিয়া ছাড়িয়া যেমন ছিল শরীরের বাঁ পাশে সোজা তেমনি রাখিবেন। ইহা দুই নম্বর অবস্থা। "এক"—"দুই"—এইভাবে প্রায় আধ সেকেণ্ড করিয়া মোট এক সেকেণ্ড সময় উক্ত দুই অবস্থায় আসিতে লাগিবে।

(৫) রাইফেল কাঁধে—(উ) ঠাও (Slope Arms) অর্থাৎ "রাইফেল কাঁধে"—এই হুকুমের প্রথম কায়দার পরে বাঁ হাতে রাইফেলের উপরিভাগ ধরিয়া দুই হাতে রাইফেল বাঁ কাঁধে রাখুন আর সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত ঘুরাইয়া রাইফেলের গোড়ায় আনিয়া স্থাপন করুন—বাঁ হাতটি একটু বাঁকিয়া জমির সমান্তরাল হইবে ; পরমুহূর্তে তৃতীয় অবস্থা বা কায়দা হইবে—ডান হাত সট্ করিয়া নামাইয়া শরীরের সমান্তরাল ভাবে ডান দিকে লইয়া আসা। দূরে মার্চ করিয়া যাইতে হইলে এই কায়দায় রাইফেল রাখিয়া চলিতে হয়। কিন্তু বহুদূরে যাইতে হইলে বাম কাঁধে রাইফেলের strap এর মধ্যে ঢুকাইয়া sling arms করিয়া চলিতে হয়। অল্পকাল চলিবার জন্য পূর্বোক্ত "shoulder arms" করা প্রয়োজন। এই দুই কায়দায় রাইফেল উঠাইবার পরে নামাইবার হুকুম হইল :—

(৬) রাইফেল—(রা) খো (order arms) ; উঠাইবার কায়দার ঠিক অবিকল উল্টা। Shoulder arms এর কৌশল তিনটি ধাপে ভাগ করা যাইতে পারে। উপরেই তাহা বলা হইয়াছে।

(৭) রাইফেল—(ঝু) লাও (Trail Arms)—attention অবস্থা হইতে একটি .দোলা দিয়া ছুড়িয়া ডান হাতের মুঠায় রাইফেলের মাঝামাঝি বরাবর এমন ভাবে ধরিতে হইবে যাহাতে রাইফেলের টান থাকে অথবা রাইফেলটা জমির সমান্তরাল রাখিয়া আপনার সামনে হইতে পিছনে লম্বালম্বিভাবে ঝুলিতে থাকে। উল্টা হুকুম হইতেছে :—(রা) খো (order arms) অর্থাৎ পুনরায় attention অবস্থায়

রাইফেল ফিরাইয়া আনিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে আক্রমণ করিতে আগাইয়া যাইবার সময় যখন গুঁড়ি গুঁড়ি নিচু হইয়া বা বনজঙ্গলের ভিতর দিয়া কিম্বা অন্ধকারে চলিতে হয়, তখন এই উপায়ে রাইফেল বহন করা প্রয়োজন।

(৮) বেয়নেট চার্জ অর্থাৎ রাইফেলের সঙ্গীন দিয়া বিদ্ধকরণ:—এইরূপ আক্রমণে রাইফেল ধরিবার কৌশল দুই প্রকারের হইবে। আড়াল হইতে বাহির হইয়া শত্রুর নিকটে পৌছিতে যে সময় লাগিবে তাহার প্রথম দিকটায় রাইফেল ধরিতে হয় high part position এই কায়দায়। কৌশলটী এইরূপ: রাইফেল দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া হাত দুইটী যতদূর পারেন সম্মুখে প্রসারিত করুন এবং অগ্রটি আড়াআড়ি ভাবে আপনার চিবুক পর্য্যন্ত উচু করিয়া তুলিয়া ধরুন। ডান হাতের মুষ্টিতে ধৃত রাইফেলের butt চিবুকের সমান্তরাল রাখিয়া বাম মুষ্টিতে ধৃত রাইফেলের back sightএর অংশটি তির্যকভাবে তুলিয়া আপনার মাথার সমান্তরাল করিয়া ধরুন। এই অবস্থায় আগাইয়া শত্রু হইতে যখন আপনার দূরত্ব মাত্র ৮।১০ গজের মত থাকিবে তখন রাইফেল নামাইয়া যেমন মুষ্টিবদ্ধ ছিল ঠিক তেমনি অবস্থায় আপনার ডান পাশে কোমরের উপর পর্যন্ত আমুন এবং রাইফেলটী On Guardএর কায়দায় ধরুন। কায়দাটি এইরূপ:—ডান হাতের মুষ্টি শিথিল না করিয়া ঐ হাতে কনুই পর্যন্ত হাতখানি buttএর উপরে সজোরে চাপিয়া রাখুন; রাইফেলের butt সহ আপনার কুনুই অবধি ডান হাতখানি ডান কোমরের সঙ্গে প্রায় ছোঁয়াছুঁয়ি করিয়া রহিবে এবং ডান বাহু প্রায় ডান পাঁজরকে স্পর্শ করিবে। বাম হাতের মুঠাসহ রাইফেলের অগ্রভাগ আপনার সম্মুখে যতদূর সম্ভব আড়াআড়িভাবে প্রসারিত রহিবে। রাইফেল নড়ানড়ি করিবে না। আপনার দৃষ্টি শত্রুর প্রতি নিবদ্ধ করুন; সঙ্গীনটি শত্রুর পেটে ঢুকাইয়া যতদূর যায় নির্মমভাবে চালাইয়া দিন। এই অবস্থায় শত্রু হইতে আপনার দূরত্ব ৩।৪ ফুট থাকিবে; আপনি একটু সামনে ঝুকিয়া পড়িবেন; বাম পা খানি হাঁটু ভাঙ্গিয়া সামনে বাড়াইয়া দিন; ডান পা খানি আড়ষ্ট অবস্থায় দৃঢ়প্রোথিত খুঁটির মত আপনার পিছনে বাড়াইয়া শরীরের টাল রাখিবেন; বাম পা হইতে ডান পায়ের দূরত্ব স্বাভাবিক হইবে—আন্দাজ পৌনে

দুই হাত ; এই অবস্থায় দাঁড়াইয়া বিদ্যুৎবেগে ডান হাত রাইফেলসহ আপনার শরীরের ডানদিক দিয়া যতদূর পিছনে সরাইয়া আনা যায় ততদূরে আনুন ; বাম হাঁতও স্বাভাবিকভাবে খানিকটা আপনার সামনে হটিয়া আসিবে। এই ভাবে শত্রুর দেহ হইতে সঙ্গীনটি মুক্ত করিয়া শত্রুর পাশে অন্য শত্রু থাকিলে তাহাকে দ্বিতীয় উদ্যমে বিদ্ধ করিতে হইবে। এইজন্য সামান্য স্থান পরিবর্তন করিয়া অল্প লাফাইবার ভঙ্গীতে ডান পা সামনে লইয়া ডান হাঁটু ভাঙ্গিবেন এবং বাম পা পিছনে লইয়া সোজা রাখিবেন,—অন্যান্য কৌশল পূর্ববৎ। রণক্ষেত্রে সাধারণ যোদ্ধারা যখন High Post Position হইতে On Guard Positionএ রাইফেল লয় তখন সকলে একই সঙ্গে "charge !" বলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া নিজেদের আক্রমণের উন্মাদনা ও শত্রুরভীতি সঞ্চারের চেষ্টা করে ; কিন্তু গেরিল্লার আক্রমণ যতদূর সম্ভব নীরবে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া সবক্ষেত্রে এরূপ শব্দাদি করা গেরিল্লা যুদ্ধের নীতি বহির্ভূত।

(৯) Aiming—লক্ষ্যভেদ :—লাঠির ডগার একটা মাথায় মোটা জুতার পেরেক বিদ্ধ করুন। ঠিক সেই সোজা মাঝখানে আর একটা। শুইয়াই সাধারণতঃ গুলী ছুঁড়িতে হয়, এইজন্য লাঠির গোড়া ডান কাঁধে ঠাসিয়া স্থির করিয়া ধরুন, বাঁ হাতটি ত্রিপায়ার মত লাঠির প্রায় মাঝখানে ধরিয়া টাল রাখুন, ডান গণ্ডদেশটি লাঠির উপরে ন্যস্ত করুন ও ডান চোখটা লাঠির গায়ে প্রায় মিশাইয়া ধরুন—বাঁ চোখ বুজাইবেন—ডান হাত দিয়া ডান গালের পিছনে লাঠি আঁকড়াইয়া ধরুন যেখানে বন্দুকে ঘোড়া (trigger) থাকে। লক্ষ্য বস্তুকে ডান চোখের সঙ্গে এবং বিদ্ধ ঐ জুতার কাঁটা দুইটার সঙ্গে একই লাইনে লউন। এখন লক্ষ্য ঠিক হইয়াছে—যেন লাঠি বা বন্দুক নড়ানড়ি না করে। স্বাভাবিক ভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস লইবেন। দম বন্ধ করিবেন না। বিনা গুলী খরচে লক্ষ্য ঠিক করিবার উপায় এইরূপ :—একখানি কঞ্চির মাথায় এক টুকরা পিচ্‌বোর্ড বৃত্তাকারে কাটিয়া বাঁধুন—পিচ্‌বোর্ডের মধ্যস্থলে একটা দেড় ইঞ্চি পেরেক ঠুকিয়া একটা ছোট ছিদ্র করুন। আমাদের একটা লোক দূরে ঐ কঞ্চি খানি পুঁতিয়া তাহার পশ্চাৎ

হইতে বাম চোখ বুজিয়া ডান চোখে ঐ ছিদ্র দিয়া দেখিবে এবং সেই সময়ে শিক্ষার্থী শুইয়া তিন চার গজ দূর হইতে সেই ছিদ্রের দিকে বন্দুক সাহায্যে লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিবে। এ স্থলে শিক্ষার্থীর পক্ষে ঐ পিচ্ বোর্ডের ছিদ্রটি হইল লক্ষ্য বস্তু। কিন্তু পিচ্ বোর্ডের পিছনের লোকটি পূর্বোক্তরূপ বাম চোখ বুজিয়া ডান চোখে ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়া দেখিবে যে শিক্ষার্থীর বন্দুক নড়িতেছে কি না; দেখিবে বন্দুকের মাছি অর্থাৎ লাঠিতে বিদ্ধ ছোট পেরেক দুটী—refb এর fore-sight ও back-sight এবং শিক্ষার্থীর চোখ পরপর ঠিক একই লাইনে রহিয়াছে কি না। তাহা যদি থাকে তবেই সে বুঝিবে লক্ষ্য ঠিক হইতেছে।

আসল রাইফেল যখন পাইব তখন মনে রাখিতে হইবে গুলি ছুড়িবার সময় কখনই কট করিয়া ঘোড়াকে (trigger) এক উদ্যমে বা চাপে টানিয়া ছুঁড়িতে নাই। দুইটি চাপ ধীরে ধীরে পর পর দিয়া তখন ছুঁড়িবেন, অথচ নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক ভাবে লইতে থাকিবেন।

ভারতে গেরিল্লা যুদ্ধের সম্ভাব্যতা ও উপায়

এতক্ষণ শুধু বর্তমান ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠনের কার্য সূচী আলোচিত হইল। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, চীনা প্রদর্শিত ব্যাপক গণ প্রতিরোধের সৃষ্টি আমরা এদেশে কিভাবে এবং কতদূর পর্যন্ত করিতে পারি।

জাপান আসিয়া এ দেশে অধিকার করিবেই, এমনটি ধরিয়া লইবার কোন হেতু নাই। ইহা হইল পরাজয়ের মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তি কাটাইয়া উঠিয়া আমাদের সর্বপ্রথম দরকার—জনবাহিনী গঠনের মূল উৎসটিকে খুঁজিয়া বাহির করা অর্থাৎ দেশরক্ষা কার্যে গণঅনুপ্রেরণার বাহক জনপ্রিয় নেতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সরকার কায়েম করা। ইহা কায়েম করিতে পারিলে প্রচলিত অর্থে গেরিল্লা যুদ্ধ, অর্থাৎ অধিকৃত স্থানে শত্রু সৈন্যের পশ্চাতে অতর্কিতে খণ্ড যুদ্ধ—ইহার প্রয়োজনীয়তাই হয়ত এদেশে দেখা দিবে না। অর্থাৎ গণ-ঐক্যের বলে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সরকার ফ্যাসিস্ট শত্রুর মনে এমন বিভীষিকা জাগাইবে যে এ দেশকে আক্রমণ করিতে

তাহার সাহসেই কুলাইবে না। কিন্তু তবু যদি সাময়িক ভাবে শত্রু আগাইয়া দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং আমাদের সৈন্যবাহিনী কিছুটা পিছাইয়া আসিতে বাধ্য হয়, তবে উক্ত জনবাহিনীই অধিকৃত স্থানে গেরিল্লা লড়াই চালাইবে। তখন অবস্থাটি হইবে চীন বা রাশিয়ার মত "সুদীর্ঘ ও ব্যাপক গণ-প্রতিরোধ।"

যে পর্যন্ত শত্রু আসিয়া পৌছায় নাই, ততক্ষণ আমার এলাকায় আমার কাজ হইবে দেশের সামরিক কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য করা যথা—liaison বা যোগাযোগ রক্ষার কাজ, পথ ঘাটের পরিচয় দেওয়া, সরকারী "পোড়ামাটী" নীতির সহায়ক হওয়া, জন সাধারণকে গাড়ী, ঘোড়া, নৌকা, সাইকেল, মোটর লরী, খাদ্যাদি লুকাইয়া ফেলিতে অনুরোধ করা, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ চালনা ও পশ্চাদ-পসরনের রাস্তা, খেয়াঘাট, সেতু, রেল লাইন, টেলিগ্রাফের তার ইত্যাদি বজায় রাখা, শত্রুর প্যারাসুট বাহিনী বা অতর্কিতে আগত সৈন্য এবং তাহাদের সাহায্যকারী পঞ্চম বাহিনীর লোক ধরাইয়া দেওয়া ইত্যাদি। শত্রু আসিতেছে দেখিলে ভবিষ্যতে কাজ লাগিবে এই হিসাবে নিম্নলিখিত কোনও জিনিষ যদি হাতের গোড়ায় আসে তো লইয়া কোথায়ও লুকাইয়া রাখা মন্দ নয়:—যথা ছাপাখানার অক্ষর, যন্ত্র, কালি, কাগজ, সাইক্লোস্টাইল মেসিন, টাইপ রাইটার মেসিন, বেতার যন্ত্রের সাজ সরঞ্জাম, কাহারও প্রদত্ত বা পরিত্যক্ত বন্দুক, পিস্তল, রাইফেল ও গুলী, দেশী অস্ত্রশস্ত্র, কিছু কিছু ফ্যাসী বিরোধী ও মার্ক্সীয় ও জাতীয়তাবাদী গ্রন্থাবলী, লণ্ঠন ও কেরাসিন তেল, প্রাথমিক চিকিৎসার ও এ. আর. পি এর উপযোগী কিছু ঔষধ পত্রাদি।

ইভাকুয়েশান সমস্যা: শত্রুর অগ্রগতির তীব্রতার উপরে লোকাপসারণের পরিমাণ নির্ভর করিবে। শত্রু যদি দ্রুত গতিকে এক একটী এলাকা বেড়িয়া আরও আগাইতে থাকে তবে লোকে এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিবার অবকাশ পাইবে না। নতুবা লোকাপসরণ সমস্যা ব্যাপক ভাবে দেখা দিবে। রাস্তায় আহার ও বাসস্থান যোগাড় করা, রোগ নিবারণ করা, সুশৃঙ্খল ভাবে তাহাদের রাস্তায় পরিচালনা করা, শত্রু বিমানের মেসিনগান হইতে আত্মরক্ষার উপায় বাতলাইয়া গন্তব্য স্থানে তাহাদের পৌছাইয়া দিয়া ভলাণ্টিয়াররা ইভাকুয়ী লোকদের সহায়তা করিবে।

ইহা ছাড়া গ্রামে, নগরে, হাট-বাজারে লুট-তরাজ না হয় সেদিকে নজর রাখিবে। খাদ্য সংস্থানের জন্য এলাকায় সকল লোকের সাহায্য লইয়া ধর্মগোলা প্রভৃতি স্থাপন করিবে। শত্রু আসিলে কি উপায় অবলম্বন করা যাইবে তাহা সাধারণ ভাবে মিলিয়া মিশিয়া যুক্তি পরামর্শ করিবে। ইহার ফলে জনসাধারণের সঙ্গে এই ভলান্টিয়ার বাহিনীর সম্পর্ক নিবিড় ভাবে ঘনিষ্ট হইবে।

কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, আজিকের এই রাজনৈতিক অচল অবস্থা চলিতে থাকিল, শত্রু ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আসিতেছে—জাতীয় সরকার আসিল না, জাতীয় প্রতিরোধ গড়িয়া উঠিতেছে না, সে ক্ষেত্রে গেরিল্লা লড়াইয়ের সম্ভাব্যতা কতখানি তাহারই আলোচনা করা যাক্।

আমরা জানি যে জনগণ যদি বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন হয়, অর্থাৎ তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা যদি যথেষ্ট সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, মতবাদ যদি প্রগতিশীল হয় এবং সর্বোপরি তাহাদের দেশরক্ষার ইচ্ছা ও আগ্রহ যদি সুতীব্র হইয়া দেখা দেয় তবেই জনবাহিনীর সৃষ্টি সম্ভবপর। কিন্তু অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে আমাদের জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা আজ স্বল্প ও সুপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। এই সুপ্ত চেতনাকে মূর্ত করিয়া তোলা অবশ্য দেশ-কর্মী এবং নেতাদেরই কাজ। কিন্তু একথা কে অস্বীকার করিবে যে ভারতে বর্তমান রাষ্ট্রীয় অচল অবস্থায় কারা প্রাচীরের মধ্য হইতে দেশপ্রাণ নেতাদের মত ও ইচ্ছা আজ আমাদের কাছে সরাসরি আসিয়া পৌঁছিতেছে না। দেশের রাজনৈতিক জীবনের প্রতীক ও আশা ভরসার স্থল কংগ্রেস আজ বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছে—নেতাদের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আজ দেশরক্ষার্থে দেশবাসীদের আহ্বানই বা করিবে কে, আর লড়িবার হাতিয়ারই বা তাহাদের দিবে কে?

আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি যে লড়াইয়ের উপাদান চারিপ্রস্থ, যথা মানুষ অর্থাৎ সৈনিক, মনঃশক্তি, রসদ ও হাতিয়ার। কিন্তু একথা আজ সত্য যে ভারতে চল্লিশ কোটী নরনারী আজ বাঁচিয়াও মরিয়া আছে। দেশরক্ষার ইচ্ছা অবশ্য অনেকেরই আছে কিন্তু আজ সে উদ্যম কৈ? লোকে ভাবিতেছে কাহার জন্য কে

মরিবে ? যদি আজ জাতীয় সরকার আসে তবেই "যুদ্ধং দেহি" মনোবৃত্তি বিদ্যুতের মত চকিতে দেশের দিকে দিকে খেলিয়া যাইবে। হাতিয়ারকে আমরা গেরিল্লা যুদ্ধে খুব বেশী আমল দেই নাই বটে, কিন্তু অন্ততঃ প্রত্যেকে কিছু রাইফেল, কিছু হাত বোমা, টমিগান ও হালকা মেশিন গান না পাইলেই বা জনবাহিনার সৃষ্টি কি করিয়া সম্ভব ? শত্রুর হাতিয়ার কাড়িয়া কাজ হাসিল করাও অবশ্য গেরিল্লার রীতি। কিন্তু প্রথমে দেশী অস্ত্র-শস্ত্র এবং সামান্য কিছু আগ্নেয়াস্ত্র না থাকিলে কাজ আরম্ভ করাই মুস্কিল যে।

তারপর ধরুন সামরিক শিক্ষার কথা। আমরা আগেই বলিয়াছি যে কিছুটা শিক্ষার দরকার ; অন্ততঃ কিছু কুচকাওয়াজ ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার ও যুদ্ধের নিতান্ত সাধারণ কৌশলগুলি জানা দরকার। শিক্ষা লইতে কম পক্ষে ১০।১২ দিন সময় লাগেই। স্পেনের ইনটারন্যাশনাল ব্রিগেডে যে ইংরাজ স্বেচ্ছাসেবকগণ যোগ দিয়াছিলেন শোনা যায় তাহারা অনেকে মাত্র দেড় সপ্তাহের শিক্ষা ও পাঁচ রাউণ্ড অর্থাৎ পাঁচটা বুলেট ছুড়িবার অভিজ্ঞতা লইয়া যুদ্ধে নামিয়াছিলেন। তাহাওতো দরকার ; আমাদের দেশের লোকের এক গাছা পাঁচ হাত লাঠিও যে হাতে লইবার হুকুম নাই ; আর সামরিক শিক্ষা দিবার লোকই বা কৈ ?

সর্বোপরি গেরিল্লা যুদ্ধ হইবে দেশের স্থায়ী সৈন্য বাহিনীর সহায়ক স্বরূপে ; গণপ্রতিরোধ বা জন যুদ্ধের Technique এর দিক দিয়া দেখিলে বলা যায় যে সামনে একটা জাতীয় সৈন্যবাহিনী শত্রুকে রুখিবে, তবেই না জন বাহিনীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করিবে ? কিন্তু আপাততঃ এমনটির কোনও লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। অর্থাৎ জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত না হইলে এদেশে গেরিল্লা যুদ্ধের পরিকল্পনা শুধু কল্পনাতেই পর্যবসিত হইবে। তাই আজ দেশের সম্মুখে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রশ্ন রহিল কি করিয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট আদায় করা যায়। ঐক্যবদ্ধ জাতীয় দাবীই আজ জাতীয় সরকার আনিতে পারে। শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাজাগোপালাচারী এবং অন্যান্য নেতাদিগকে গান্ধীজীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে বড় লাট যে অনুমতি না দিবার সাহস করিলেন

তাহার একমাত্র নিগূঢ় কারণ আমরা আজও ঐক্যবদ্ধ জনমতের সমর্থন লাভ করিতে পারি নাই।

এই অবস্থায় "গেরিলা যুদ্ধ করিতে হইবে" বলিয়া অত্যধিক উত্তেজনা প্রকাশে বিশেষ লাভ নাই। তবে ঐক্য আন্দোলনের ভিতর দিয়া জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিয়া ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে। তাই আজ দিকে দিকে ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করাই হইবে আমাদের বর্তমান অর্ধ-রাজনৈতিক ও অর্ধ-সামরিক প্রচেষ্টা।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, জাতীয় সরকার হস্তগত না হইলে দেশরক্ষার উদ্যোগে জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিবার কার্যে আজ সরকারী ও বে সরকারী বহুবিধ বাধাবিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইতেছে ; ইহা দেখিয়া দেশকর্মীদের "হাল" ছাড়িলে অবশ্যই চলিবে না। কিন্তু প্রশ্ন হইল—জাতীয় সরকার আমরা পাইতেছি কবে ? এ প্রশ্নের উত্তর ভারতের ও বিশ্বের ঐক্যবদ্ধ জনসাধারণই দিতে পারে। তবে জোর দিতে হইবে আমাদের নিজস্ব উদ্যম, নিজস্ব প্রচেষ্টা ও অগ্রগতির উপরে। কিন্তু ধরুন যদি জাতীয় সরকার শত্রুর আক্রমণের পূর্বে আমাদের হস্তগত না হয়। অর্থাৎ মনে করা যাক টালবাহনা করিতে করিতে আসাম ও বাংলার ভিতরে শত্রু আসিয়া প্রবেশ করিল, তখন গেরিল্লা যুদ্ধকামী দেশকর্মীদের কার্যক্রম কিরূপ হইবে ? সেক্ষেত্রে "অধিকৃত" এবং "অনধিকৃত" এই দুই এলাকাতে সময়োপযোগী এবং তৎকালীন সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী দেশীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। তবে মনে রাখিতে হইবে যে দেশের খানিকটা অংশ শত্রুর করায়ত্ত হইয়া পড়িলেও আজিকের এই সরকারী দমননীতি ও রাজনৈতিক অচল অবস্থা যেমনটি তেমনই চলিতে থাকিবে—এরূপ mechanically আমরা চিন্তা করিতে বা ধরিয়া লইতে পারি না। বরং কল্পনা করা যাইতে পারে যে ততদিন অনধিকৃত ভারতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন সেই সরকারের আহ্বানে ও নেতৃত্বে নিশ্চয়ই দেশব্যাপী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে। আর "অধিকৃত" স্থানে দেশকর্মীরা তখন সন্তর্পণে ও কৌশলে গেরিল্লা দল সংগঠন করিবেন। দেশপ্রেম

ও জাতীয়তার অনুপ্রেরণায় দেশবাসীরা তখন শত্রুর অগোচরে সংঘবদ্ধ হইবেন, শক্তিসঞ্চার করিবেন, অস্ত্র সংগ্রহের হাজারো পন্থা আবিষ্কার করিবেন, এবং গেরিল্লা সংগ্রামের শিক্ষা ও দীক্ষায় নিজেদের সুনিপুণ করিয়া তুলিবেন। Whispering campaign (কানাঘুষা), go slow movement (ধীর হইয়া শত্রুর কাজ করো), sabotage (ধ্বংসমূলক কার্যাদি) এবং assult (অভিযান) এইরূপ হইবে গেরিল্লা কার্যের মোটামুটি পদ্ধতি বা স্তর। আশা করা যাইতে পারে যে, ফাসিস্ট শত্রুর বর্বর অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, এবং "জাপানী স্বাধীনতা" নামক আকাশকুসুমের মর্ম সম্যক বুঝিয়া আজিকার ভ্রান্ত স্বাধীনতাকামীরা জাপ প্রতিরোধের কার্যে যোগদান করিবেন।

কিন্তু শত্রু আসিবার সন্ধিক্ষণে যাঁহারা প্রকৃত দেশ প্রেমিক এবং জাপানী শাসন মানিয়া লইতে পারেন না—বিশেষতঃ যাহারা "ফ্যাসি-বিরোধী" বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের পক্ষে আত্মগোপন করিয়া দেশের এবং দশের কাজ করা ছাড়া গত্যন্তর কি? শত্রুর আক্রমণের প্রথম দিকটায় রাস্তা ঘাট, নদী, রেল পথ, সহর, বাজার ইত্যাদি জায়গাগুলির দূরে দূরে পল্লীর অভ্যন্তরে চলিয়া গিয়া অবস্থা বুঝিয়া হয়ত রাজনৈতিক প্রচার কার্য চালানো যাইতে পারে। কিন্তু আত্মপরিচয় না দিয়া সহরে নগরে থাকিয়া নেপথ্যে কার্য পরিচালনা করাই বোধ হয় বেশী যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু এখন হইতে কার্যপ্রণালীর বাঁধা ধরা কাঠামো তুলিয়া ধরা অসম্ভব। যাহারা জাপবিদ্বেষী বলিয়া বিশেষ মার্কামারা নহে অথচ জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিতে চায় তাহারা অবশ্যই সেচ্ছাসেবক দল গঠন করিয়া আত্মরক্ষা, গৃহ ও পল্লী এবং ধনসম্পত্তি রক্ষা, মেয়েছেলের প্রাণ ও মর্যাদা রক্ষা ইত্যাদি কার্যে সহায়ক হইবে। কিন্তু অধিকৃত স্থানে প্রকৃতই কে গেরিল্লা যুদ্ধ করিবে বা না করিবে এখন হইতেই এ সম্বন্ধে ভাবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব। তবে জনসাধারণের দেশপ্রেম ও বিপ্লবী চেতনায় আমরা পুরাপুরি আস্থা রাখি; তাই স্বপ্ন দেখি: দেখি ভারতে, এই সোণার বাংলায়, গেরিল্লাদল মাথা তুলিয়া উঠিবে, ঘাটে, মাঠে, নগরে, পল্লীতে, চাষীর কুটীরে, শ্রমিকের বস্তিতে, অনধিকৃত ভারতের দিকে দিকে, পশ্চিম ঘাট

পর্ব্বতমালার অসংখ্য শিখরে, শিবাজীর কংকনের ঘরে ঘরে, নীল গিরির পর্ব্বত মালায়, বিন্ধ্যের নিভৃত কন্দরে, তান্তিয়া তোপির মধ্যভারতের গভীর অরণ্যে, রাজপুতনার বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে, প্রতাপের আরাবল্লীর উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে, হিমালয়ের বনে বনে, অধিকৃত বাংলার প্রান্তরে, সুন্দর বনের জঙ্গলে, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য ত্রিপুরা এবং দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে, জলপাইগুড়ীর ডুয়ার্স জঙ্গলে, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, গারো, নাগা, লুসাই পর্বতের গভীর গহনে জাগিবে বুভূক্ষু, স্বাধীনতাকামী প্রতিটী ছাত্র, চাষী, মুজুরের বিপ্লবী গেরিল্লা বাহিনী। এই সুমহান সম্ভাব্যতার সূচনা করিবে কাহারা? বাংলার দেশপ্রাণ ব্যক্তিরা, আমাদের ফ্যাসিবিরোধী কর্মীরা যাহারা জনগণের শক্তিতে আস্থা রাখিতে অভ্যস্ত। আর আপনি নিজে, আপনাকে স্মরণ করিতে বলি রাষ্ট্রনীতি বিশারদ ও রণধুরন্দর জিনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেকের ১৯৩৯ সালের নানিও কনফারেন্সের ঘোষণা বাণী—"সেনাবাহিনী হইতে জনগণের শক্তি অধিকতর। সনাতন নীতিতে যুদ্ধ অপেক্ষা গেরিল্লা যুদ্ধ বেশী কার্যকরী; সৈন্যদের সামরিক শিক্ষার চেয়ে রাজনৈতিক শিক্ষাই বেশী প্রয়োজনীয়; বুলেটের তুলনায় প্রোপাগাণ্ডাই বেশী উপযোগী।"

গেরিল্লার প্রস্তুতি

অনেকেই গেরিল্লা যুদ্ধের স্বরূপ এবং ইহার ফলাফলকে হাল্কা করিয়া দেখিয়া থাকেন। বহু লোকের মনে এরূপ যুদ্ধের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কেমন একটা তুচ্ছ তাচ্ছল্যের ভাব বা একটা অস্পষ্ট ধারণা লক্ষ্য করা গিয়াছে। অপর পক্ষে যাঁহারা ইহার সম্ভাব্যতাকে ছোট করিয়া দেখেন না বরং বড় করিয়াই দেখেন—তাঁহারা আবার ভুল করেন বিপরীত কারণে অর্থাৎ তাঁহারা ভাবিয়া থাকেন যে, গেরিল্লা লড়াইকে সাফল্যে পরিণত করা যেন একটা নিতান্ত সরল ও সহজসাধ্য ব্যাপার।

গেরিল্লাদের বাস্তববাদী হইতে হইবে। শত্রু অধিকৃত এলাকায় হঠাৎই যেন ভূমি ফুঁড়িয়া দলে দলে গেরিল্লাবাহিনী রাতারাতি মাথা তুলিয়া

দাঁড়াইবে এবং রাশিয়ার মত শত্রু আক্রমণের ঠিক পর-মুহূর্ত তাহারা দলে দলে শত্রু সৈন্য হতাহত করিয়া তাহাদের রসদ ও গোলাগুলি লুটিয়া এবং যানবাহন নষ্ট করিয়া তচ্‌নচ্‌ করিতে থাকিবে—আমাদের দেশে গেরিল্লা কার্যের এরূপ কোনও ছবি চোখের সম্মুখে আপাততঃ তো তুলিয়া ধরিতে পারা যায় না। দুরন্ত পরিশ্রম করিয়া জনসাধারণকে প্রথমে ঐক্যের পট-ভূমিকায় সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইলে, হয়ত শত্রু আসিবার ছয় মাসের মধ্যেও সামরিক অভিযানের কথা দূরে থাকুক, এমন কি তাহার বিরুদ্ধে ধ্বংস মূলক কার্যও সুরু করা যাইবে না। এই কথাটি আজ স্পষ্ট করিয়া বুঝা দরকার। যাঁহারা মনে করেন শত্রু আসিতে আসিতেই তাহাকে "ভাতে মারা" এবং "হাতে মারা"—এই দুইটা কাজই শুরু হইয়া যাইবে তাহারা একটু ভুল করেন। যে-কোন প্রকার অভিযানই চালাইতে যাওয়া যাক্ না কেন, তাহার পরিকল্পনা এবং পরিচালনা যেন বেশ সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খল হয়। জন্মভূমি শত্রুর কবলে যাইয়া পড়িলেও তাহার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধ্বংসমূলক এবং সামরিক অভিযান (উপযুক্ত সংগঠন তৈরী না করিয়া) হঠাৎ আরম্ভ করা যাইবে না। শত্রু যেমন যেমন অগ্রসর হইবে তেমনই অধিকৃত এলাকাগুলির বিভিন্ন কেন্দ্রে এবং প্রয়োজন মত সুদূর পল্লীর অভ্যন্তরে নানা সমস্যাকে আশ্রয় করিয়া যেমন ইভ্যাকুয়েসান অর্থাৎ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পলায়ন ও লুঠ-তরাজ, খাদ্যাভাব প্রভৃতি সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে দিকে দিকে আমাদের দলবদ্ধভাবে ছড়াইয়া পড়িতে হইবে। তারপর বিশিষ্ট কার্যসূচীকে অবলম্বন করিয়া গ্রাম্যরক্ষী দল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও গুপ্ত গেরিল্লা সংগঠন শুরু করিতে হইবে। রাজনৈতিক অরাজকতা, অর্থনৈতিক হাহাকার ও দুর্ভিক্ষ এবং পঞ্চম বাহিনীর কর্মতৎপরতা কোন প্রকারে কিছুটা সামলাইয়া এক একটি এলাকায় অন্ততঃ কয়েকখানি গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া মোটামুটি একটি গেরিল্লা ঘাঁটীর বনিয়াদ গড়িয়া তুলিতেও শত্রু আক্রমণের পরে খুব কম ৫।৬ মাস গড়াইয়া যাইবে। তাহার পর শত্রু চলাচলের রাস্তাঘাট জানিতে গেরিল্লা ঘাঁটির চারিপার্শ্বের গ্রামগুলিতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে, শত্রু

ঘাঁটির গঠন ও তাহার পথ জানিবার জন্য ঘাঁটির নিকটবর্ত্তী এলাকাগুলিকে গোপন সূত্র ধরিয়া প্রচারের ফলে নিজেদের দলে টানিতে, সামরিক হৈ হাঙ্গামা কাটিয়া জীবন যাত্রা একটু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিবার পর আমাদের দরদীরা (Sympathisers) জাপান ভক্ত প্রজা সাজিয়া কলকারখানা ও অফিস আদালতে আবার যোগদান করিলে তাঁহাদের সঙ্গে গুপ্ত যোগাযোগ স্থাপন করিতে এবং সর্বোপরি কিছু আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রীতিমত গেরিল্লা যুদ্ধের কায়দাকানুন শিক্ষা করিয়া নকল যুদ্ধের মহড়া দিয়া প্রস্তুত হইতে আরও অন্তত ৩।৪ মাস কাটিবে।

অর্থাৎ শত্রু আক্রমণের প্রায় এক বছর পূর্বে বর্তমান অবস্থায় আমরা তাহার বিরুদ্ধে অভিযানের কল্পনাই করিতে পারি না। যুগোশ্লোভিয়ার মত স্বাধীন দেশে গেরিল্লা বাহিনী গঠিত হইতে প্রায় এক বৎসর সময় গিয়াছে। চীনে চাও-তুঙের দেড় হাজার গেরিল্লার দল গড়িয়া উঠিয়াছিল মাত্র ছয় জন কর্মীকে কেন্দ্র করিয়া—কিন্তু এক বৎসর সময় লাগিয়াছিল। তাই মনে হয়, যাঁহারা দেশ আক্রান্ত হইবার প্রারম্ভে শত্রুকে মারিবার উপরে বেশী জোর দিতেছেন, তাঁহারা উল্টা দিক (wrong end) হইতে আরম্ভ করিতেছেন। বিপ্লবী গণআন্দোলনকে গড়িয়া তোলা এবং তাহার ভিতর দিয়া প্রত্যেকের মনে দেশরক্ষার ইচ্ছাকে সক্রিয় ও দৃঢ় করিয়া তোলাই হইল গেরিল্লা সংগঠন কার্যের প্রথম পর্যায়। নতুবা প্রতিরোধের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হইবে না। প্রশ্ন সহজেই উঠিতে পারে যে, এমন কি এক বৎসর পরেও গেরিল্লারা যখন সামরিক অভিযান প্রভৃতি শুরু করিবে, তখন ফল স্বরূপ নিরীহ দেশ কর্মীর উপর শত্রু যে অমানুষিক উৎপীড়ন ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চালাইতে থাকিবে, তাহার প্রতিকার কি? শত্রুদের এক লরী চাউল উল্টাইতে যাইয়া মনে করুন যদি তাহার শত গুণ ক্ষতি আমাদের উপরে আসিয়া পড়ে তখন কি হইবে? ফ্যাসিস্ট বর্বরেরা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালাইয়া, পুড়াইয়া, লুণ্ঠন ও হত্যা করিয়া, নিরীহ অধিবাসীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়া এলাকার পর এলাকা শ্মশান বানাইয়া ছাড়িবে।

আমরা যদি শত্রুর যথেষ্ট ক্ষতি করিতে পারি তো অবশ্য আমাদের এরূপ

লোকসান পোষাইবে। আর এ অত্যাচার দেশ-প্রাণ বিপ্লবীর চোখে হয়ত বড় করিয়া ঠেকিবে না, কেননা দেশরক্ষার বিনিময়ে সব কিছু বিপদেরই সম্মুখীন হইতে তিনি রাজি। কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই রাজনৈতিক চেতনা কম, শত্রুর এই বীভৎস অত্যাচারের জ্বালা সহিতে না পারিয়া অনেকেই গেরিল্লাদের উপর দোষারোপ করিবে; হয়ত তাহাদের বিরুদ্ধেই দাঁড়াইবে এবং এমন কি শত্রুর দলে ভিড়িয়া তাহাদিগকে ধরাইয়া দিবে। গেরিল্লারা পলাইয়া, লুকাইয়া, নিজেদের প্রাণ হয়ত কোন মতে বাঁচাইল, কিন্তু যে গ্রামে শত্রুর ব্যাপক উৎপীড়ন চলিতে থাকিবে তাহার সাধারণ অধিবাসীরা নিস্তার পাইবে কিরূপে? ঠায় দাঁড়াইয়া মার খাইবে—ফলে তাহাদের মধ্যে যাহারা গেরিল্লার দরদী বন্ধু ছিল তাহারা নৈরাশ্যে পথ খুঁজিয়া পাইবে না; আর বাকী সকলেই ভয়েই হউক বা ভক্তিতেই হউক শত্রুকে ও তাহার শাসনব্যবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইবে। ইহার একমাত্র পরিণতি এই হইবে যে, শত্রু এ দেশের মাটিতে কায়েম হইয়া বসিবার সুবিধা পাইবে। ফলে গেরিল্লা যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ শত্রুকে স্থির হইয়া বসিতে না দেওয়া—ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। অতএব প্রশ্ন হইতে পারে যে, ইহা অপেক্ষা চুপ করিয়া থাকিলেই ভাল ছিল না কি? উত্তর হইবে—না। কাজ আমাদের শুরু করিতেই হইবে। কিন্তু এই অত্যাচারের ছবি সম্মুখে রাখিয়া ইহার প্রতিকারের উপায় পূর্বাহ্নেই ঠিক করিয়া আট-ঘাট বাঁধিয়া তবে কাজে নামিতে হইবে। এই উপায়কে আমরা দুইভাগে ভাগ করিব—(১) শত্রুর এই অমানুষিক অত্যাচার ঘটিতে দিব না—Preventive বা নিবারণমূলক; (২) যদিও বা ঘটে তো, তাহার প্রতিকার করিব—Curative বা প্রতিবিধান মূলক।

নিবারণমূলক (Preventive):—ঘটিতে দিব না বলিলেই কাজ হাঁসিল হয় না। ইহার জন্য প্রয়োজন দুইটি জিনিষের—(অ) শত্রুকে আক্রমণ করিবার পূর্বে গেরিল্লারা গ্রাম বা নগরবাসী জনসাধারণকে নিজ দলে টানিবে অর্থাৎ স্বপক্ষে বা স্বমতে আনিবে; আর (আ) তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সুশিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিবে।

(অ) দলে টানিবার কৌশল বা পথ খানিকটা এইরূপ হইবে: সর্বপ্রথম গেরিল্লা নেতারা নিজে যথেষ্ট সাহসী, বিপ্লবে আস্থাশীল, গণশক্তিতে বিশ্বাসবান্, সংগঠন কুশল, বর্তমান যুদ্ধান্তে শান্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা-যুক্ত হইয়া গেরিল্লা যুদ্ধের তাৎপর্য ও গেরিল্লাদল গঠনের পদ্ধতি এবং কৌশলাদি বিষয়ে নিখুঁতভাবে অভিজ্ঞ ও ওয়াকীবহাল হইবেন। চারিদিক সামলাইয়া তালে তালে পা ফেলিয়া সুনির্দিষ্ট কার্যসূচী হাতে লইয়া অগ্রসর হইবেন। মনে রাখিতে হইবে যে, আসলে শত্রুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমরা অগ্রসর হইতেছি: শত্রুর উদ্দেশ্য হইল ভাঁওতা দিয়াই হউক, আর ছলে বলে কৌশলে বা অন্য যে কোন উপায়েই হউক দেশবাসী জনসাধারণকে স্বদলে ও স্বমতে লইয়া আসা; আমাদের উদ্দেশ্য হইতেছে শত্রুর ছলনা বা চাতুর্যের মর্ম উদ্‌ঘাটন করিয়া জনসাধারণের দাবী দাওয়া লইয়া সাধ্যমত লড়িয়া প্রকৃত কল্যাণের পথে সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাহাদের পরিচালিত করিয়া গণশত্রু জাপ দস্যুকে তিলে তিলে বিনষ্ট করা। যাহারা জনসাধারণকে প্রকৃত স্বাধীনতার এবং সুখ সুবিধার সন্ধান দেখাইতে পারিবে, তাহারাই তাহাদের হৃদয়মন অধিকার করিয়া নিজের দলে টানিতে পারিবে। শত্রুর সুবিধা এই যে, সে কতকগুলি দেশদ্রোহী স্বার্থপর লোকের সাহায্য পাইবে; টাকাকড়ি দিয়া বা ভয় দেখাইয়াও কিছু কিছু লোককে স্বপক্ষে লইতে পারিবে; তাহার সর্বাপেক্ষা বড় সুবিধা এই যে, সে এদেশের লোকের মজ্জাগত ব্রিটিশ বিদ্বেষকে নিজের কাজে লাগাইতে পারিবে। আর, আমাদের সুবিধা কি? আমরা জানি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আজ ভারতবাসীর অন্তরে অন্তরে আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে—আমরা বিশ্বাস করি যে, নূতন করিয়া দাসত্ব শৃঙ্খল পায়ে পরিতে আজ আর কেহ রাজী নহে। আমরা বুঝিতেছি যে, আজ দেশের অনেকে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া জাপানকে মুক্তিদাতা মনে করিতেছেন। আজ পঞ্চমবাহিনীর লোকে চাষা-ভূষার কানে কানে বলিয়া বেড়াইতেছে যে জাপানী আসিলে ঋণভারগ্রস্ত কৃষকদের সুবিধা হইবে, কেননা জাপানী মুনিবেরা বর্তমান খৎ, নথীপত্র ও দলিলগুলি বাতিল করিয়া দিবে এবং চালের মণ দুই তিন

টাকা করিয়া দিবে। কিন্তু এই সকল গাল গল্প লোকে নির্বিবাদে যে হজম করিতেছে ক্রমে ইহার বদ হজম দেখা দিবে:—আজিকের এ দিবাস্বপ্ন ভাঙ্গিবে বাস্তবের মুখোমুখি হইলে। প্রচারকার্য দ্বারা ফ্যাসিস্টদের স্বরূপ ধরাইয়া দিয়া আমরা যত শীঘ্র সম্ভব দেশবাসীর চেতনা জাগাইয়া দিব। লোকে যে আপনা আপনিই ফ্যাসিস্টদের স্বরূপ বুঝিয়া ফেলিবে তাহা নহে, তবে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতরে পড়িয়া তাহারা আমাদের প্রচার ও আন্দোলনের সত্যতা উপলব্ধি করিবে। ধাপে ধাপে আমরা তখন সকলে একসঙ্গে সুশৃঙ্খলভাবে উঠিতে বসিতে, চলিতে ফিরিতে, জনমত গঠন করিতে, প্রতিরোধের উপযোগী কিছু কিছু আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করিয়া শত্রুকে বাধা দিতে এবং শত্রুর আঘাতের মুখে কৌশলে আত্মরক্ষা ও আত্মগোপন করিয়া প্রতিঘাত করিতে শিখিব এবং অন্যকে শিখাইব। [ফিল্ড ক্রাফট্, প্রথম অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]

(আ) বিচ্ছিন্নভাবে গ্রামবাসীর কেহই শত্রুকে আঘাত করিতে সমর্থ হইবে না। সাহস করিয়া অগ্রসর হইলেও ফল হইবে উল্টা। আজ যেমনটি আমরা রহিয়াছি, তাহাতে মাত্র দু একটি জাপানী সৈন্য টমি গান ও কয়েকটি হাত বোমা লইয়া গ্রামে ঢুকিলেই কে কোথায় পালাইবে দিশা থাকিবে না। ইহাতে সহজেই তাহারা আসিয়া যাহা চাহিবে বিনা বাধায় পাইবে। আমাদের মা বোনকে অসম্মান করিবে এবং আমাদের ঘরের আহার্য, সম্পদ এবং যাহা কিছু আছে লুণ্ঠন করিবে। কিন্তু আমরা যদি জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ এবং দলবদ্ধ হইয়া গ্রামরক্ষাবাহিনী, স্থানীয় গুপ্ত গেরিল্লাবাহিনী প্রভৃতি গড়িয়া তুলিতে পারি এবং এগুলির সাহায্যে যদি রুখিয়া দাঁড়াই, তাহা হইলে এমন কি কোন গ্রামে বিশ পঁচিশটা জাপানী আসিলেও তাহাদের নিঃশেষ করা অসম্ভব হইবে না। যদি ধরুন শত্রু দলে বেশ ভারী হইয়াও আসে তবু কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাইলেই দলবদ্ধ ভলান্টিয়ার বাহিনী আগাইয়া যাইয়া কৌশলে শত্রুশক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারে ; অন্ততঃ নকল যুদ্ধের অবতারণায় তাহার দলগুলিকে নিযুক্ত রাখিতে পারে, আর সেই অবকাশে গ্রামবাসীর পূর্ব নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে শিশু ও মেয়ে লোক এবং খাদ্যসম্ভার

অপসারিত করিতে বা সুবিধা মত চাউল ও শস্যাদি লুকাইয়া ফেলিতে পারে। এ প্রকার শত্রুর প্রকৃত আক্রমণ রুখিবার পূর্বে বহুবার নকল লোকাপসারণের মহড়া গেরিল্লারা গ্রামে গ্রামে সম্ভবমত অভ্যাস করিবে। আসল আক্রমণ ঠেকাইতে গেলে অবশ্য আগে ভাগে গ্রামে ঢুকিবার রাস্তাগুলিতে পাহারা বসাইতে হয় এবং পথ, খাল বা নদীর পুলগুলি ধ্বংস করিয়া এবং রাস্তায় গভীর খাদ কাটিয়া, গাছ, আড়াআড়ি পুঁতিয়া রাখিতে হয়। ["স্কাউটিং ও পেট্রোলের পরিচ্ছদ দ্রষ্টব্য"] ইহার অর্থ এই যে শুধু পদাতিক সৈন্য ছাড়া শত্রু যান্ত্রিকবাহিনী আসিতে ইহাতে বাধা পাইবে।

বিমান আক্রমণ হইতে সতর্ক থাকিবার ও আশ্রয় লওয়ার কৌশলও শিখাইতে হইবে। পরিখা খনন করা, ধান্যাদির "গোলা" ক্যামফ্লাজ বা গোপন করিয়া রাখা; বিমানের শব্দ শুনিলেই আড়াল লওয়া, ব্যক্তিগত "ক্যামফ্লাজ" গ্রহণ করা, খড়ের ঘরে দাহ্য জিনিষ বিশেষতঃ চাউল ধান প্রভৃতি খাদ্যাদি না রাখিয়া অন্যত্র গোপন করিবার ব্যবস্থা করা; সর্বদা বাড়ীতে যথেষ্ট পরিমানে জল মজুত রাখা, আগুনে বোমা নষ্ট করিবার কৌশল শিখানো, এক কথায় প্রাথমিক চিকিৎসার সাজ সরঞ্জাম মোটামুটি যোগাড় রাখা—এই প্রকার কৌশল বা উপায়গুলি আগে হইতে জানিবার ও জানাইবার প্রয়োজন আছে।

কিন্তু সমস্যা হইল এই যে, আজ আমাদের ফাসিবিরোধী প্রচারের ভিত্তিতেও দলবদ্ধ হইবার অধিকার নাই। কাজেই জনগণকে দলবদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ করিবার যে আলোচনা উপরে করা হইল, তাহা সবই ভুয়া প্রমাণিত হইবে, যদি আমরা শীঘ্রই জাতীয় সরকারের অধীনে দল গঠন করিবার সুযোগ না পাই। সেইজন্য আজ আমাদের একমাত্র এবং সর্বপ্রধান রাজনৈতিক কর্তব্য হইতেছে ঐক্যবদ্ধ হইয়া জাতীয় সরকার আদায় করা। বর্তমান অবস্থাকে অবশ্যই আমরা স্বীকার করিয়া লইব না; কিন্তু ইহার অবসান যতদিন না হইতেছে ততদিন আমাদের কাজের সুবিধা সীমাবদ্ধ —তবু এখন হইতে যতখানি পারা যায় জমি প্রস্তুত করিয়া রাখা ভাল, তাই শত বাধা সত্ত্বেও আমাদের ভিত্তি গঠন এখন হইতেই চলিবে।

প্রতিকারমূলক (Curative) :—শত্রু অধিকৃত এলাকায় আমরা যতই সতর্ক হই না কেন, যতই সংঘবদ্ধ হইনা কেন, আঘাত খাইলে প্রতিশোধ লইতে শত্রু আসিবেই। পূর্বোক্ত উপায়ে এরূপ আক্রমণের তীব্রতা আমরা অবশ্য হ্রাস করিতে পারিব; কিন্তু যে উৎপীড়ন অবশ্যম্ভাবী তাহা এড়ানো যাইবে না। অনেক স্থলে বিনা কারণেই বর্বর দস্যুরা নিষ্ঠুর অত্যাচার করিবে। সব সময়েই গেরিল্লাদের কর্তব্য হইবে বিপদের সময়ে বিপন্ন জনসাধারণের পাশে আসিয়া দাঁড়ানো এবং সাধ্যমত সাহায্য করা, যাহাতে তাহাদের কষ্টের লাঘব হয়। যেমন বিমান আক্রমণ—ইহার ঠিক পরেই গেরিল্লারা বা তাহাদের ভোলাণ্টিয়ার বাহিনী গ্রামবাসীর উপকারে বিভিন্ন উপায়ে আসিবে—আগুন নিভানো, নষ্ট ঘরবাড়ী মেরামত করিতে সাহায্য করা, প্রাথমিক চিকিৎসা ও মৃতের সৎকার কার্যে যোগ দেওয়া ও যাহার খাদ্যাদি নষ্ট হইয়াছে তাহাকে খাবার সংগ্রহ করিয়া দেওয়া ইত্যাদি। ইহা ছাড়া, যদি শত্রুর স্থল সৈন্য বাহিনী আসিয়া অত্যাচার করে, জিনিষপত্র লুটিয়া, সৈন্য পাহারা বসাইয়া পুতুল শাসন নিযুক্ত করিয়া যায়, তো তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমতঃ শত্রুর মূল সৈন্য যখন গ্রাম ছাড়িয়া রসদ প্রভৃতি লুটিয়া লইয়া ফিরিয়া যাইবে, তখন রাস্তায় তাহার দুর্বলতম স্থানে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া তাহাদের মারিতে হইবে। লুন্ঠিত রসদ পুনরায় উদ্ধার করিয়া যথাসময়ে তাহার মালিককে ফিরাইয়া দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ আপনার কাজ হইবে গ্রামে বা নিকটস্থ গেরিল্লার ঘাটিতে সুযোগের অপেক্ষায় লুকাইয়া থাকিয়া উপযুক্ত মুহূর্তে শত্রু নিযুক্ত প্রহরী সৈন্যকে হত্যা করা এবং সঙ্গে সঙ্গে "পুতুল শাসনের" উচ্ছেদ করা। এক্ষেত্রে Public trial বা জনসাধারণের সম্মুখে সকলের মতামত লইয়া বিচার করিয়া উপযুক্ত শাস্তি (হয়ত মৃত্যুদণ্ডও) দিতে হইবে। তৃতীয়তঃ শত্রুর এই অত্যাচারের সুযোগ লইয়া জাপান বিরোধী প্রচার এবং দল সংগঠন কার্য চালাইতে হইবে। গ্রামবাসীদের মন নিরুৎসাহ হইলে কৃষ্টিমূলক কার্যপন্থা, রাজনৈতিক প্রচার ও সামরিক চমকপ্রদ প্রদর্শনী দেখাইয়া এবং শত্রুর বিরুদ্ধে ধ্বংসমূলক কাজ (sabotage) চালাইয়া (যেমন সেতু, রেলপথ, রাস্তা, টেলিগ্রাফের তার প্রভৃতি নষ্ট করিয়া) পল্লীবাসীর

মনে সাহস ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিতে হইবে। বলাবাহুল্য এই ধ্বংসমূলক কাজগুলি সাধারণতঃ স্থানীয় "গুপ্ত গেরিল্লারা" করিবে।

এদেশে গেরিল্লাদল কিরূপে নির্বাচন করিয়া গড়িতে হইবে ?

দুই রকমের লোক লইয়া গেরিল্লা বাহিনী গঠিত হয়। প্রথমতঃ, যাহারা আত্মীয় স্বজনের উপর বর্বর ফাসিস্টদের অত্যাচার, হত্যাকাণ্ড, বাড়ীঘরদোর, শস্য প্রভৃতি ধ্বংস হওয়ার দরুন প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প। তাহাদের লইয়া ফ্যাসিস্ট অধিকৃত এলাকায় এক প্রকার দল গঠন করা যায়। আর দ্বিতীয় প্রকার দল গঠন করা যায় সামরিক কায়দায় শিক্ষিত অথচ সাধারণ পোষাক পরিহিত লোক লইয়া। ইহারা আধুনিক হাল্কা ধরণের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া স্থায়ী সৈন্য বাহিনীর অংশ স্বরূপ কাজ করিবে। প্রথমে অস্ত্র না থাকিলেও ক্রমশঃ যোগাড় করিতে হইবে। এই দুই প্রকার দল গঠনের কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নাই; এবং প্রায়ই প্রকৃত কাজের সময় দুই রকম দলকেই একত্রে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে হয়।

প্রশ্ন হইতেছে—আমাদের দেশে কিভাবে আমরা বিভিন্ন এলাকায় গেরিল্লা-বাহিনী গঠন করিতে পারি ?

প্রথমতঃ কর্মী সংগ্রহ করা এক সমস্যা। কে গেরিল্লা বাহিনীর সভ্য হইতে পারিবে ? এবং, কি রকম লোককে গেরিল্লা সহকর্মী হিসাবে অযোগ্য বলিয়া বাদ দেওয়া চলিবে ? যে-কোন বয়সের লোক, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে, গেরিল্লাবাহিনীতে যোগ দিতে পারিবে। কোন এলাকায় স্থানীয় অধিবাসী এবং জনসাধারণের মধ্যে সাহসী, শ্রমসহিষ্ণু, আত্মত্যাগী বলিয়া পরিচিত লোকেদের ভিতর হইতেই কর্মী বাছাই করিতে হইবে। দুর্বলচেতা এবং রাজনৈতিক মতবাদ ও সাধারণ জীবন যাত্রা বিষয়ে চঞ্চল বা দ্বিধাগ্রস্ত লোককে আমরা বাছাই করিব না। আর, কেবল মাত্র ধনী ও ক্ষমতাশালী বলিয়াই কাহাকেও লওয়া হইবে না। যাহারা প্রকৃত

গেরিল্লা জীবনের শারীরিক ও মানসিক অসুবিধাগুলি সহ্য করিতে পারিবে না এরূপ দুর্বলচেতা এবং স্থবির লোকদের বাদ দিতে হইবে। গেরিল্লার পক্ষে কিরূপ কঠোর পরিশ্রমী ও কর্ম্মসহিষ্ণু হইতে হয় তাহা চীনা গেরিল্লাদের উদাহরণ হইতেই বুঝা যায়। বর্তমান চীনা "নব চতুর্থ বাহিনীর" (New Fourth Army) নায়ক হ্যান্‌-ইং চীনের গৃহবিবাদের যুগে নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "আমরা কখনই পেট ভরিয়া খাইতে পাইতাম না; আমরা রাত্রে ঘুমাইবার সাহস করিতাম না, কি জানি শত্রু কখন আক্রমণ করে। জুতা পায়ে দিয়াই একটু শুইয়া লইতাম। নিদারুণ শীতে বরফের মধ্যে শত তালিযুক্ত সূতির পোষাক ক্রমান্বয়ে দুই বৎসর ধরিয়া পরিতে হইল। চার পাঁচদিন ধরিয়া পরপর উপবাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু তবু আমরা বন্য আদিম অধিবাসীদের মতন বলশালী ও দ্রুতগামী হইতে শিখিলাম।"

গেরিল্লা কাজে নির্বাচিত প্রত্যেক লোককে আমাদের কার্য্য পদ্ধতির রাজনৈতিক নীতি সম্পর্কে ক্রমাগত বুঝাইতে হইবে:—কেন আক্রমণকারী শত্রুকে উৎখাত করিতে হইবে? কেন অল্প সম্বলে পরাক্রান্ত শত্রুর সঙ্গে অসমান যুদ্ধ চালাইতে হইবে? বর্তমান মুহূর্তে স্থানীয় দলাদলি মিটাইয়া ফেলিতে হইবে কেন? এই যুদ্ধের সঙ্গে তাহাদের গ্রামের, তাহাদের দেশের ও দুনিয়ার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও জনসাধারণের কি যোগসূত্র গাঁথা রহিয়াছে, তাহাও তাদের বলিতে ও বুঝাইতে হইবে। সময় থাকিতে তাহাদিগকে নিপুন প্রচারক ও জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনার বার্তাবাহীরূপে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে।

অদূরভবিষ্যতে আমাদের চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে এবং সে সময়ে একমাত্র সুদৃঢ় রাজনৈতিক মতৈক্য থাকিলে বিশেষ করিয়া ফ্যাসিস্ট শক্তিকে বাধা দিবার বিষয়ে আমরা গেরিল্লাদের সকলেই একমত হইতে যদি পারি তবেই আগত ঝড়-ঝঞ্ঝায় পড়িয়াও আমরা ঠিক পথে চলিতে পারিব। গেরিল্লাবাহিনী গঠন করিবার পরও কিন্তু আমাদের দলের ভিতরে বিরোধ দেখা দিতে পারে। এরূপ অবস্থায় আমরা কি করিব? এ পর্যন্ত যে-সব জনপ্রতিষ্ঠানের কাজ আমরা

করিয়াছি—যথা কৃষক-সভা, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি তাহার অভিজ্ঞতাকে এসম্পর্কে কাজে লাগাইতে হইবে। অবশ্য নেতা নির্বাচন এবং পরিবর্তন গণতান্ত্রিক উপায়ে ভোটের দ্বারা সোজাসুজি ভাবেই হইবে। তবে গণতান্ত্রিক নীতির উপর বেশী জোর দেওয়া ব্যক্তিপ্রাধান্যের মতই সমান বিপদজনক। সুতরাং এবিষয়ে প্রথম হইতে সাবধান হইতে হইবে। একটি নিয়ম করা ভাল যে, কাহাকেও দুইমাস অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার আগে কোনো সামরিক নেতৃত্ব দেওয়া হইবে না।

গেরিল্লা দলে প্রায়ই শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা শিথিল হইয়া পড়িবার একটা ঝোঁক দেখা দিবে। এইরূপ শিথিলতা শেষে দল গঠনের উদ্যোগ ও কাজ করিবার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে। তাই নিষ্ফলা যুক্তি প্রদর্শনকে প্রথম হইতেই বাধা দিতে হইবে। একবার কোনও প্রস্তাব গৃহীত হইলে সে সম্বন্ধে বাকী থাকে শুধু তাহাকে কার্যে পরিণত করা; অর্থাৎ বিরুদ্ধ-যুক্তিপ্রদর্শনের অবসর কার্যের প্রস্তাব গৃহীত হইলেই আর থাকে না। গৃহীত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কাহারও মতামত সুস্পষ্ট এবং বেশী জোরালোই থাকিতে পারে; কিন্তু সে যদি নিজের মত বজায় রাখিবার জন্যই ঐ গৃহীত প্রস্তাব সম্বন্ধে বিরুদ্ধ-যুক্তি দেখাইতে থাকে, তবে তাহাকে গেরিল্লা কার্যের অনুপযোগী বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। নতুবা ঐ ব্যক্তি দলের ভিতর, দেশের ভিতর ও গেরিল্লা প্রতিষ্ঠানের শাখা প্রশাখার সমস্ত লোকের মধ্যে বিচ্ছেদ ও দলাদলি সৃষ্টি করিতে থাকিবে। গণ্ডগোল সৃষ্টিকারী অথবা দাম্ভিক লোক গেরিল্লা হইবার উপযোগী নয়। কর্মীদের এই বিষয়ে সাবধান করিতে হইবে। মন্ত্রগুপ্তি (secrecy) কার্যের সার কথা,—কর্মীদের এই বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে। গেরিল্লার কর্মপদ্ধতি ভবঘুরের কর্মপদ্ধতি নয়, অথবা যাহা-ইচ্ছা-তাহা করাও নয়। গেরিল্লা কর্মপদ্ধতিকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে নিয়মিত কাজ করা প্রয়োজন এবং সেই কাজের অভ্যাসকে জ্ঞাতসারে নিশ্চিত উপায়ে ধীরে ধীরে বাড়াইয়া তুলিতে হইবে।

প্রথম হইতেই বাস্তবতার দিকে নজর দিবেন। বন্ধুত্ব বজায় রাখিয়াও আমাদের স্পষ্টবক্তা ও সত্যের সম্মুখীন হইতে হইবে। নিরাপদ গৃহে পুঁথিপত্র লইয়া কাজ

করা, অথবা বাগ্মীতার দ্বারা মামলা জিতিয়া দেওয়া, আর গেরিল্লা কার্যপদ্ধতি এক প্রকারের বস্তু নয়। গেরিল্লার কাজের সঙ্গে চাষীর কাজের অনেকটা তুলনা চলিতে পারে: চাষীকে যেমন ধৈর্যশীল, সতর্ক ও ক্ষিপ্রকারী হইতে হয়,—তাহাকে প্রতিটি আগাছা উপড়াইয়া ফেলিতে হয়, সময়মত সার দিতে হয় এবং কচি চারাগুলিকে জীবনের ও প্রকৃতির কঠিন পারিপার্শ্বিকতার উপযোগী করিয়া তুলিতে হয়,—সেই রকম গেরিল্লা জীবনেও ধৈর্য, সতর্কতা, ক্ষিপ্রতা, এবং আগাছার মত বিরুদ্ধ মত ও পথকে দূরে সরাইবার সাহস ও দৃঢ়তা দরকার হয়; তা'ছাড়া শরীরকে কঠিন অবস্থার উপযোগী করিয়াও গড়িতে হয়। গেরিল্লাকে প্রত্যেক মুহূর্তের জন্য সতর্ক ও সচেতন হইয়া চারিদিকে নজর রাখিতে হইবে।

অতএব এখন হইতেই উপযুক্ত লোকদের বাছিয়া লইয়া বৈঠক ও আলোচনা আরম্ভ করুন। প্রত্যেককে শৃঙ্খলার ভিতর আনিবার জন্য রাশিয়ার গেরিল্লাদের অনুকরণে শপথ লওয়ার প্রয়োজন আছে। যেমন,—"আমি, এই সুমহান ভারতের অধিবাসী, বীর বাঙ্গালীর সুযোগ্য সন্তান, আজ শপথ করিয়া বলিতেছি যে, বাংলার মাটিতে বর্বর ফ্যাসিস্ট শত্রুর শেষ মানুষটিও যতদিন জীবিত রহিবে, ততদিন আমি আমার অস্ত্রত্যাগ করিব না। আমি মন মুখ এক করিয়া প্রতিজ্ঞা লইতেছি যে, আমি আমার কম্যাণ্ডারদের হুকুম মানিয়া চলিব এবং সামরিক শৃঙ্খলা নিখুঁতভাবে বজায় রাখিব।

"আমি শপথ করিতেছি যে শত্রু কর্তৃক আমাদের পল্লী ও নগর ধ্বংসের ও ছেলেমেয়ের মৃত্যুর এবং জনসাধারণের প্রতি অত্যাচার, অপমান ও জিঘাংসার প্রতিশোধ আমি নিষ্করুণ ও নির্দয় হইয়াই লইব। রক্তের বিনিময়ে রক্ত, মৃত্যুর বিনিময়ে মৃত্যু—ইহাই আমার একমাত্র পণ।

"আমি ঘোষণা করিতেছি যে, শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া আমার স্বজন, পরিবার ও দেশবাসীকে রক্তপিপাসু ফ্যাসিস্ট দস্যুদের গোলাম বানাইবার আগে বরং আত্মহত্যা করিব।

"আমি যদি ব্যক্তিগত ভীরুতা, দুর্বলতা, অথবা কু মতলব-বশে এই শপথ ভঙ্গ

করি এবং জনগণের স্বার্থ বলি দেই, তাহা হইলে অন্যান্য কমরেডদের হাতে আমার যেন ঘৃণিতভাবে মৃত্যু ঘটে।"

গেরিল্লাদল নির্বাচন সম্পর্কে উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে প্রমাণ হয় যে গেরিল্লাবাহিনীর উপযুক্ত কর্মী খুঁজিয়া পাওয়াই সবচেয়ে বড় সমস্যা। নির্বাচন করিবার বিষয়ে যদি ভুল না হয়, তো, এমন কি মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা গঠিত যে কোনো গেরিল্লাবাহিনী-ই ক্রমশঃ শত শত লোকের বাহিনীতে পরিণত হইবে এবং ছন্নছাড়া হইয়া পড়িবার কোনও সম্ভাবনা থাকিবে না। কোন রাজনৈতিক পার্টিমেম্বারদের মধ্যেই গেরিল্লাদলকে সীমাবদ্ধ রাখা চলিবে না; জনসাধারণকে দলে টানিতে হইবে। আমরা জনসাধারণকে কতখানি সক্রিয় করিয়া তুলিতে পারিব এবং স্থানীয় জননেতাদের আমাদের বাহিনীর প্রতি কতটা আকৃষ্ট করিয়া তুলিতে পারিব—তাহার উপরই আমাদের সফলতা নির্ভর করিতেছে।

সংগঠনের কথা বলিতে গেলে মনে রাখিতে হইবে যে, বিভিন্ন গেরিল্লাবাহিনীর [যথা, রিজার্ভ, গুপ্ত ও জঙ্গী গেরিল্লাদলের] প্রত্যেকটিতে একজন রাজনৈতিক নায়ক (Political Commissar) ও একটি রাজনৈতিক বিভাগ নিয়োগ বা স্থাপন করিতে হইবে।

এই নায়কের ও তাঁহার বিভাগের কাজ খুবই গুরুত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ। যে ইউনিটের সহিত উক্ত নায়ক সংশ্লিষ্ট থাকিবেন, তাহাকে তাহার সংগঠয়িতা ও শিক্ষাদাতা বলা যায়। তাঁহাকে দেখিতে হইবে যে, ইউনিটটি যেন স্থিরলক্ষ্যে সক্রিয় মনে যুদ্ধ চালাইতে থাকে অর্থাৎ যুদ্ধ করিবার আসল উদ্দেশ্য যেন তাঁহার কাছে নিয়তই সুস্পষ্ট থাকে। তাঁহার সহযোগিতা ছাড়া সামরিক সিদ্ধান্ত এমন কি কম্যাণ্ডারও করিবেন না। সুতরাং তাঁহার দায়িত্বও অনেক, কেন না, কম্যাণ্ডার শুধু হুকুম দিয়াই খালাস; কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে হইবে, যেন সেই হুকুম মত কাজ হাসিল হয়। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সামরিক সিদ্ধান্ত বিষয়ে রাজনৈতিক নায়কের বলিবার কি থাকিতে পারে? উত্তর হইতেছে, রাজনৈতিক সংগঠন করিতে গিয়া বিপ্লবীকেও সামরিক কৌশলের ন্যায় কৌশল খাটাইয়া প্রতিপদে চলিতে হয়। তাই, কোনও সুযোগ্য চতুর

বিপ্লবী রাজনীতিবিদ সহজেই একজন ভাল রণনীতিজ্ঞ হইতে পারেন। মশিয়ে ষ্ট্যালিনই ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। গেরিল্লা দল হইল বিপ্লবী দল অতএব যিনি বিপ্লবী তিনি এই দলকে ভাল করিয়াই পরিচালিত করিতে পারেন।

রাজনৈতিক বিভাগ ব্যতীত গেরিল্লা দলে নিজস্ব একটি চিকিৎসা বিভাগ, একটি কৃষ্টি বিভাগ থাকিবে। চিকিৎসার সাজ সরঞ্জন বলিতে ব্যাণ্ডিজের জন্য ধোপা কাচা পুরাণ কাপড়, কিছুটা আইওডিন্, বোরিকতুলা ও বোরিক পাউডার ইত্যাদি যাবতীয় প্রাথমিক চিকিৎসার সাজ সরঞ্জামগুলি থাকিবে। আর কিছু কুইনাইন ও একদফা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এবং একখানি হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসার পুস্তকও থাকিবে। পুরাণ পোড়ো বাড়ী বা মন্দির কি মস্‌জিদ্ হয়ত আমাদের হাঁসপাতাল হইবে; ছেঁড়া চট ও মাদুর বা তক্তা হইবে রোগীর বিছানা, এবং বাঁশের 'চোঙা' হইবে ঔষধের শিশি। কিন্তু চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া, ভিক্ষা-শিক্ষা করিয়া চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম ক্রমশঃ বাড়াইতে হইবে।

কৃষ্টি বা ক্যালচারেল্ বিভাগের কাজ হইবে নিরক্ষর গেরিল্লাদের লিখিতে, পড়িতে, জনসঙ্গীত গাহিতে, জননাট্য অভিনয় করিতে, প্রাচীর চিত্র আঁকিতে, ছাপিয়া বা সাইক্লোষ্টাইল করিয়া নিজেদের কাগজ মুদ্রিত করিতে শিখানো। স্কুলে বা সভা করিয়া বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ে বক্তৃতার আয়োজন করিতে হইবে, যেমন, "বিপ্লবের ইতিহাস", "ভূগোলের শিক্ষা", রাশিয়ার সভ্যতা", "চীনের গেরিল্লা"—ইত্যাদি।

গেরিল্লাদল গ্রামে গ্রামে বা বিভিন্ন পাহাড়ে জঙ্গলে হাটে মাঠে ঘাটে পথে ছোট ছোট দলে ছড়াইয়া থাকিবে এবং ঘাঁটি কখনই এক জায়গায় স্থায়ীভাবে গড়িবে না—আজ এখানে কাল ওখানে, এইরূপ স্থানান্তরিত করিতে থাকিবে। অস্থায়ী অথচ পাকা ঘাঁটি বসাইতে হইবে কমবেশী দূরে—গভীর জঙ্গলে বা দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে যেখানে ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী বা বোমারুবিমান কার্যকরী হয় না। একজায়গায় দল পাকাইয়া থাকিলে অতর্কিতে সমূহ বিপদ ঘটিতে পারে। গেরিল্লারা যেখানেই যাউক, সেখানে চারিপার্শ্বে প্রহরী বসাইবে ["স্কাউটিং ও পেট্রলিং" পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য] এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিবে। গেরিল্লা

যোদ্ধারা যেখানে যখন যাইবে, সেইখানেই বিপ্লবের বার্তা বহন করিয়া লইয়া যাইবে, সকলকে গেরিল্লাযুদ্ধের ও জাতীয় প্রতিরোধের তাৎপর্য বুঝাইবে। প্রকৃত স্বাধীনতা কি করিয়া আসিবে, সমাজ বৈষম্যের অবসান সত্যই কেমন করিয়া হইতে পারে, ফ্যাসিজমের আসলরূপ কি তাহা বলিবে, বুঝাইবে এবং সকলকে দলে টানিয়া সামরিক শিক্ষা দীক্ষা দিবে। এই ভাবে গেরিল্লারা যেখানেই যাইবে সেখানে তাহাদের মুখে লোকে যেন নূতন আশার বাণী শুনিতে পায়। তাহারা যেন বিপ্লবী জনগণের ভরসার ও কামনার প্রতীক হইয়া উঠে। তাহারা প্রত্যেকের জাতীয় বৈশিষ্ট্য মানিয়া লইবে—স্বীকার করিবে কৃষ্টিগত ও ধর্মগত পার্থক্য; এবং প্রত্যেকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি দিয়া জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করিবে। "হিন্দু সংস্কৃতিকে রক্ষা কর"; "মোসলেম সংস্কৃতিকে রক্ষা কর"; "সকলের ধর্মের স্বাধীনতা চাই"; "জাতীয় আত্মস্বাতন্ত্র্যের অধিকার স্বীকার কর"; "হিন্দু-মুস্‌লিম এক হও"; "জাপবিরোধী গেরিল্লাবাহিনী গঠন কর"; "ফ্যাসিজম ধ্বংস হোক্"—ইত্যাদি শ্লোগান ব্যবহার করিয়া গেরিল্লা দল যেখানেই যাইবে সেখানেই নিজস্ব সদয়, মিষ্ট ও ভদ্র ব্যবহারে সকলের শ্রদ্ধা, দরদ ও ভালবাসা অর্জন করিবে।

গেরিল্লা-যুদ্ধ ও নারীর কর্তব্য

"Women workers (of Stalingrad) were loading rifles for their husbands, and young girls were tending the wounded and carrying them off the battle-field.".

(Reuter).

শুনিয়াছি, কিছুদিন আগে বাঙ্গালী এক মহিলা-ভলন্টিয়ারকে দেশীয় এক ভদ্র-লোক একটু বোধহয় রসিকতা করিয়াই বলিয়াছিলেন, "আপনারাও আবার দেশরক্ষা করিবেন দেখিতেছি!" মহিলাটি উত্তর দিয়াছিলেন, "আপনারা যখন নড়িবেন না দেখা যাইতেছে, তখন নিজেদের মানমর্যাদা নিজেরা ছাড়া আর-কে

রাখিবে?" ভদ্রলোক (বিরক্ত হইয়া): "ওসব কথা রাখুন; বরং রাজপুত রমণীদের মত জহর ব্রত ট্রত করিবার উপায় দেখিবেন।" মহিলা (সপ্রতিভ ভাবে): "উপদেশটি নেহাৎ ভালই। কিন্তু রাজপুত রমণীরা পুরুষদের বরণ করিয়া রণক্ষেত্রে পাঠানোর সময় বলিত, যেন পরাজয়ের গ্লানি নিয়া ফিরিয়া না আসে; ঘটিত-ও তাই; তারপর ঘরের দুয়ারে শত্রু আসিয়া পড়িলে জহর ব্রত করিয়া আগুণে পুড়িয়া মরিত। কিন্তু আপনারা এমন বীর পুরুষ যে ঠেলিয়া দিলেও ঘরের বাহির হইতে চান্ না! অতএব 'জহর'-চিতাটি একটু বড় করিয়াই সাজাইতে হইবে মনে হইতেছে, যাহাতে আপনাদিগকে লইয়াই মরা যায়!"

অপ্রিয় হইলেও উত্তরটি ঠিক-ই হইয়াছিল। একথা সত্য যে, আমাদের নিজেদের আলস্য, ঔদাসীন্য এবং কাপুরুষতা অনেক ক্ষেত্রেই ষোল আনার উপর আঠারো আনা। অথচ আমাদের মহিলারা আগাইয়া তৎপর হইতেছেন দেখিলে আমরা শুধু শ্লেষোক্তি করিয়াই কর্তব্য শেষ করি।

দিকে দিকে আজ নারী প্রগতির আবেগ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় আছে কি? দূরে থাকিয়া যিনি হাস্য-পরিহাস করিয়া তৃপ্তিবোধ করেন, তাহাকে বলিবার কি-ই বা থাকে, তবে একথা ঠিক যে, আজিকের এ বিশ্বব্যাপী নরমেধ যজ্ঞে অব্যাহতি কাহারও নাই। আমরা নিজের বলবীর্যের কথা ভুলিয়া যাই—নিজেদের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করি। ইতিহাসের দৃষ্টান্ত এবং শিক্ষাকে পর্যন্ত আমল দেই না। কাজেই আমাদের স্তিমিত চোখে আজ দুনিয়াব্যাপী নারীজাগরণের বিরাট ছবিটির অংশটুকু ও ধরা পড়ে না।

চীনের কথাই ধরুন। সে দেশের নারী-কৃতিত্বের বিভিন্ন পরিচ্ছেদকে আপাততঃ বাদ দিয়া রাখিতেছি; শুধু গেরিল্লা যুদ্ধে নারীর স্থান ও দানের কথা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। আর ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, আমাদের দেশেও গেরিল্লা যুদ্ধে নারীর সাহায্য কতখানি প্রয়োজন ও সম্ভব।

কিছুদিন পূর্বে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য বার্টলেট বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "আমার এখনো মনে আছে, একদিন রাত্রে হ্যাংকাও এ খাইতে বসিয়াছিলাম।

আমার পাশেই অতুলনীয়া ও অপরূপ সুন্দরী এক চীনা মহিলা ছিলেন। তিনি বলিলেন তাঁহার বাহুর মাংসপেশী খুবই শক্ত হইয়া গিয়াছে, কেননা সারা সকাল ধরিয়া তিনি হাতবোমা ছুঁড়িয়াছেন। সে হইল আজ চার বছরের কথা। কিন্তু আমরা ইংলণ্ডে আজও তর্ক করিতেছি যে, মেয়ে লোককে রাইফেল ছুঁড়িতে শিখানো হইবে কি না!"

ভারতবর্ষের অবস্থাও একই রকম; এখানে ও সেইভাবেই আমরা তর্ক করিতেছি। এবং মা-বোনদের জহর ব্রত করিয়া মরিতে উপদেশ প্রয়োজনীয়তা আছে কি না দিয়া 'নিশ্চিন্তে ক্যাভেণ্ডাস' ধরাইতেছি!

চীনের সপ্ততি বর্ষীয়া বৃদ্ধা মাদাম চাও-এ'র কথা জগতে আজ কে না জানে? জাপানী আক্রমণের পরদিনই ইনি (চাও-চুঙ-এর মাতা) এক ধনীর গৃহ হইতে কিছু অর্থ ভিক্ষা করিয়া সহর হইতে কোনো মতে দশটি পিস্তল ক্রয় করিয়া পুত্রের হাতে দিলেন। তাহার পর, অস্ত্রশস্ত্র লইয়া জাপানী-বেষ্টিত সহরের বাইরে কি করিয়া যাওয়া যায়? তখন, বুড়ী ও তাহার তুই মেয়ে কাপড়ের নীচে শক্ত ভাবে প্রত্যেকে তুটি করিয়া পিস্তল বাঁধিয়া রিক্সায় উঠিলেন। রিক্সার গদির নীচে এক হাজার গুলি ভরা বাক্সটি লুকানো আছে, পথে প্রহরী বাধা দিল। বুড়ী প্রহরীর প্রশ্নের আগে-ভাগেই বলিয়া বসেন, "তোমাদের আর কি কাজ নেই, বাবা! এক অথর্ব বুড়ী ও তুটি কচি মেয়েকেও তোমরা সন্দেহ করছ?"—থতমত খাইয়া প্রহরী পথ ছাড়িয়া দিল।······তারপর মাদাম চাও-এর কাজ-ই হইল, রোজ এক পথ দিয়া সহরে ঢুকিয়া অন্য পথ দিয়া গুলীগোলা লুকাইয়া লইয়া যাওয়া এবং পিপিং সহরের ভিতর গেরিল্লা দল ও গেরিল্লা দরদী সৃষ্টি করা। দেশভক্ত ধনী লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়া তিনি টাকাকড়ি ও তুলিতে লাগিলেন। এক দোকানী একদিন তাঁহাকে ঠকাইবার ফিকিরে ভয় দেখাইয়া বলিল, টাকা না দাও তো জাপানীর হাতে ধরাইয়া দিব।" বুড়ী উপস্থিত বুদ্ধি খাটাইয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "জেনে রেখো, আমরা মরবার জন্ত ভীত নই; তবে মরবার আগে জাপানীদের ব'লে যাবো যে, এই দোকানীই বরাবর গেরিল্লাদের অস্ত্র জুগিয়ে আসছে।" দোকানী তা' শুনিয়া তো ভয়েই অস্থির!

এইভাবে বুড়ী ও ছোট মেয়েরাও গেরিল্লার গুপ্তচর হিসাবে, দেশপ্রাণ লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিবার সূত্র হিসাবে, এবং অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করিবার সহায়ক হিসাবে বহুবিধ প্রয়োজনীয় কাজ করিতে পারেন।

মেয়েরা প্রচারকার্য বেশ চালাইতে পারিবেন। চীনের "Women Service Corps"টি একটি অল্প বয়স্কা নর্মাল স্কুলের ছাত্রী দ্বারা সংগঠিত হইয়াছিল। ইহা এখন শত্রু অধিকৃত অ্যানহুই প্রদেশে গ্রামে গ্রামে প্রচারকার্য চালাইতেছে।

কৃষ্টিমূলক কার্যে যথা জনসঙ্গীত, জননাট্য, চিত্র-প্রদর্শনী, নৈশ স্কুল, শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা, সাহিত্য-অনুশীলন ইত্যাদি বিষয়ে মেয়েদের উপযোগীতা ও পারদর্শিতা খুবই স্বাভাবিক। মিস্ হু-ল্যান্-চী একজন প্রগতিশীল লেখিকা। তিনি সাংহাই প্রদেশে একদল মজুর বালিকাকে সংঘবদ্ধ করিয়া প্রচারবাহিনী, গতিশীল থিয়েটার ও ভ্রামমান্ বিদ্যালয় প্রভৃতির কার্যাদি করিতেছেন।

চাষী মেয়েদের মধ্যে প্রচারের ফলে তাহাদের নিরক্ষরতা ও কুসংস্কার দূর করিয়া তাহাদের সংঘবদ্ধ করা মেয়ে গেরিল্লাদেরই কাজ। চীনা মহিলা ভলান্টিয়াররা প্রথমে ভুল করিত। ইউনিফর্ম পরিয়া সামরিক আদবকায়দায় তাহারা গ্রামে প্রচার করিতে যাইত। ফলে শান্সির গ্রাম্য মেয়েরা ভয়ে ছুটিয়া পলাইয়া বাড়ীর দরজা বন্ধ করিত। দায়ে ঠেকিয়া নূতন কৌশল অবলম্বন করিতে হইল; এখন হইতে মেয়ে গেরিল্লারা চাষীর মেয়ের মত পোষাক পরিল; গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে ভাব করিয়া, "দিদি, কেমন আছো: কি রাঁধিলে?" ইত্যাদি নিতান্ত সাধারণ ঘরোয়া আলাপ আলোচনা মারফৎ তাহাদের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া তাহাদের কাজে সাহায্য করিয়া—শস্য সংগ্রহ করিয়া, কাপড় কাচিয়া, চুল বাঁধিয়া, ছেলেপুলেদের কোলে লইয়া, আদর করিয়া এবং আরো বহুবিধ উপায়ে তাহাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন করিল এবং ক্রমশঃ বলিয়া কহিয়া বুঝাইয়া অনুরোধ করিয়া তাহাদের কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা, নিরক্ষরতা প্রভৃতি দূর করিতে সাহায্য করিতে লাগিল। এইভাবে সংগঠনের কাজ চলিতে থাকে।

চীনে আজ "Women's National Salvation Association"

নামক বিরাট মহিলা সংঘের সৃষ্টি হইয়াছে। কাপড় বুনা, জুতা তৈয়ারী, সীবন কাজ, কাপড় পরিষ্কার করা, আহতদের শুশ্রূষা করা, চলমান সৈন্যদের পথিমধ্যে জল সরবরাহ করা, পুরুষেরা বীজ বপন উপলক্ষ্যে অনুপস্থিত থাকিলে গ্রামে পাহারা দেওয়া, নিরক্ষরদের লেখাপড়া শেখানো, জননাট্য অভিনয় করা, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন কার্যে অংশ গ্রহণ করা, ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ এই সঙ্ঘের পরিচালনায় হইয়া থাকে। নূতন কেহ গ্রামে ঢুকিলে, হয়ত সাধারণ একজন বৃদ্ধা মহিলা হঠাৎ করিয়া শুধাইবে—"রাস্তার ছাড়পত্র দেখাও। দেখি, তুমি কোন নিষিদ্ধ মাল নিয়ে যাচ্চো কিনা।"

চিকিৎসা বিভাগে এবং রসদ বিভাগেও মেয়েদের ষোলআনা কাজ করিবার অবকাশ আছে। অর্থাৎ (১) রোগীর সেবাশুশ্রূষা করা এবং (২) জঙ্গী গেরিল্লা তথা গেরিল্লা-দরদীদের জন্য আহার্য তৈয়ারী ও রসদ বণ্টন গেরিল্লা মেয়েদের দুইটি প্রধান কাজ।

বর্তমান যুদ্ধে রাশিয়ার মেয়ে গেরিল্লার কাজ তিন ভাগে ভাগ করা যায়:—

(ক) গেরিল্লা দলে থাকিয়া তাহারা লড়াই করে, (খ) স্কাউট্, দূত ও ডিটেক্টিভের কাজ করে, (গ) আহার্য সরবরাহ করে ও আহতদের সেবা করে।

'পোলটাভা'র কাছে বিংশতিবর্ষীয়া 'মেরিয়ার' গ্রামে জার্মান হেড কোয়াটার্স ধ্বংস করিতে হইবে। স্থানীয় গেরিল্লার একটি স্কোয়াড্ করা হইল—মেরিয়াকে তাহার নেতৃত্ব দেওয়া হইল। সে তাহাদের গোপন পথে লইয়া চলিল এবং নিজে বুকে হাঁটিয়া জার্মান সামরিক কর্তাদের কেন্দ্রের নিকট পৌছিয়া জানালা দিয়া একটি হাত বোমা নিক্ষেপ করিল। চারজন নাৎসী অফিসার তাহার হাতে মরিল। বাকী-গুলিকে অন্য গেরিল্লারা খতম করিল।

সম্প্রতি লালফৌজের একটি তত্ত্বতল্লাসী দল শত্রুর পিছনে সন্ধান লইতে লইতে আসিতেছিল। দেখিল একটি গেরিল্লাদল সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের দ্বারা সংগঠিত; কেবল কম্যাণ্ডার একটা ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ। এই দলটি জার্মান "মাইন-ফিল্ড" গুলি এমন করিয়া ঢাকিয়া রাখে যে, শত্রু নিজেরই যান-বাহন চলিবারকালে অতর্কিতে

মারা পড়ে। কিন্তু এ সম্পর্কে নিজেদের লালফৌজকে তাহারা সাবধান করিয়া দেয়। একদিন তাহারা জঙ্গলের এক গোপন পথ দিয়া একটি লালফৌজকে পরিচালিত করিয়া রাস্তার প্রকাণ্ড একটি মোড়ে যেখানে জার্মানবাহিনী ঘাঁটি গড়িয়াছিল সেখানে আনিয়া উপস্থিত করিল। ফলে লালফৌজ কিছু পরেই নাৎসী ঘাঁটি অতর্কিত আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইল।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে মেয়ে-গেরিল্লারা পুরুষ-গেরিল্লাবাহিনীরও নেতৃত্ব করিয়া থাকে। সেতু উড়াইয়া দেওয়া, টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দেওয়া, শত্রু সৈন্যকে বন্দী করা, ট্যাঙ্ক ধরিবার কৌশল খাটানো, মোটর লরী প্রভৃতি উল্টাইয়া দেওয়া, শত্রুর তৈলের ঘাঁটি জ্বালাইয়া দেওয়া—ইত্যাদি নানাবিধ কাজ মেয়ে-গেরিল্লারা করিয়া থাকে। অ্যাব্রামোভা এক গেরিল্লা দলে ভাল নার্সের কাজ করিবার পুরস্কার স্বরূপ "অর্ডার অব্ দি রেড ব্যানার" নামক সম্মান লাভ করিয়াছে। একদিন লড়াইয়ের পরে সে একেলা একে-একে ৩২টি আহত গেরিল্লা যোদ্ধাকে রণক্ষেত্র হইতে বহন করিয়া লইয়া যায়—শত্রু তখনও গোলাবর্ষণ করিতেছিল।

মেয়ে গেরিল্লার এইরূপ বীরত্ব ও স্বার্থত্যাগের কাহিনী বহু উল্লেখ করা যাইতে পারে। মেরিয়া, তানিয়া প্রভৃতি কিশোরীর দেশরক্ষার্থে আত্মবলির আদর্শ যুগে যুগে অমর হইয়া থাকিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গেরিল্লা যুদ্ধের নীতি ও কৌশল

গেরিল্লার সামরিক নীতি হইতেছে যে, তাহারা সম্মুখ-যুদ্ধ (Pitched battles and frontal attack) করিবে না। স্থিতিশীল যুদ্ধ (Positional Warfare), অর্থাৎ ট্রেঞ্চ কাটিয়া পার্শ্বদেশ (flanks) রক্ষা করিয়া প্রচুর সাজসরঞ্জামসহ শত্রুর মুখোমুখি ঘাঁটী গড়িবে না ; বর্তমান নাৎসী কৌশলে বিদ্যুৎগতিতে যুদ্ধের যে ভঙ্গী বা গভীরভাবে শত্রুব্যূহ ভেদ করিবার নীতি—যাহাকে বলে 'সূচীভেদ" নীতি—tactics of deep infiltration—সে কৌশল গেরিল্লাযুদ্ধের কৌশল নয়। "আচম্বিতে মারিয়া নিমেষে পালাও"—ইহাই হইল গেরিল্লার রীতি। যদি গেরিল্লাবাহিনী বেশ দলপুষ্ট হইয়া উঠে এবং আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সুসজ্জিত হইয়া যথেষ্ট সামরিক শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে, তবে গতিশীল যুদ্ধ (mobile warfare) —এমন কি শত্রু-ঠকানো কৌশলী যুদ্ধ (manoeuvring warfare) ও শত্রুর পশ্চাতে ও পার্শ্বে এবং কিছুটা সামনাসামনিও চালাইবার ঝুঁকি লইতে পারে। কিন্তু প্রায় সবক্ষেত্রেই গেরিল্লারা সম্মুখ-সমর এড়াইয়া পিছনে অতর্কিত আক্রমণ চালাইবে—ইহাই তাহাদের মূল মন্ত্র। কিন্তু নেপোলিয়নও তো 'আল্পস্' পার হইয়া শত্রুকে পশ্চাতে হঠাৎ অতর্কিত আক্রমণ করিয়াছিলেন ; তবে তাহাকে গেরিল্লাযুদ্ধ বলিব কি ? না। গেরিল্লাদের বৈশিষ্ট্য হইল ইহারা সাধারণ সাজ-পোষাকে বেসামরিক লোকের মধ্যে (আত্মগোপন করিয়া) একেবারে মিশিয়া থাকে এবং "কোপ বুঝিয়া কোপ" মারে। ইহারা সর্বদাই আক্রমণাত্মক (offensive) লড়াই চালাইয়া থাকে। তবে প্রয়োজন হইলে গতিশীল বা কৌশলী যুদ্ধ এবং মাঝে মাঝে পশ্চাদপসরণের জন্য আত্মরক্ষামূলক (defensive) লড়াই-এরও কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে।

গেরিল্লা নীতিতে শত্রুকে আক্রমণ করিতে হইলে প্রথমেই জানিতে হইবে, শত্রু কোথায় রহিয়াছে বা চলাফেরা করিতেছে। তদুদ্দেশ্যে কোন্ কোন্ রাস্তায় বা নদীপথে শত্রু অগ্রসর হইতে পারে তাহার মোটামুটি একটা ধারণা এখন হইতেই করিয়া রাখিতে হইবে। তাই এখনি ম্যাপ দেখা অভ্যাস করুন, দেশের প্রতিটি কদম জায়গার সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ট করিয়া তুলুন; রবার নির্মিত নৌকায়, ট্রেনে, সাইকেলে বা মোটর সাইকেলে, মোটর লরী বা ট্যাঙ্কের সাহায্যে অথবা প্যারাস্যুট ও সৈন্যবাহী বিমানের মারফত কোথায়—কোন্ রেলপথ, রাস্তা, জঙ্গল, জলাভূমি বা নদীপথে পিপীলিকার মত জাপানী সৈন্যেরা দেশের অভ্যন্তরে ঢুকিতে পারে, তাহা কল্পনা করিয়া রাখুন। তারপর, মনে মনে ছবি আঁকিতে হইবে যে, শত্রু-আক্রমণের পরে যে সব জায়গায় গিয়া অন্যান্য সহকর্মী লইয়া গেরিল্লার যে ঘাঁটি আপনি গড়িবেন ভাবিতেছেন, সেখান হইতে আপনার ঐ কল্পিত শত্রু-চলাচলের পথগুলি কতদূরে কোথায় অবস্থিত থাকিবে। সেই হিসাব অনুযায়ী আপনি শত্রু-চলাচলের রাস্তার পার্শ্ববর্তী গ্রাম ও নগরে যাইয়া সংগঠন চালাইয়া আপনার ভাবী গেরিল্লা-কেন্দ্রগুলির জমি তৈয়ারী করিতে থাকিবেন। অবশ্য শত্রু-আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় দেশে এমন অনেক সমস্যা দেখা দিবে যাহা এখন কল্পনাও করা যায় না, কিন্তু তবু সময় থাকিতে সতর্ক এবং দূরদর্শী হওয়া ভাল।

অতএব গেরিল্লার কার্যারম্ভের প্রথম ধাপ হইতেছে (১) ভৌগলিক জ্ঞানের নিখুঁত ব্যবহার। (২) তারপর আপনাকে জানিতে হইবে :—(ক) অধিকৃত এলাকায় শত্রু কোন্ কোন্ জায়গায় ঘাঁটি গড়িয়া কিরূপ পাহারা বসাইয়াছে। ধরুন, জানিতে হইবে শিলিগুড়ি হইতে কলিকাতা পর্যন্ত রেললাইনের উপর কোন্ কোন্ ষ্টেশনে বেশী আর কোথায় বা কম শত্রু-সৈন্য পাহারা দিতেছে—সম্ভবত: 'জংশন' গুলিতে তাহারা বেশী জোরালো ঘাঁটি বসাইবে; গেরিল্লারা যথেষ্ট শক্তিশালী না হইলে প্রথমতঃ সেদিকে যাইবে না। কিন্তু এই 'জংশন'গুলি ছাড়া কতকগুলি দুর্বল ঘাঁটিও থাকিবে—সেইখানে আঘাত করুন; উদ্দেশ্য—হাতিয়ার সংগ্রহ বা

মাল বোঝাই গাড়ী লাইনচ্যুত করা। (খ) দুই নম্বর কাজ হইতেছে যে আপনাকে জানিতে হইবে শত্রু তাহার চলিবার পথে কোথায় কিরূপ দলে পুরু হইয়া আসিতেছে এবং কোন কোন জায়গায় বিশ্রাম লইতেছে বা অস্থায়ী শিবির স্থাপন করিতেছে,—জানিতে হইবে দক্ষিণ বঙ্গ হইতে খুলনা-যশোহর নদীয়া-মুর্শিদাবাদ জেলাগুলির ভিতর দিয়া বড় বড় রাস্তাগুলি ধরিয়া অগ্রসর হইবার কালে কোন স্থানে জাপানীরা রাত্রের জন্য তাঁবু ফেলিতেছে এবং কিরূপ পাহারা বসাইতেছে। এই খবর অতি দ্রুত গেরিল্লাদের সংগ্রহ করা চাই, যাহাতে শত্রুকে দুর্বল বুঝিলে সেই রাত্রেই আঘাত করা যায়। (গ) তৃতীয়তঃ খবর রাখিতে হইবে কোন কোন জেলার সদর বা মহকুমা সহরে বা নিকটবর্তী এলাকাগুলিতে স্থানীয় 'পুতুল-শাসন' (puppet administration) চালু করিয়া শত্রু কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ সীমানায় কি পরিমাণে সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছে এবং সেই জায়গাগুলিকে কেন্দ্র করিয়া দেশের ভিতর হইতে রসদ প্রভৃতি সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টাকে নিষ্ফল করিয়া দিতে হইবে। দলবদ্ধ হইয়া একসঙ্গে শৃঙ্খলার সহিত কাজ করা, প্রয়োজন। শত্রু আসিতেছে, সংবাদ পাইবামাত্র তখনি রসদগুলি লুকাইয়া ফেলুন—এজন্য ধান, চাউল, ও অন্যান্য আহার্য বা ব্যবহারের জিনিষ কখনই এক জায়গায় সঞ্চয় করিয়া রাখিতে নাই ; ছোট ছোট এলাকা ও ঘাঁটি ঠিক করিয়া ছড়াইয়া রাখিয়া পাহারা বসাইতে হইবে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে শত্রু আসিবার আগেই দৈনন্দিন চাহিদা মিটাইবার মত আহার্যাদি রাখিয়া বাকী রসদাদি দূরস্থ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে সঞ্চয় করিয়া রাখা দরকার হইবে। অতর্কিতে শত্রু হানা দিলে যদি লুকাইবার অবসর না মিলে তবে, হয় "পোড়ামাটির" নীতি অনুযায়ী নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে, নয় অপহৃত হইবার পর পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। পুনরুদ্ধার করিতে পারিলে অপহৃত লোকের মধ্যে আবার বণ্টন করিয়া দিতে হয়। ইহাতে গেরিল্লাদের কৃতিত্ব ও লোকপ্রিয়তা বাড়িয়া যায়। অপর পক্ষে গেরিল্লাদের আর একটি কাজ হইবে—'পুতুল শাসন' উচ্ছেদ করা, স্থানীয় নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং জাপানী প্রহরীকে ধ্বংস করা।

(৩) এখন হইতে ম্যাপ দেখিয়া শত্রুর অবস্থানের বিশদ বিবরণ জানা যাইবে না। যেখান দিয়া যখন শত্রু-সৈন্য অতিক্রম করিবে, তখন সেই জায়গার স্থানীয় গেরিল্লাদূত আসিয়া মূল গেরিল্লাদের বা তাহাদের দলের লোকেদের কাছে খবর দিবে। ইহা ছাড়া, মূল গেরিল্লা ঘাঁটি হইতে নিযুক্ত বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ গেরিল্লা গুপ্তচর বা সংবাদবাহী পেট্রোল উক্ত খবরগুলি সংগ্রহ করিবে। শত্রুর অধীনে কার্যরত গেরিল্লা Spy বা 'চর', অথবা কলামূলা বিক্রয়ের ছলে ছদ্মবেশী গেরিল্লারা, এবং শত্রু-কবলিত লাঞ্ছিত ফ্যাসি-বিরোধী দেশপ্রাণ ব্যক্তিরাও বহুদিক হইতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সংবাদ সংগ্রহ করিবে।

(৪) কিন্তু মাত্র দুই একটি উৎস (source) হইতে খবর পাইয়াই শত্রুর চলাচল সম্পর্কে বা কোনও এলাকার জ্ঞাতব্য সবকিছু সম্পর্কে পুরাপুরি ওয়াকী-বহাল হইয়া গিয়াছেন মনে করিবেন না; দুই-একজন লোকের মুখে উড়ো-খবর শুনিয়াই আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন না। সংবাদটি নানা রকমে বিশ্বস্ত সূত্রে পরীক্ষা করিয়া তাহার সত্যতা সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হইয়া তবেই কাজে অগ্রসর হইবেন। পথ-চলতি যে-কোনও তৃতীয় ব্যক্তির কথায় যেন নাচিবেন না। নিজেদের বন্ধুলোক বা বিশ্বস্তকর্মী ছাড়া হঠাৎ আর-কাহাকেও বিশ্বাস করিলে অনেক সময়ে পঞ্চম-বাহিনী বা শত্রুর গুপ্তচরের ফাঁদে পা দেওয়া হয়।

(৫) শত্রুর অবস্থিতি বা চলাচলের বিশদ বিবরণ গেরিল্লা-গুপ্তচর বা গেরিল্লা-স্কাউট্ মারফত পাকাপাকি জানিতে পারিলেও যদি বুঝেন যে সে সময়ে আঘাত করিলে নিজেদের জয়ের আশা নাই, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে আক্রমণ করিতে যাইবেন না; তবে যদি নিশ্চিত ধারণা হয় যে, জয়লাভের আশা খুবই বেশী, তবে আর দেরী করিবেন না।

(৬) বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রাত্রিবেলায় আক্রমণ করিতে হইবে—প্রথম বা শেষ রাত্রিতে। কিন্তু কিছুদিন আঘাত খাইবার পর শত্রু রাত্রে জোরালো পাহারা বসাইবে। তখন অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। অনেক সময় রাত্রে চলাফেরা বন্ধ রাখিয়া শত্রু দিনে অগ্রসর হইবে। তখন দরকার, রাস্তার গলিঘুঁজিতে বা মোড়ে মোড়ে

বা যেখানে বনজঙ্গল রাস্তার পাশে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এমন সব জায়গায় দিনের বেলাতেই আঘাত হানা। তাঁবু গড়িয়া শত্রু বিশ্রাম করিতেছে এমন সময়েও কখনো কখনো দিবা-আক্রমণ চলিতে পারে। তবে, দিনের আলোতে আত্মগোপন করিয়া চলা খুব কঠিন কাজ; তাই, প্রায় সব ক্ষেত্রেই নৈশ অভিযানের প্রয়োজন হইবে। (নীচে ১৭নং দেখুন)।

(৭) রীতিমত কার্য্যকরী ভাবে আক্রমণ চালাইতে হইলে জানা দরকার শত্রু কতখানি দলে পুরু আছে। গেরিল্লারা শত্রুর সমানসংখ্যক যোদ্ধা লইয়া আক্রমণ করিবে—এমন কি নিজেদের লোকসংখ্যা কিছু বেশীই রাখিবে। তবে যদি শত্রু সৈন্যকে অতর্কিতে অপ্রস্তুত অবস্থায় পাইবার নিশ্চয়তা থাকে—যেমন, শত্রুর সৈন্য-বাহিনার চলিবার বা নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম করিবার সময়, অথবা যখন তাহারা হাল্কা পাহারা বসাইয়াছে, কিম্বা ছোট ছোট দলে বিচ্ছিন্ন হইয়া অগ্রসর হইতেছে—এই সব অবস্থায় দ্রুত গতিতে দৃঢ়তার সঙ্গে হঠাৎ শত্রুর আসল অংশে (organically vital part of the enemy's line) পার্শ্ব আক্রমণ (flank attack) করিলে, বেশ অল্প সংখ্যক গেরিল্লাই কাজ হাসিল করিতে পারিবে।

(৮) প্রথমেই খোঁজ লইবেন অথবা স্থিতিশীল গেরিল্লা পেট্রোল (standing patrol) মারফত দেখিয়া লইবেন—যেমন ২০০।৩০০ গজ বা ঐরূপ দূরস্থ কোনো উঁচু গাছ হইতে পর্যবেক্ষণ করিয়া লইবেন যে, শত্রুসৈন্যবাহিনীর কোন্ অংশটি দুর্বলতম অথবা তাহার মর্মস্থান কোন্‌টি, যাহাতে সেইখানে আঘাত করিলে নিজেদের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা কম অথচ শত্রুর মেরুদণ্ড ভাঙিয়া পড়িবে। কিন্তু শত্রুর মূলবাহিনী বা সুরক্ষিত ঘাঁটি এড়াইয়া চলিতে হইবে—বিশেষতঃ গেরিল্লাদের সম্বল যতক্ষণ অল্প।

(৯) অনেক সময় শত্রুর সংখ্যা, তাহার প্রস্তুতি ও শক্তি সম্পর্কে ভুল রিপোর্ট পাইয়া হয়ত আক্রমণ করিতে যাইবেন। কিন্তু কাছে গিয়া প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিয়া যখন সে ভুল বুঝিতে পারিবেন, তখনি, যেমনটি আগাইয়াছিলেন বিনাদ্বিধায় তেমনটি-ই হটিয়া আসিবেন। এমন কি, এ ভুল যদি আক্রমণ করিবার পরও

বুঝিতে পারেন, তখন পূর্বনির্দিষ্ট সঙ্কেতধ্বনি করিয়া তীব্র গতিতে পশ্চাদপসরণ করিবেন। নিরর্থক মার খাইয়া লাভ নাই। অবস্থার সঙ্গে অবস্থা মিলাইয়া খাপ-খাওয়াইয়া চলিতে বা কাজ করিতে জানা গেরিল্লাদের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। এই-খানেই সাধারণ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে গেরিল্লাদের প্রভেদ। নিয়মিত যুদ্ধে (regular warfare) হঠাৎ সিদ্ধান্ত বদলাইয়া চকিতে কাজ করিবার অবকাশ বা স্থিতি-স্থাপকতা (clasticity) কম। আক্রমণ করিতে নামিয়া যত ক্ষতিই হউক পিছাইব না—এই প্রকার জিদ্ তাহাদের পক্ষে অনেকক্ষেত্রে শোভন হইলেও গেরিল্লার পক্ষে ইহা মারাত্মক।

(১০) প্রত্যেক গেরিল্লা দলে (যেমন সেকশান্ বা প্লেটুন বা কোম্পানীতে) অন্ততঃ অর্ধেক পরিমাণ বিশ্বস্ত ও সাহসী কমরেড বাছিয়া এক একটি কর্মকুশল 'ক্যাডার' সৃষ্টি করিয়া রাখিবেন, যাহাতে কম্যাণ্ডার বা দ্বিতীয় কম্যাণ্ডার মারা পড়িলে বা বন্দী অথবা নিরুদ্দিষ্ট হইলেও তাহারা স্বপক্ষীয় বাহিনীকে পরিচালিত করিতে পারে।

(১১) প্রত্যেক গেরিল্লা যোদ্ধা নিজস্ব কম্যাণ্ডারের আদেশ ও নির্দেশ নিখুঁতভাবে মানিয়া চলিবে; কিন্তু সকলেই প্রতিপদে বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ করিবে। তবে যদি কেহ বুদ্ধি খাটাইবার অজুহাতে নিজের শ্রমলাঘবের বা বিপদ এড়াইবার অথবা স্বার্থ প্রাণোদিত হইয়া 'দল' পাকাইবার কৌশল-ই অবলম্বন করে, তবে নির্মমভাবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবেন বা দল হইতে বহিষ্কৃত করিবেন।

(১২) শত্রুকে আক্রমণ করিবার পূর্বে নিজেরা অসংখ্যবার "নকল আক্রমণের মহড়া" দিয়া লইবেন। তাহাতেও প্রথম প্রথম দু-একটি সত্যকার অভিযান তেমন নিখুঁত হয়ত হইবে না। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা করিবেন—ভুল করিলে নির্ভুল পথ বাছিয়া লইবেন। সব সময়েই দরকার—দ্রুত আঘাত দিবার ক্ষমতা (speed), সাহসিকতা (boldness), স্থির প্রতিজ্ঞা (unweavering decision), অতর্কিত আক্রমণ (surprise attack), শত্রুর মর্মস্থান (vital link) কোন্‌টি জানিতে পারা এবং আক্রমণ করিবার নির্ভুল পরিকল্পনা (flaw-lessly planned mannoeuvre)।

(১৩) আক্রমণ করিবার পূর্বে আপনার অভিযানের এবং বিশেষতঃ আক্রমণান্তে ফিরিবার (retreat) বা পশ্চাদপসরণের (withdrawal) একটি নিখুঁত ও বিস্তারিত প্ল্যান সযত্নে তৈয়ার করুন। এরূপ না করিয়া হঠাৎ আবেগভরে গোঁজা-মিল দিয়া আক্রমণ উদ্যত হইলে শত্রু আপনাদের বিষম কায়দায় ফেলিবে। মনে রাখিবেন, আপনার সম্বল হইল আপনার গতিশীলতা এবং কৌশল খাটাইয়া শত্রুকে পর্যুদস্ত করিবার সমধিক ক্ষমতা (superior offensive spirit)। এই ক্ষমতার সুযোগ না লওয়া মানেই শত্রু কর্তৃক নিঃশেষ হওয়া।

(১৪) শুনিতে অদ্ভুত লাগিলেও ইহা সত্য যে, গেরিল্লাবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ (rear) বলিয়া কোনো জিনিষ নাই—যেখানেই চলুক বা সৈন্যসমাবেশ করুক সেখানে সবদিকটাই তাহাদের সম্মুখভাগ (front)। ইহার অর্থ, তাহাদের গতি হয় দ্রুত এবং তাহারা চকিতে ঘুরিয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা রাখে ; সেজন্য তাহারা দলে হয় হাল্কা (স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর তুলনায়), এবং তাহাদের সাজসরঞ্জাম অল্প। আক্রমণকালে তাহাদের না থাকে সহকারী বা মজুত বিপুল সেনাবাহিনী (auxiliary or reserve force), না থাকে যান-বাহন ও রসদের হৈ-হাঙ্গামা। গেরিল্লাদের এক একটি দল স্বয়ং-সম্পূর্ণ (self-sufficient) ও আত্মনির্ভরশীল হয়। এই কারণে গেরিল্লা-লড়াই যতো অল্পকাল স্থায়ী হয় ততই গেরিল্লাদের সুবিধা এবং শত্রুর অসুবিধা।

(১৫) শত্রু যখন ঝিমাইতেছে, ঘুমাইতেছে বা অসাবধানে রহিয়াছে, সেই মুহূর্তে তাহার ঘাঁটি আক্রমণ করুন ; কিন্তু সব সময়ই এমন সুবিধাজনক অবস্থায় তাহাকে পাইবার আশা করিবেন না। কাজেই শুধু শত্রুর অসাবধানতার সুযোগ লইবার অপেক্ষায় কেবলই বসিয়া না থাকিয়া শত্রুধ্বংসের অন্যান্য কৌশল-গুলিও কাজে খাটাইবেন। কৌশলে শত্রুশক্তিকে বিক্ষিপ্ত এবং ভুলপথে পরিচালিত করুন। বিশ্বস্ত "গাইড্" বা পথপ্রদর্শকের বেশে ভুল পথ দেখাইয়া ও সুপরিকল্পিত "ক্যামোফ্লাজের" সাহায্যে ভুল রাস্তার জাল বিস্তার করিয়া [ফিল্ড ক্রীফট্—প্রথম পর্ব দ্রষ্টব্য] শত্রু যখন ছোট ছোট দলে গ্রাম অভিযানে চলিবে তখন

গান বাজনা শুনাইয়া নাচ দেখাইয়া, বিবাহ বা মৃত্যু উৎসবের নকল আয়োজন করিয়া, অথবা অপসারিত লোকজনের (Evacuees) অসহায় বেশে শত্রুকে অন্যমনস্ক করুন এবং সুযোগ বুঝিয়াই আঘাত হানিয়া পলায়ন করুন। সাদাসিদা পথিকের বা গোবেচারা গ্রামবাসীর বেশে শত্রুকে উল্টা খবর দিবেন এবং শত্রুর অগ্রগতি মন্দীভূত করিবেন। শত্রুর বিচ্ছিন্ন সৈন্যদলকে প্রলোভন দেখাইয়া গেরিল্লার কবলে আনিয়া ফেলিতে হইবে। যথা, খাদ্যদ্রব্য ও মেয়েমানুষের (অর্থাৎ বারবণিতার) মিথ্যা অথবা সাজানো সন্ধান দিয়া শত্রুকে গেরিল্লার গুপ্ত ঘাঁটিতে লইয়া আসিতে হইবে ["চীনা গেরিল্লার কৌশল" দ্রষ্টব্য]। এ সব করিতে হইলে বুকের পাটা এবং উপস্থিত বুদ্ধি থাকা দরকার—ইহাতে যে কোনও মুহূর্তে শত্রুর হাতে নিহত হইবার আশঙ্কা আছে। ইহা ছাড়া, অনেক সময়ে একদিক হইতে আক্রমণের ভাণ করিয়া আসল আক্রমণ অন্যদিক হইতে চালাইতে হইবে। উপরোক্ত কৌশলগুলিকে চীনা ভাষায় বলে—"পূবে হানিবার ছলনায় পশ্চিমে হানা।" অর্থাৎ আমাদের প্রচলিত গল্পে তাঁতির কাক মারিবার কৌশল—"তাক্ করিল 'মাকু' দিয়া, মারিল ঢেঁকীর 'ছেয়া'।"

(১৬) নজর রাখিতে হইবে শত্রু অথবা পঞ্চমবাহিনী যেন মূল গেরিল্লাবাহিনীর সন্ধান না পায়। এই উদ্দেশ্যে গেরিল্লারা সব সময়ে নিঃশব্দে ও গোপনে চলাফেরা করিবে। এক জায়গায় দলবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইবে না। কার্যোপলক্ষ্যে সাধারণতঃ এমন সংখ্যায় আগাইতে হইবে যাহাতে এমন কি পথিমধ্যে কাহারও মনে সন্দেহ না জাগে।

শত্রু যখন অগ্রসর হইয়া আসিতেছে তখন গেরিল্লারা কিছুতেই এক জায়গায় শক্তি সংহত করিবে না বা বড় আকারে দলবদ্ধ হইয়া থাকিবে না; যোগাযোগ রক্ষা করিয়া এবং পাহারা বসাইয়া বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট দলে ভাগ হইয়া রহিবে। আক্রমণের দরকার হইলে এক জায়গায় গোপনে মিলিত হইবে এবং নির্দিষ্টস্থানে ঘাঁটি করিবে। কিন্তু একই দিনে বা একই রাত্রে অন্ততঃ দুই-তিনবার ঘাঁটি পরিবর্তন করিবে। ইহার ফলে আক্রমণ উদ্যত গেরিল্লাদের মূলবাহিনীর সঠিক খবর বা অবস্থানকেন্দ্র কেহ সহজে জানিতে পারিবে না।

চলিবার সময়ে যেন হট্টগোল না হয়। পূর্ব হইতেই একটি জায়গা ঠিক করা থাকিবে, আক্রমণ শেষ করিয়া সেখানে যে ভাবে পারে আসিয়া জড় হইবে। ফিরিবার সময়েও কিন্তু উক্ত নির্দিষ্ট জায়গা সন্তর্পণে পরীক্ষা করিয়া লইবে, কেন না ইতিমধ্যে ঐ জায়গাটি শত্রুর বা গুপ্তচরের নজরে পড়িয়া থাকিতে পারে। গেরিল্লারা সব সময়েই সঙ্গত সন্দেহ (reasonable doubts) পোষণ করিবে।

(১৭) দিনেই হউক বা রাতেই হউক, সাধারণতঃ দুর্গম স্থানে, গ্রামের সরু রাস্তায় অথবা যেখানে যথেষ্ট আড়াল মিলে এবং মারিয়া পালাইবার সুবিধা আছে, যেখানে দলে পুরু হইয়া শত্রু চলাফেরা করিতে পারে না এমন বদ্ধ জায়গায় শত্রুকে আঘাত করা সুবিধাজনক। অতএব শত্রুর এমনতর অবস্থাগুলির সম্পূর্ণ সুযোগ লইতে হইবে।

(১৮) শত্রুকে হত্যা করাই আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য নয়; তাহার রসদ ও হাতিয়ার সংগ্রহ করা বা নষ্ট করা, এবং তাহাকে ব্যতিব্যস্ত রাখাই হইল গেরিল্লাদের আসল লক্ষ্য।

(১৯) "Tactics should be tip and run; not pushes but strokes"! ছোঁ মারিবার মত কোনো স্থানে তীব্র বেগে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া (প্ল্যান ও শৃঙ্খলার সঙ্গে) এলোপাথাড়ি আঘাত করিয়া আবার পর মুহূর্তে তীব্রবেগে উধাও হইতে হইবে। হয়ত কোথাও কৃতকার্য হওয়া গেল; কিন্তু তাই বলিয়া ভবিষ্যতে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য সেখানে ঘাঁটি বাঁধিতে গেলে চলিবে না। সেই মুহূর্তে আবার অন্যত্র তেমনি তীব্রবেগে আঘাত করিবার জন্য ছুটিতে হইবে। শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে কোনো স্থানের সাময়িক কৃতকার্যতার সুযোগ গ্রহণ করিতে গিয়া ছোট গেরিল্লাবাহিনীকে সমূহ বিপদে পড়িতে দেখা গিয়াছে। সেইজন্য ইহার একমাত্র নীতি হইবে "মারো পালাও, আবার মারো, আবার পালাও।" সন্ধ্যারাত্রে এখানে আঘাত করিয়া শেষ রাত্রে হয়ত চলমান্ সেই শত্রুবাহিনীকেই দশ মাইল দূরে অন্যত্র আবার আঘাত করিতে হইবে। বিভিন্ন গেরিল্লাদলকে শত্রুর চলাচলের রাস্তার ৫।৬

মাইল অন্তর, বাঁকে বাঁকে পৃথক পৃথক ভাবে সাজাইয়া রাখিয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী উপর্য্যুপরি শত্রুর উপর আক্রমণ চালানো যায়। এইভাবে একই দলের পরিশ্রম কমাইয়া শত্রুকে পদে পদে তিলে তিলে পর্য্যুদস্ত করা চলে।

এই সকল কৌশল শিক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে ট্যাঙ্ক ধ্বংস করিবার, হাতবোমা, টমিগান ও রাইফেল ছুঁড়িবার ও রেলের ফিস্‌প্লেট খুলিবার ও রেল বা রাস্তার সেতু উড়াইয়া গাড়ী লাইনচ্যুত করিবার, বিমানঘাঁটি ও তৈল ডিপো আক্রমণ করিবার এবং শত্রুশিবিরে আগুণ ধরাইবার বিভিন্ন কৌশল আয়ত্ব করিতে হইবে।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে গেরিল্লা শিক্ষার বা কর্তব্যের সারমর্ম এই-ভাবে বর্ণনা করা যায়:—নির্ভীক হও (fearlessness); ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ কর (swiftness); বুদ্ধি খাটাইয়া পরিকল্পনা তৈয়ারী কর (intelligent planning); গতিশীল হও (mobility); গোপনে কাজ করিতে শিখ (secrecy); এবং দৃঢ়তার সঙ্গে হঠাৎ কাজ হাঁসিল (suddenness and determination in action) কর।

পূর্বোক্ত গেরিল্লা-নীতির কথা মনে রাখিয়া কি উপায়ে ধাপে ধাপে আগাইয়া শত্রু-শিবির আক্রমণ করিতে হইবে—সেই আলোচনা এইবার করিব। মনে রাখিতে হইবে রাত্রিতেই আক্রমণের সুবিধা বেশী।

নৈশ অভিযান ও শত্রুশিবির আক্রমণের কৌশল

শত্রুর খবর পাইয়া বরাবর একটানা পথ চলিয়া একচোটে কাজ হাঁসিল করিব—ইহা নৈশ বা যে-কোনো অভিযানেরই পদ্ধতি নহে। চলিয়া থামিয়া, আবার খোঁজ লইয়া, দলকে ঢালিয়া-সাজিয়া আবার গুছাইয়া অভিযানের প্রচেষ্টাকে নানা পর্যায়ে ভাগ করিতে হইবে। রাতের অন্ধকারে দিক ঠিক রাখা, পথ চিনিয়া সৈন্যবাহিনীর সকলকে গুছাইয়া লইয়া ঠিকমত অগ্রসর হওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার—বিশেষতঃ চলিবার পথ যদি একটু সুদূরস্থিত (কাজেই খানিকটা অচেনা) এবং রাত্রির অন্ধকার

যদি খুবই ঘন হয়। সুশিক্ষিত, সুসজ্জিত ও দলপুষ্ট গেরিল্লাদের অনেক সময়ে বহু বহু দূরে যাইয়া শত্রুকে নাগাল দিতে হইবে; সে-সব ক্ষেত্রে পথঘাট সম্পর্কে স্থানীয় গেরিল্লা দূত (স্কাউট্) বা 'গাইডে'র উপর নির্ভর করিতে হইবে অনেকখানি। এমন অবস্থায় রাতের অন্ধকারে দলের যোগাযোগ বজায় রাখিয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হওয়া যদিও খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু সুশিক্ষা, সযত্ন প্রস্তুতি এবং স্বতঃপ্রণোদিত শৃঙ্খলা গেরিল্লাদের সহায়ক হইবে। যথারীতি খোঁজখবর লইয়া একটি সুনির্দিষ্ট প্ল্যান অনুযায়ী নিজেদের তৈয়ারী হইতে হইবে। তৈয়ারী হওয়া অর্থে বুঝায়—সময় ও দূরত্ব সম্পর্কে হিসাব রাখা; পথ বাছিয়া ঠিক করা, দিক ঠিক রাখিবার উপায় অবলম্বন করা; রাস্তার অন্তরায়গুলি—যথা, নদী পার হওয়া, পঞ্চমবাহিনী বা শত্রুর গুপ্তচরের চোখ এড়াইয়া চলা, চলিবার সময় কোনো যোদ্ধার শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিলে কতব্য ঠিক করা, অন্ধকারে শত্রু বা মিত্র চিনিবার উপায় ঠাহরানো—যথা সাঙ্কেতিক কথা বা শব্দ অথবা চিহ্ন স্থির করা (pass word বা badge); বিনা শব্দে ও গোপনে চলিবার এবং শত্রুকে ভাঁওতা দিবার কৌশল আলোচনা করা ["ফিল্ড ক্রাফ্ট্—দ্বিতীয় পর্ব দ্রষ্টব্য]; কোথায় প্রয়োজনমত বিশ্রাম করিতে এবং কোথা হইতে কি খাইয়া লইতে হইবে তাহা স্থির করা; সঙ্গে কি কি হাতিয়ার ও সাজসরঞ্জাম—যেমন নদীতে সেতু করিবার দড়ি; সাপে কামড়াইলে বাঁধিবার দড়ি, ছুরী, একটু আইওডিন, মোট কথা—আহত হইলে শুশ্রূষার প্রাথমিক উপকরণ ইত্যাদি কি কি লইতে হইবে তাহা ঠিক করা; এবং আর আর কি উপায় অবলম্বন করা উচিত (যেমন কেরোসিন বা পেট্রল ভিজানো কাপড় ও দেশলাই শত্রু শিবিরে আগুন দিতে লাগিবে) তাহা বুদ্ধি খাটাইয়া স্থির করিতে হইবে।

প্রস্তুত হইবার পর অভিযানের কৌশল ঠিক করিয়া লইতে হইবে। সাধারণতঃ নৈশ অভিযানের আয়োজনকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করিব—(১) মূল ঘাঁটি হইতে একটি নির্দিষ্ট জমায়েত কেন্দ্রে (Assembly Position) যাইয়া মিলিত হইতে হইবে। (২) এই জমায়েত কেন্দ্র হইতে একটি সমাবেশ কেন্দ্রে (Forming

up place) একত্রিত হইতে হইবে। (৩) এই সমাবেশ কেন্দ্র হইতে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইতে ও আক্রমণ করিতে হইবে।

নৈশ অভিযানের প্রথম পর্ব:—সমর শাস্ত্রে ইহাকে Night Marches বা নৈশ মার্চ বলে। অবশ্য গেরিল্লারা এতো গালভরা কথা বা সামরিক সনাতনী আদবকায়দার ধার ধারে না। চিত্রিত বিচিত্রিত ম্যাপ হাতে লইয়া, পিন আঁটিয়া, ঘড়ি পাতিয়া, দিগ্‌দর্শন যন্ত্র ঘুরাইয়া বহু গবেষণা করিবার সম্বল বা সময় সাধারণতঃ গেরিল্লাদের নাই। তথাপি শত্রুকে আক্রমণ করিবার সুচিন্তিত পরিকল্পনা তাহাদের গ্রহণ করিতে হইবে।

মনে করুন বাঙ্‌লার একটি এলাকাকে কেন্দ্র করিয়া দুর্ধর্ষ এক গেরিল্লাদল গঠন করিয়া তাহাকে দলে দলে ভাগ করিয়া বিভিন্ন গ্রাম বা পাহাড় কি বন জঙ্গলে ছড়াইয়া দিয়াছেন এবং ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া সংগঠনের কাজ চালাইয়া যাইতেছেন। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় আপনারই একটি দলের কাছে খবর আসিল (বিশ্বস্ত লোক মারফত অর্থাৎ আপনারই লোক যাহারা দূরে দূরে ছড়াইয়া ছদ্মবেশে ও বিভিন্ন কৌশলে সংবাদ সংগ্রহ করিতেছে, তাহাদেরই মারফত খবর আসিল) যে, প্রায় ১৫ মাইল দূরে "চৌমুহনীর" একটি ডাক বাংলোতে বা স্কুল ঘরে, কি "গিতালদহের" বড়রাস্তার পাশে একটি আম. বাগানে তাঁবু ফেলিয়া জাপানীরা আজ রাত কাটাইবার উদ্যোগ করিতেছে।

এই খবর পাইবামাত্র সাইকেল বা ঘোড়া দিয়া গ্রামে গ্রামে দূত পাঠাইলেন। বিভিন্ন গেরিল্লাদলকে তাহারা নির্দিষ্ট সঙ্কেতধ্বনি করিয়া এক জায়গায় আনিয়া বা যে কোনও উপায়ে জানাইয়া দিল যে, নিজস্ব হাতিয়ার প্রভৃতি লইয়া কোনও নির্দিষ্ট মাঠে বা আমবাগানে কি পুকুর পাড়ে, আধ ঘণ্টার মধ্যে যেন হাজির হয়। এই হাজির হইবার জায়গাটিকে বলা যাক—মূল ঘাঁটী। এখানে আসিয়া জড় হইলে সব আলোচনা করিয়া ঝটপট ঠিক হইল—কতজন যাইবে। মনে করুন জাপানী যদি ১০০ জন হয় তো গেরিল্লারা হয়ত ১২০ জন যাইবে। কোন্ রাস্তা ধরিয়া যাইবে? লোকের দৃষ্টি এড়াইবার দরকার। বিভিন্ন ছোট ছোট দলে

ভাগ হইয়া বিভিন্ন পথ ও গ্রাম ধরিয়া ১২ মাইল দূরে এক নিভৃত জায়গায় (রাস্তার মোহানা বাদ দিয়া ইঁটখোলা বা পাটের বন, বিলের ধার বা আকের ক্ষেত, কলাবাগান বা জঙ্গলের মধ্যে পোড়ো বাড়ী কিংবা সুবিধা বুঝিলে একটি গ্রামের মধ্যে) একত্রিত হইতে হইবে—ধরুন রাত্রি ১২টায়—অর্থাৎ ৫ ঘণ্টা পরে। মুড়ি, গুড়, নারিকেল প্রভৃতি যাহা জুটিল আঁচলে বাঁধিয়া লওয়া হইল, রাস্তা চলিব ও খাইব—এত তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিবার সময় পাওয়া গেল না তাই। রাস্তায় বিড়ি খাওয়া, দেশালাই বা টর্চ জ্বালানো, কাশিয়া শব্দ করা, হাসা, গল্প বা গান করা, কিংবা জোরে পা ফেলিয়া চলা নিষিদ্ধ। মাঝে পাঁচ দশ মিনিট করিয়া নিঃশব্দে জিরাইয়া লইতে পারি। চেনাশুনা লোকের বাড়ী জল চাহিয়া খাইলাম হয়ত। রাস্তা ও গ্রামের নাম মোটামুটি দলস্থ অনেকেরই চেনা আছে—সকলের না থাকিলেও প্রত্যেক দলের অন্ততঃ অর্দ্ধেক লোক সংবাদবাহী পেট্রলের (Reconnoitring Patrol) কাজ করিতে অভ্যস্ত —তাহারা পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে। আমরা এক একটি দল আমাদের নির্দিষ্ট নেতার অধীনে চলিয়াছি—আমরা বিভিন্ন গ্রামের স্ব স্ব গেরিল্লাদল হিসাবেই পৃথক রাস্তা ধরিয়া ২০ জন করিয়া অগ্রসর হইতেছি। দলের প্রত্যেক তিন চার গজ অন্তর [বেশী অন্ধকার হইলে সরু দড়ি বা কাপড়ের 'পাড়' বা গাছের শক্ত লতা ধরাধরি করিয়া লাইন ভাঙিয়া একটু ছড়াইয়া অথচ) যোগাযোগ রক্ষা করিয়া এমনভাবে চলিতেছি যাহাতে পরস্পর পরবর্তী কম্‌রেডকে দেখা যায়। মাঝে মাঝে থামিয়া পূর্ব-চিহ্নিত বড় বড় গাছ বা রাস্তার চৌমাথা, কি কোনও গ্রামের বিশিষ্ট বাড়ী-ঘর বা ইঁদারা কি টিউবওয়েল অথবা হাট কিম্বা পুকুর, মস্‌জিদ্‌-মন্দির, কাছারি ঘর কি পাঠশালা ঠাহর করিয়া দিক ঠিক করিয়া লইতেছি। আকাশের নক্ষত্র বা বাতাসের গতি লক্ষ্য করিয়া অনেকেই দিক বুঝিতে পারিবে না, কেন না অনেকেই এ বিষয়ে অভ্যস্ত নয়। আবার চলিতেছি। ঘণ্টায় দুই হইতে তিন মাইল বেগে চলিব ধরিয়া রাখা যায়—যদি নেহাৎ এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো ও অজানা রাস্তা না হয়। কোথায় কোথায় আসিয়া ৫।১০ মিনিট জিরাইয়া লইব তাহা আগে

হইতেই ঠিক করা আছে। জিরাইবার সময়ে শুইতে পারি কিন্তু কথা বলিব না বা দল ছাড়িব না—এদিক ওদিক পায়চারী করিলে শৃঙ্খলা নষ্ট হইতে পারে বা দলভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। যতই আমরা ১২ মাইলের শেষাশেষি আসিতেছি ততই নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ও আত্মগোপন করিয়া চলিতেছি; মাঝে মাঝে থামিয়া কাণ পাতিয়া কি যেন শুনিয়া লইতেছি। যদি বিমানের শব্দ পাওয়া যায়—তৎক্ষণাৎ নিমেষে দড়ি ছাড়িয়া পাশের বনজঙ্গলে বা গাছ কি খানা ডোবার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া শুইয়া পড়িব; কেন না, শত্রু বিমানচালক মাঝে মাঝে আচম্বিতে আলোক রশ্মি (flare) নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্যবস্তু দেখিয়া লয়। এমনও তো হইতে পারে যে, আমাদের নৈশ অভিযানের খবর পঞ্চমবাহিনীর লোকে জানিয়া বেতারে শত্রুর বিমান ঘাঁটিতে জানাইয়া মোটামুটি আমাদের চলিবার রাস্তার সন্ধান দিয়াছে।

এইবার আমরা জমায়েত কেন্দ্রে (Assembly Position) প্রায় আসিয়া পড়িয়াছি—আর ৫০০।৬০০ গজ যাইলেই হয়। দুইজন স্কাউট পাঠাইয়া দেওয়া গেল—খোঁজ লইয়া আসুক সেখানের ভাবগতিক কি? স্কাউটদের আধ ঘণ্টা সময় দেওয়া হইল—ইহার বেশী সময় চলিয়া গেলে ধরিয়া লওয়া হইবে তাহারা নিশ্চয় শত্রুর বা গুপ্তচরের কবলে পড়িয়াছে। স্কাউট্ দুটি আত্মগোপন করিয়া হামাগুড়ি দিয়া, হাঁটিয়া, কখনো গাছে উঠিয়া লক্ষ্য করিতে করিতে অতি সন্তর্পণে কেন্দ্রটির কোল ঘেঁসিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু ওখানে ও কাহারা? এই দিকেই যেন আসিতেছে—নির্ঘাত শত্রুর গুপ্তচর—ব্যাটারা স্কাউটদের দেখিতে পাইয়াছে। চোখের নিমেষে পাঁচ সাতজন নিঃশব্দে ধাইয়া আসিল যমের মত। হাতে উদ্যত কৃপাণ! স্কাউট্দুটির বুক দুরুদুরু করিতেছে। লোকগুলি দৃঢ়কণ্ঠে ফিস্‌ফিস্ করিয়া শুধাইল "কে?" উত্তর হইল "খেজুর গাছ"। লোকগুলি লাফাইয়া উঠিল—"আরে তোমরা! এখুনি মেরেছিলাম আর কি!" স্কাউট দুটি মৃত্যুর দুয়ার হইতে ফিরিয়াছে আজ—যদি নিজেদের লোক না হইত? কিন্তু 'দেওয়ান বাজারের' কমরেডরা এতো তাড়াতাড়ি জমায়েত কেন্দ্রে পৌঁছিল কি করিয়া? "আমরা ভাই, কোণাকুণি

পাড়ি জমাইয়াছিলাম। সে যাক্; ভাগ্যে আমরা হঠাৎ না মারিয়া password এর (সঙ্কেত বাক্যের) জন্ম অপেক্ষা করিয়াছিলাম, তাই।" "কিন্তু চুপ্! জোরে কথা বলিতেছ।"

এদিকে স্কাউট দুটির ফিরিতে দেরী হইতেছে দেখিয়া দলের অনেকে মনে করিল তাহারা নিশ্চয় শত্রুর হাতে পড়িয়া বন্দী হইয়াছে বা মরিয়াছে। মন খারাপ হইয়া গেল! কেবল প্লেটুন কম্যাণ্ডার আশ্বাস দিতে লাগিলেন—"আর একটু পরেই স্কাউট্ একজন ফিরিল, তাহাকে দেখিয়াই আনন্দে, উত্তেজনায় অধীর হইয়া প্রায় সকলেই এক সঙ্গে শুধাইল—"কি?—কি?—কি ব্যাপার? দেরী কেন? হানিফ্ কৈ?" স্কাউট ধীরে ধীরে সব বলিল। হানিফ্ জমায়েত কেন্দ্রে অপর দলের সঙ্গে আছে। "চলো"—হুকুম হইল।

নৈশ অভিযানের দ্বিতীয় পর্ব:—সবদলগুলি আসিয়া পৌঁছিতে রাত্রি সাড়ে বারোটারও বেশী হইল। ১টা ১০ মিনিট পর্যন্ত জিরানো হইল এবং আবার অগ্রসর হইবার প্ল্যান ঠিক করা হইল। এইবার প্রত্যেক দলের ২০ জনকে এক একটি প্লেটুনে সাজাইয়া ৬ জন লোক করিয়া এক একটি সেকশান্ গঠন করা হইল। প্রত্যেক সেকশানে অন্ততঃ অর্ধেক লোক স্কাউটগিরি করিতে ওস্তাদ এবং প্রত্যেক সেকশানে এমন দু চার জন গেরিল্লা আছে যাহারা নিজেরাই নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারে। প্লেটুন কম্যাণ্ডার ও দ্বিতীয় নায়ক ঠিক করা হইল। সমস্ত প্লেটুনের ক্রটি-বিচ্যুতি, শৃঙ্খলা ও কার্যকুশলতার জন্ম তিনি (এবং তারপর দ্বিতীয় নায়ক) দায়ী। ইঁহাদের ক্রমিক নেতৃত্বে সমস্ত প্লেটুনটি পরিচালিত হইবে। প্রত্যেক যোদ্ধা নায়কের হুকুম বিনা তর্কে, বিনা দ্বিধায় মানিয়া লইবে; তবে যখন প্ল্যান স্থির করা হইবে অথবা নায়ক নিজে যখন পরামর্শ চাহিবেন তখন সকলেই সরাসরি স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করিবে। আর যদি দেখা যায় তিনি দলকে বিপথগামী করিতেছেন বা ইচ্ছা করিয়াই মূল সমরনায়কের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছেন, তবে অবশ্যই তাঁহার আদেশ অমান্য করিবার অধিকার প্রত্যেক গেরিল্লার থাকিবে। নতুবা নয়।

প্রত্যেক সেক্‌শানের একজন সেক্‌শান কম্যাণ্ডার বা অধিপতি তাঁহার দলের অনুরূপ দায়িত্ব লইলেন।

এইরূপ যুদ্ধের কায়দায় সাজাইয়া (Battle formation) এইবার জমায়েত কেন্দ্র হইতে সমাবেশ কেন্দ্রে উপস্থিত হইবে। রাত্রি দেড়টা বাজিল। প্রত্যেককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সরলভাষায় সহজ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইল :—

(i) সমাবেশ কেন্দ্র কতো দূরে—অর্থাৎ আড়াই মাইল দূরে একটি অন্ধকার নিঃসঙ্গ জায়গায় ; উক্ত কেন্দ্র হইতে কোন্ লক্ষ্যবস্তু আক্রমণ করিতে হইবে কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়া ঐ কেন্দ্রে হইতে অগ্রসর হইতে হইবে এবং তারপর কোন্ কোন্ দিক হইতে লক্ষ্যবস্তুকে আক্রমণ করা হইবে।

(ii) সমাবেশ কেন্দ্রে পৌছিয়া কিভাবে দলে দলে ভাগ হইয়া প্লেটুন হইতে প্লেটুনকে, সেক্‌শান হইতে সেক্‌শানকে এবং প্রত্যেক কমরেডকে পরস্পর তফাতে রাখিয়া ছড়াইয়া অগ্রসর হইব।

(iii) আক্রমণকালে কাহার কি কর্তব্য হইবে—অর্থাৎ কে কোন কাজটি করিবে।

(iv) যদি আমরা আসিয়াছি বুঝিয়া শত্রু সতর্ক হইয়া যায়, তবে কি করিতে হইবে।

(v) বন্দুক থাকিলে তাহা কখন ভর্তি করিয়া লইতে হইবে (অর্থাৎ আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে) এবং কখন কিভাবে গুলি ছুঁড়িতে হইবে।

(vi) অন্ধকারে হাতাহাতি যুদ্ধের সময় সড়কী, বর্শা, কোঁচ, তলোয়ার, ছোরা, কৃপাণ, কুকরী, রামদাও, খাঁড়া, সঙ্গীন ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু এগুলি যেন অন্ধকারে উজ্জ্বল না দেখায়।

(vii) প্রত্যেকে নিঃশব্দে চলিবে—বিড়ি-সিগারেট খাওয়া, আগুন জ্বালানো, কথা বলা বা শব্দ করা, সঙ্গের লট্‌বহর ঝন্‌ঝন্ করা একেবারে নিষিদ্ধ।

(viii) শত্রু টর্চ জালিয়া মাঝে মাঝে পর্যবেক্ষণ করিতে থাকিলে শুইয়া বুকে হাঁটিয়া আড়াল হইতে আড়ালে আস্তে আস্তে অগ্রসর হওয়া দরকার।

(ix) ঘড়ি থাকিলে পরস্পরের সময় মিলাইয়া লওয়া এবং আক্রমণের ঠিক সময় কত—কত ঘণ্টা কত মিনিট কত সেকেণ্ড তাহা বলিতে হইবে। সমাবেশ কেন্দ্র হইতে আগাইয়া আক্রমণ চালাইবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কতক্ষণ লাগিবে—ইত্যাদি বিষয় পরিষ্কার বুঝাইয়া বলা দরকার। গেরিল্লাদের বেশীক্ষেত্রেই ঘড়ি থাকিবেনা; তাই পূর্ব নির্দিষ্ট কোনো সঙ্কেতধ্বনির (যেমন পশু বা পাখীর ডাক) সাহায্যে আক্রমণের সময় কি জানাইতে হইবে। অথবা ঠিক থাকিতে পারে যে একটি নির্দিষ্ট সেকশান আড়াল হইতে আক্রমণের ভান করিয়া বা বনজঙ্গল নাড়া দিয়া শব্দ করিয়া শত্রুর দৃষ্টি ভুল-পথে আকৃষ্ট করিবে এবং সেই সুযোগে আসল আক্রমণকারীরা অপর দিক হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। কিন্তু শব্দ করিলে নিদ্রালু বা অসতর্ক প্রহরীকে সজাগ করিয়া দেওয়া হয়; তাহা ছাড়া, এরূপ আশা করা অসঙ্গত হইবে যে, ভাঁওতায় ভুলিয়া সবক্ষেত্রেই শত্রু নিজস্ব শক্তি ও মনোযোগ সবখানি এক-ই অভিমুখে বা ভুলপথে নিয়োগ বা নিবদ্ধ করিবে। আর এক উপায় হইতেছে—একটি বিশিষ্ট সেক্শান কেবল প্রহরী মারিবার ভার লইবে। আর সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলে তীব্রবেগে শিবিরের ভিতর ঢুকিয়া আক্রমণ করিবে। হাতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকিলে কিভাবে আক্রমণ করা উচিত এবং কি বিভিন্ন উপায়ে প্রহরী হত্যা করা যাইতে পারে—ইত্যাদি বিষয় অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে ["গেরিল্লা যুদ্ধের নকল মহড়া" পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

যাক্। জমায়েত কেন্দ্র হইতে দেড়টায় বাহির হওয়া গেল। ঠিক হইল দেড় ঘণ্টায় আড়াই মাইল হাঁটিয়া রাত্রি তিনটায় সমাবেশ কেন্দ্রে পৌঁছিব। এবারেও গ্রামের লোকের, পঞ্চম বাহিনীর বা শত্রুর প্রেরিত গুপ্তচরের চোখে ধূলা দিবার জন্য আগেরই মত দশ ভাগ করিয়া পাঁচ দিকে পাঁচটি প্লেটুনকে আগাইতে বলা হইল। প্লেটুনে সাজাইবার উদ্দেশ্য হইল এবারে শুধু দলে ভাগ হওয়া নয়—প্রত্যেক দলকে প্লেটুন হিসাবে সেকশানে ভাগ করিয়া ছড়াইয়া অগ্রসর হওয়া; ইহাতে নিঃশব্দে গা ঢাকা দিয়া আগাইবার সুবিধা হইবে এবং ধরা পড়িলে বা শত্রু গুলীগোলা ছুঁড়িতে থাকিলে গেরিল্লারা বন্দী বা নিহত হইবে কম। তবে প্রত্যেক

যোদ্ধা ও প্রত্যেক সেকশানের মধ্যে পরস্পর যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, সমগ্র প্লেটুনকে আগাইয়া লইয়া যাওয়ায় দায়িত্ব সেই প্লেটুনেরই পেট্রল বাহিনীর। টহলদারী রক্ষী-পেট্রলের অগ্রসর হইবার কায়দায় তাহারা প্লেটুনকে পরিচালিত করিবে ["স্কাউটিং ও পেট্রলিং" পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। সকলেই প্রয়োজন শেষে বুকে হাঁটিয়া, হামাগুড়ি দিয়া এক আড়াল হইতে আর এক আড়ালে আত্মগোপন করিতে করিতে থামিয়া থামিয়া অগ্রসর হইবে। পূর্ব হইতে চলিবার পথে থামিবার, পাশে সরিবার, শুইয়া পড়িবার, বুকে হাঁটিবার, উঠিবার, আক্রমণ করিবার এবং আরও অনুরূপ কার্যের সিগ্ন্যাল বা সঙ্কেত ঠিক করা থাকিবে। আত্ম-গোপনের জন্য প্রত্যেকের হাতে কিছু কিছু তৃণগুল্ম বা ঝোপ্ঝাপ্ কি গাছপালা থাকিবে এবং মাথায় লতাপাতা বাধা থাকিবে, আর এই লতাপাতা ঝুলিয়া মুখ ঢাকিয়া দিবে—দৃষ্টি অব্যাহত রাখিয়া।

নৈশ অভিযানের তৃতীয় পর্বঃ—সমাবেশ কেন্দ্রে পৌঁছিয়া রাত্রি তিনটা হইতে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত সকলে একটু বিশ্রাম করিয়া তাজা হইয়া লইতেছে। কোম্পানী কম্যাণ্ডার অর্থাৎ ১২০ জন সৈন্য বাহিনীর খোদ কর্তা কিছু বলিবার দরকার হইলে সকলকে ডাকিয়া বক্তব্য বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা কখনই করিতেছে না—ইহাতে গণ্ডগোল হইবে। প্লেটুন কম্যাণ্ডারদের আদেশ-নির্দেশ তিনি দিতেছেন—তাঁহারা আবার সেকশান কম্যাণ্ডারদের বলিতেছেন এবং সেকশান কম্যাণ্ডাররা তাঁহাদের নিজ সেকশানের সৈন্যদের অনুরূপ আদেশ-নির্দেশ দিতেছেন। সকলেই উত্তেজনায় ও উৎকণ্ঠায় অধীর। দিনে মাত্র একটু ঘুম হইয়াছিল—কিন্তু এখন তো বিন্দুমাত্রও ক্লান্তি বা নিদ্রালুভাব নাই। এবার প্রত্যেক প্লেটুন ও সেকশান-কম্যাণ্ডার নিজের দলগুলি দেখিয়া, এবং কোম্পানী কম্যাণ্ডারের নির্দেশগুলি আর একবার ঝালাইয়া লইতেছেন ও পথঘাটের খুঁটিনাটি হিসাব মনে তোলাপাড়া করিতেছেন।

শত্রুর শিবির আর ৫০০।৬০০ গজ দূরে। কিন্তু হইলে কি হয়,—সামনে ঝোপ ঝাপ্, খানা-গর্ত, গাছপালা ও ছায়া জায়গা এখনও রহিয়াছে—চাঁদ থাকিলে

অবশ্যই এগুলিকে আশ্রয় করিয়া চলিব। ['আড়াল লইবার কায়দা" দ্রষ্টব্য] রাত্রি আঁধার হইলেও আড়ালে আড়ালে একে একে অগ্রসর হওয়া একান্ত দরকার, কেননা শত্রুর টর্চ জ্বালাইবার ভয় তো আছেই, তাহা ছাড়া সে আলোক বাজী ফুটাইয়া কখন যে চারিদিক আলোকিত করিয়া দিবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। অবশ্য আকাশের সীমারেখাকে (sky line) বা চাঁদকে পিছনে না রাখিয়া হাঁটিলে—অর্থাৎ ঠিকমত আড়ালে আত্মগোপন করিয়া আগাইতে থাকিলে উজ্জ্বল চাঁদনী রাতেও মাত্র একশো গজ নিকটে থাকিলেও শত্রু আপনাকে সাধারণতঃ দেখিতে পাইবে না। তবে গেরিল্লা-উৎপাত কিছুদিন টের পাইলেই জাপানীরা শুধু যে আলো ঘুরাইয়া জ্বালাইয়া চারিদিক লক্ষ্য করিবে তাহাই নহে; মাঝে মাঝে "বায়নোকিউলার" বা ছোটখাটো দূরবীক্ষণ দিয়া গেরিল্লার খোঁজ করিবে। কিন্তু অন্ধকারে (এমন কি জ্যোৎস্নাতেও) সারা রাত্রি ধরিয়া অবিরত এরূপ করা সম্ভব নয়। গেরিল্লাদের ইহাই সান্ত্বনার কথা।

যত নিকটে আসিতেছি ততই বুকে হাঁটিয়া আগাইতেছি। [নিঃশব্দে চলিবার কায়দা" দ্রষ্টব্য]। স্কুল ঘরে শত্রু ঘাঁটি করিয়াছে। বাড়ীটির কোল পর্যন্ত যদি ঝোপের বা গাছপালার আড়াল পাইতাম, তো, একেবারে ঘরের কানাচে গিয়া উপস্থিত হওয়া যাইত। কিন্তু স্কুলটির পারিপাট্য আছে! আগাছা জন্মাইতে দেওয়া হয় নাই। একশো গজের মধ্যে ঝোপ জঙ্গল, তৃণগুল্ম নাই বলিলেই চলে। স্কুলের হেড্ মাষ্টার ভদ্রলোক কি করিয়াই বা জানিবেন যে, গেরিল্লা-লড়াই তাঁরই স্কুলে একদিন হইবে! কিন্তু সে যাক। এমন অবস্থায় কি করিয়া প্রহরী মারা যায় এবং কি কৌশলে শত্রুদলকে সত্যিকারের আঘাত হানা যায়! আজ যদি চাঁদনী রাত থাকিত তবে তো সমূহ অসুবিধার কথা। সে ক্ষেত্রে, নৈশ আক্রমণের নিয়ম অনুসারে, চাঁদ ডুবিয়া না যাওয়া পর্যন্ত স্থির হইয়া আমাদের অপেক্ষা করিতে হইত। কিন্তু কপাল ভাল, আজ রাত্রে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার।

দেখা যাক্ প্রহরীগুলা কি করিতেছে। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে—দুই দরজায় দুইজন করিয়া চারজন প্রহরী—এইরূপ প্রায় তিন চারটি বড় ঘরের সামনে

পাহারা রহিয়াছে। প্রহরীদের কেহ চুপটি বসিয়া ঝিমাইতেছে—কোনোটি "আরামে" (stand at ease) দাঁড়াইয়া আছে। সুযোগ মন্দ নয়। নির্দিষ্ট সময়ে দ্রুত বুকে হাঁটিয়া প্রত্যেক ঘরের দিকে বিভিন্ন আড়াল হইতে মোট চারজন করিয়া গেরিল্লা অগ্রসর হইল—প্রহরীর পিছন দিক লক্ষ্য করিয়া চলিয়া যেমনটি হাতের কাছে পাওয়া অমনি এক কোপে দুই খান! নিমেষের মধ্যে চারিদিক হইতে গেরিল্লারা ছুটিয়া আসিয়া দুর্বার গতিতে ঘুমন্ত কি আধ-ঘুমন্ত শত্রু বাহিনীর উপর পড়িল—কুড়ুল, টাঙ্গী, রামদাও—যে যাহা লইয়া আসিয়াছিল তাই দিয়া শুধু ঝপাঝপ বলিদান! কিন্তু তাহারই মধ্যে লক্ষ্যবস্তু হইবে শত্রুর হাতিয়ার। অবশ্য হাতিয়ার লইতে হইলে শত্রুকে বেশ খানিকটা কায়দায় ফেলিয়া ছত্রভঙ্গ না করিয়া দিলে হইবে না। মারামারির মোহড়ায় অনেক শত্রু সৈন্যই যমালয়ে যাইবে এবং অনেকে পলাইয়া নিকটস্থ বনের মধ্যে লুকাইবার চেষ্টা করিবে। অবশ্য গেরিল্লারা অক্ষত থাকিবে মনে করা ইচ্ছাকৃত কল্পনা (wishful thingking) ছাড়া কিছুই নয়। তবে ইহাও কল্পনা করা যায় না যে, শত্রু সৈন্যরা মুহূর্তে উঠিয়া গুলি চালাইয়া গেরিল্লাদলকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে। কেন না, তাহারা গুলির নিকটতম পাল্লাও পাইবে না। পিস্তল ছুঁড়িবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু একেবারে গায়ের উপর গিয়া পড়িলে তাহাও অসম্ভব। বাকী রহিল, সঙ্গীন, ছোরা, বন্দুক বা রিভলভারের বাঁট ইত্যাদি। তাহা হইলে গেরিল্লাদের আগ্নেয়াস্ত্র নাই ধরিয়া লইলে প্রায় সমানে সমানে, অর্থাৎ দুইপক্ষেই হাতিয়ার লইয়া লড়াই চলিবে দেখা যাইতেছে। অতর্কিতে আক্রমণ করিতে পারিলে ঘটেও তাই। কিন্তু সেক্ষেত্রে গেরিল্লাদের সুবিধা বেশী—তাহারা আগে আক্রমণ করিয়া অধিক কাজ গুছাইয়াছে (well begun, half done); তাহারা সময় না দিয়া হঠাৎ আক্রমণ করিয়া শত্রুকে ভীত ও বিহ্বল করিয়া দিয়াছে। এত লোক একসঙ্গে দেখিয়া ইহাদের মধ্যে যাহারা পুরাণো ঝানু জাপানী, তাহারা মাঞ্চুরিয়া ও চীনের দুর্ধর্ষ গেরিল্লাদের কথা চকিতে স্মরণ করিবে—চাও-তুং-এর ভীতিপূর্ণ স্মৃতি তাহাদের গায়ে জ্বর আনিয়া দিবে। মনে ভাবিবে—"গেরিল্লা শালকরা এমন কায়দাও

করিল! বাংলায় এমন ঘটিবে কে জানিত? আজকের ইহারা সংখ্যায় বুঝিবা পাঁচ-সাতশোই হইবে!”

এইরূপে ভয়-বিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া শত্রুসৈন্যরা সকলে মিলিয়া সমগ্র-ভাবে বুদ্ধি সংগ্রহ করিতে অন্ততঃ দশ-পনের সেকেণ্ড বা ইহারও বেশী সময় লইবে। ইতিমধ্যে গেরিল্লারা অনেক কাজ হাঁসিল করিয়াছে। দুই তিন মিনিট বা পাঁচ মিনিট ধরিয়া হাতাহাতি মারামারি করিয়া আর মিনিট দুই খানেক রাইফেল, হাতবোমা খুঁজিয়া লইয়া পাড়ি দিতে হইবে। যে গেরিল্লা কোনো জাপানীকে সাপুটিয়া ধরিতে গিয়াছে, সে এতক্ষণে মরিয়াছে—কেন না প্রত্যেক জাপানীই ভাল জুজুৎসুর প্যাঁচ জানে।

মনে রাখিতে হইবে, অন্ধকারে নিজেরা নিজেদের লোক মারিবার সমধিক সম্ভাবনা আছে। সেইজন্য, নিয়ম হইল, গুলী করিবার সময় বা যে-কোনো রকম আক্রমণের সময় আমরা কখনই শত্রুকে বৃত্তাকারে ঘিরিয়া বা একেবারে উল্টামুখ হইতে আক্রমণ করিব না। আর যখন আগ্নেয়াস্ত্রের কথা উঠিতেছে না, তখন দেশী হাতিয়ার লইয়াই আক্রমণ চালাইতে হইবে—সেক্ষেত্রে কতকগুলি বাংলা কথা উচ্চারণ করিতে করিতে মারিতে থাকিলে নিজেদের লোক চিনিবার খানিকটা সুরাহা হইতে পারে—যেমন, “মার্”, “মার্” “গ্যালো”, “কোথায়”, “এইযে” ইত্যাদি। ইহাতে শত্রুরও সুবিধা হইল কিন্তু। সে এতোক্ষণ অন্ধকারে লুটোপুটির মধ্যে বেঁটে-বাঙ্গালী ও খ্যাঁদা-জাপানীর পার্থক্য বুঝিতে পারিতেছিল না—শব্দ শুনিয়া পারিবে।

প্রথমেই ঘরে ঢুকিয়া গেরিল্লারা একই জায়গাই বা বিন্দুতে জমা থাকিয়া শত্রুকে মারিতে সুরু করিবে না; লম্বা সরাসরি সারা ঘরটি ধরিয়া ছুটিয়া যাইয়া শত্রু যেমন-যেমন শুইয়া আছে তেম্‌নি তেম্‌নি লাইনে দাঁড়াইয়া (শত্রুর মাথার দিকে বা পিছনে দাঁড়াইয়া) তাহাকে আঘাত করিতে হইবে। এ জন্য একই দরজা দিয়া গেরিলারা সকলে ঘরে ঢুকিবে না—বিভিন্ন দরজা জানালা টপকাইয়া ঢুকিতে হইবে। আর, শত্রুকে বিহ্বল ও ভীত করিয়া দিবার জন্য কেরোসিন ও পেট্রল

ভিজানো ন্যাক্‌ড়া বা কাপড়ে আগুণ ধরাইয়া ঘরের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ছুড়িয়া ফেলিতে হইবে—তাহাতে আলোকে শত্রুর হাতিয়ার সংগ্রহের সুবিধাও যেমন হইবে, তেমনি জাপানী এবং বাঙ্গালীর চেহারার পার্থক্যও মালুম হইবে।

দশ পনর জন গেরিল্লার কাজ হইবে খালি আগুণ ধরানো—শত্রুর খাদ্যসম্ভারে, আগ্নেয়াস্ত্রের স্তূপে, পেট্রলের আধারে; জ্বলন্ত পেট্রলের উপর মোটর সাইকেল প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে হইবে। ট্যাঙ্ক বা লরীতে পেট্রল দিয়া আগুন ধরাইতে হইবে। শৃঙ্খলার সঙ্গে প্রত্যেক কাজ করা দরকার। কে কোন্ কাজ করিবে মোটামুটি ঠিক থাকা প্রয়োজন, নতুবা অন্ধকারে ঢেলা-মারার মত হইবে। ধরুণ, দশজন যাহারা আগুন ধরাইবে—তাদের সঙ্গে আর অন্ততঃ দশ জন রক্ষী হিসাবে কাজ করিবে। মনে করুন রাইফেলগুলি শত্রুসৈন্যেরা শুইবার সময় পাশে রাখিয়া শুইয়াছে—সেগুলি হস্তগত করিতে হইলে শত্রুকে কেবল ঠেঙ্গাইবার তালে ব্যস্ত থাকিলেই হইবে না। খানিকটা হৈ-হৈ করিয়া চেঁচাইয়া এবং খানিকটা শত্রুকে জখম করিয়া আসার সার্থকতা প্রায় কিছুই নাই। তাছাড়া প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেক দরজায় ঝট্ করিয়া চার পাঁচজন প্রহরী কৃপাণ হস্তে দাঁড় করাইয়া না দিলে এক ঘরের শত্রু সেই ঘরের গেরিল্লাদের কাবু করিয়া বা হাত এড়াইয়া অন্য ঘরে যাইয়া তাহাদের নিজ সৈন্যদের সাহায্য করিবে। তাহা ব্যর্থ করিতে হইলে দরজায় প্রহরী রাখা দরকার। এসব জিনিষ একে একে হুকুম দিয়া করাইবার নয়—আক্রমণের পূর্বেই (জমায়েৎ-কেন্দ্রে) ঠিক করিতে হইবে কোন্ প্লেটুনের কোন্ সেকশান আক্রমণের সময়ে কি কাজ করিবে। মনে রাখিবেন, কয়েক জনের বিশেষ কাজ হইবে রেডিও যন্ত্র, তাহার ব্যাটরী, এবং হাত বোমা, বুলেট সহ রাইফেল ও লাইট মেসিন গান, টমিগান প্রভৃতি লুটিয়া আনা।

তারপর ফিরিয়া আসিবার পালা। যে যেমন পারিবে, গুড়ি মারিয়া বা দ্রুত বুকে হাঁটিয়া পলাইয়া নিকটস্থ জঙ্গলে বিলীন হইয়া ক্ষিপ্র গতিতে দৌড় দিবে; কিন্তু যদি ততক্ষণে শত্রু গুলিগোলা ছুঁড়িতে শুরু করে তো, আড়ালে আড়ালে বুকে হাঁটিয়া পিছু হইতে হইবে। গেরিল্লাদের একটি মস্ত সুবিধা এই যে, সে এলাকার

রাস্তাঘাট সেই চেনে—শত্রু তাহার শতাংশের একাংশও চেনে না। কাজেই সে যে ছুটিয়া আসিয়া আক্রমণ করিবে—রাত্রির অন্ধকারে তাহা অসম্ভব। রাত ৪টার মধ্যে কাজ শেষ করিয়া ২।৩ মাইল দৌড়িয়া পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া জড় হইতে হইবে। কিন্তু ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, তখনও তাহারা একেবারে বিপদমুক্ত নয়। কেন না, যেই সকাল হইবে পঞ্চমবাহিনী জানিতে তো পারিবেই, এমন কি ততক্ষণে বেতারে হয়ত নিকটস্থ জাপানী বিমান ঘাঁটিতে গেরিল্লাদের কীর্তিকাহিনী জানানো হইয়াছে এবং শত্রুর তল্লাসী ও বোমারু বিমান চারিধারে গেরিল্লাদলকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। আরও দু-তিন মাইল গাছের ছায়ায় ছায়ায় আগাইয়া কোন গ্রামে (আজও যেখানে প্রচার কার্য ভাল হয় নাই সেখানে) পৌছিয়া আম বা বাঁশ বাগানে গাছের ছায়ায় আত্মগোপন করিয়া সকলে মিলিয়া সভা করুন এবং গেরিল্লাদের উদ্দেশ্য সহজ ভাষায় গ্রামবাসীদের বুঝাইয়া দিন। গেরিল্লাদের বীরত্বের পরিচয় পাইয়া অনেকেই দলে আসিবে এবং পঞ্চম বাহিনী ভয় পাইবে ও "এক ঘরে" হইবে। রক্তরঞ্জিত শরীর ও রাইফেল ধৃত হাতের বজ্র মুষ্টি দেখিয়া লোকের ভীতি অলসতা শৈথিল্য দূরে যাইবে।

উপরের ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া ভুল ত্রুটির সমালোচনা করিতে হইবে। আর একটু বুদ্ধি খাটাইলে নিজের কতটা ক্ষতি কমাইয়া শত্রুকে আরও কতখানি বিপর্যস্ত করা যাইত তাহার আলোচনা করা দরকার। এখন হয়ত বুঝা যাইতেছে ১২০ জনের স্থলে ১৫০ জন লইলে ভাল হইত। ধরুণ, ৭৫ বা ৮০ জন শুধু শত্রুকে হত্যা করিবে; ১০ জন আগুন জ্বালাইবে, আর ১০ জন তাহাদের এক একটির রক্ষী হিসাবে থাকিবে; ১৫।২০ জন দরজায় ঢুকিবার ও বাহির হইবার পথের নিকটে দাঁড়াইয়া শত্রুকে মারিবে এবং পথও আগ্‌লাইবে। আর ৩০।৩৫ জন খালি রাইফেল, টমিগান, হাতবোমা, রেডিও প্রভৃতি যোগাড় করিবে। ইহারা অর্থ এ নয় যে, যাহারা হাতাহাতি করিবে (অর্থাৎ ৭৫।৮০ জন) তাঁহারা প্রত্যেকে অন্ততঃ একটি করিয়া ও হাতিয়ার সংগ্রহ করিবে না।

স্কাউটিং (Scouting) ও পেট্রলিং (Patrolling)

স্কাউটিং মানে দৌত্যগিরি। স্কাউট মানে দূত বা চর বা গুপ্তচর।

পেট্রলিং মানে টহলদারী বা রক্ষীগিরি। পেট্রল মানে টহলদার বা পাহারাদার। আবার পেট্রল বলিতে পেট্রল বাহিনীও বুঝাইয়া থাকে। কার্যে নিযুক্ত পেট্রল বাহিনীর যে লোককে আগে ভাগে পাঠাইয়া দৌত্যকার্যে বা খোঁজ খবর লইবার কাজে নিযুক্ত করা হয় তাহাকেও স্কাউট বলে। অর্থাৎ স্কাউট হইল পাহারাদার দিগের অগ্রদূত। কিন্তু পেট্রল বাহিনীর কথা ছাড়িয়া দিলে, স্কাউট বলিতে যে কোন চতুর গেরিল্লা—কৌশলে যে সংবাদ সংগ্রহ করিতে ওস্তাদ তাহাকেই বুঝাইবে।

প্রত্যেক গেরিল্লা প্লেটুনে (১ প্লেটুন—৩ সেকসান ; ১ সেকসান—১০ হইতে ২০ জন গেরিল্লা) পনের হইতে বিশজন যেন চৌকিদারী বা দূতগিরির কার্যে বিশেষ অভিজ্ঞ হয়। তবে প্রত্যেক গেরিল্লাই অল্পবিস্তর দৌত্যকার্য শিখিবে।

(১) গেরিল্লাদল যে নগর বা গ্রামে অবস্থান করিবে বা আশ্রয় লইবে, বা দল গঠনের জন্য প্রচার চালাইবে, সে গ্রাম বা নগরে প্রথম হইতেই চৌকী বা পেট্রল বসাইবে। এইরূপ পাহারা দুই ভাগে ভাগ করা হউক :—(অ) গ্রামে ঢুকিবার রাস্তার মোড়ে মোড়ে এবং তা ছাড়া গ্রামের সম্মুখে (front), পিছনে (rear) ও পার্শ্বদেশে flanks), রাস্তা থাকুক চাই না থাকুক, পাহারা বসাইবে। (আ) গ্রামের ভিতরে পঞ্চম বাহিনী ও অত্যাচারী ধনীলোক, জমীদার ও মহাজনের উপর গুপ্তভাবে পাহারা বসাইবে। জমীদারের পেয়ারের প্রজা বা খাতকদের উপরও নজর রাখ। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়া ইহাদিগকে দলে টানিতে হইবে। ইহা ছাড়া স্থানীয় খুঁটি নাটি খোঁজ খবর লইবার জন্য স্কাউট্ বা চর নিযুক্ত করিবে। ইহাদের নাম গুপ্ত গেরিল্লা। এইরূপ আটঘাট না বাঁধিলে কি সমূহ বিপদ হইতে পারে তাহা চীনের গেরিল্লা বাহিনীর অভিজ্ঞতা হইতে আমরা শিক্ষা করি। য়ুজান গ্রামে চাষীরা গেরিল্লাদের অভ্যর্থনা জানাইল। কিন্তু গ্রামের জমীদারের মনে আশঙ্কা হইল যে হয়ত উহারা চাষীদের বিদ্রোহী করিতে চায়। আক্রোশ ভরে সে এই দলের খবর

জাপানীদের জানাইয়া দিল। গেরিলা দল যখন প্রথম এখানে আশ্রয় লয়, তখন তাহারা গ্রামের প্রবেশ পথে পাহারা বসাইয়াছিল। হঠাৎ মুষল ধারে বৃষ্টি নামিয়াছে। অনর্থক ভিজিয়া অসুখ করিয়া লাভ নাই মনে করিয়া তাহারা আর পাহারা রাখিল না। জমীদার যে বিপক্ষকে সব খবর জানাইয়া দিয়াছে তাহা জানা নাই। শেষ রাত্রে তাহারা ঘুমে বিভোর। এমন সময় ৫০ জন জাপানী তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিয়া হাত বোমা ও বুলেট বৃষ্টি আরম্ভ করিল। গুলির আওয়াজে জাগিয়া উঠিতে উঠিতে ৪ জন মারা গেল, ২ জন জখম হইল। ১ জন বাহিরে ছিল, শত্রুরা তাহাকে ছোরা মারিল এবং শেষ করিল। পালাইবার পথ নাই। পিছনে মাটির দেওয়াল, গেরিলারা বুঝিল সে ধারে নিশ্চই জাপানীদের কোন পাহারা নাই। সামনে মাটির উপর শুইয়া কয়েকজন গুলী চালাইতে লাগিল; আর বাকী কয়জন সেই অবসরে দেওয়ালের ভিত খুঁড়িতে আরম্ভ করে। দেওয়ালের বনিয়াদ প্রায় আলগা হইয়া আসিয়াছে। আর দেরী করা সম্ভব নয়। সবাই দেওয়ালে কাঁধ বাধাইয়া ধাক্কা মারে। দেওয়ালও ধ্বসিয়া পড়ে। এইভাবে পলাইবার পথ মিলিল। পলাইবার আগে তাহারা সবাই ঠিক করিয়াছিল, যে যেদিক দিয়া পারে মিওকাঙসানে মিলিত হইবে (People's War by Epstein pp 62-63)।

(২) গ্রাম বা নগরগুলিতে গেরিলারা আসল পাকা ঘাঁটি সাধারণতঃ বসাইবে না। এগুলি গেরিলা আন্দোলনের ও গেরিলা সংগ্রহের ক্ষেত্ররূপে বা গেরিলাদের চলমান সামরিক ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করা যাইবে। আসল ঘাঁটি হয়ত হইবে সুদূর বনের অভ্যন্তরে বা দুর্গম পাহাড়ের মধ্যস্থলে। এই সকল আসল ঘাঁটার চারিদিকে মজবুত পাহারা বসাইতে হইবে। অবশ্য এই সকল পাকা ঘাঁটির অবস্থান-কেন্দ্রগুলিকে রোজই স্থানান্তরিত করিতে হইবে। এবং চারিদিকে অন্ততঃ ২৫।৩০ মাইল ব্যাসার্ধ লইয়া গ্রাম ও নগরগুলির সঙ্গে স্কাউট বা ভ্রাম্যমান বা তত্ত্বতল্লাসী টহলদার গেরিলাদের সাহায্যে যোগাযোগ রাখিতে হইবে।

এই তত্ত্বতল্লাসী পেট্রলের কথা আমরা পরে আলোচনা করিব। এখানে উপরোক্ত দুই প্রয়োজনে নিযুক্ত পাহারাদার গেরিলার নাম দেওয়া যাইতে পারে

Standing Patrol বা স্থিতিশীল বা চৌকীদার গেরিল্লা। ধরুন ইহার নাম ১ নং পেট্রল। এ ছাড়া আরও তিন রকমের পেট্রল আছে সে সব কথা পরে বলা যাইবে।

এই ১নং পেট্রলের কর্তব্য বা দায়িত্ব কি ?

যে যে পথে শত্রুরা আসিয়া অতর্কিতে হানা দিতে পারে সেইখানে চৌকীদার গেরিল্লা মোতায়েন করুন, আবার যে পথে শত্রু আসিবে না মনে হইতেছে সেখানেও কিছু না কিছু চৌকী বসাইবেন। সাধারণতঃ রাস্তার সংযোগ স্থান, পুল বা সাঁকো, নদীর মোহানা, যেখানে কম জল বশতঃ পারাপারের সুবিধা আছে অথবা যেখানে কোনও জঙ্গলে বা উঁচু-নীচু জমির আড়ালে আসিয়া লুকাইয়া থাকা যায়, সর্বোপরি যে জায়গাগুলি দখলে আনিলে সেই এলাকা আক্রমণ করা সুবিধাজনক—ইত্যাদি প্রকারের জায়গাগুলি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই সব জায়গায় চৌকীদার বসাইবেন। সাধারণতঃ আড়ালে গা ঢাকিয়া বসিয়া বসিয়া সুতীক্ষ্ম নজর রাখিতে হয় চারিদিকে ; গেরিল্লা পেট্রল এমন জায়গায় বসিয়া পাহারা দিবে বা নজর রাখিবে যেখান হইতে নিজে শত্রুর গতিবিধি দেখিতে পায় অথচ শত্রু তাহাকে দেখিতে পায় না। পল্লীগ্রামের উপকণ্ঠে লম্বা গাছ অনেকই মিলে ; এই গুলির উপরে বসিয়া বহুদূর নজর রাখা যায়, তাই এগুলি পর্যবেক্ষণের ঘাঁটি (observation post) হিসাবে ব্যবহার করা যায়। অবশ্য সব সময় বসিয়া বসিয়া পাহারা দিলেই চলিবে না। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রামবাসীর বেশে বা ছদ্মবেশে পথ চলিবার ভান করিয়া এদিক ওদিক নজর রাখা দরকার।

সাধারণতঃ সন্ধ্যার সময় হইতে ঘণ্টা দুই এবং রাত্রে ১টা ২টা হইতে শেষরাত্রি পর্যন্ত পাহারা দিবার বিশেষ দরকার হইয়া থাকে। তবে মধ্য রাত্রে শত্রু আসিতেছে না এমন কথা শপথ করিয়া কেহই বলিতে পারে না।

ঘোড়সোয়ার বা সাইকেলবাহী গেরিল্লা উক্ত চৌকীদার পেট্রল এবং গেরিল্লা ঘাঁটির সঙ্গে সংযোগ রাখিবে ও সংবাদ দ্রুত পৌঁছাইয়া দিবে। রাত্রে টর্চ লাইট লালনীল কাগজ মুড়িয়া সংকেত হিসাবে ব্যবহার করা চলে। পর্যবেক্ষণের

এই গাছগুলি যদি আসল গেরিল্লা ঘাঁটি বা গেরিল্লা ব্যবহৃত গ্রাম হইতে দেখা যায় ত ভাল হয়। নতুবা ধরুন মূল গেরিল্লা ঘাঁটির পাশেই একটি উঁচু গাছ আছে ; এই গাছে উঠিয়া চারটি শাখায় চারদিকে চারজন চৌকীদার বসিয়া গ্রামের চারিপাশের "পর্যবেক্ষণ ঘাঁটির" পেট্রলদের সাঙ্কেতিক আদেশ নির্দেশ গ্রহণ করিতে লাগিল এবং তৎক্ষণাৎ সেই মত সংবাদ পার্শ্বস্থ মূল ঘাঁটিতে পৌঁছাইয়া দিতে লাগিল।

প্যারাস্যুটিস্ট বা ছত্রবাহী শত্রু সৈন্য আকাশ পথে নামিতেছে কি না বা শত্রুর বোমারু বিমান আসিতেছে কিনা এইরূপে লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

স্থিতিশীল (চৌকীদারী) পেট্রল ঘাঁটি এবং "আত্মরক্ষা কেন্দ্রের" (Defensive post) মধ্যে তফাৎ এই যে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শত্রুর সঙ্গে লড়াই চলিবে যতক্ষণ না অন্য হুকুম আসিয়া পৌছে। কিন্তু চৌকীদার-গেরিল্লা শত্রু দেখিলে হয় চলিয়া আসিবে ও ঘাঁটিতে সংবাদ দিবে অথবা তাহার পর্যবেক্ষণের ঘাঁটি বদল করিয়া অন্য ঘাঁটিতে আশ্রয় লইবে।

চৌকীদার গেরিল্লা সংখ্যায় কতজন হইবে তাহা নির্ভর করে (অ) কতক্ষণ ইহারা পাহারা দিবে, (আ) শত্রুকে রুখিতে হইবে কি না, (ই) ইহাদের আত্মরক্ষার সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদির উপর (শত্রুকে রুখিতে হইলে বন্দুক, হাতবোমা, হাল্কা মেসিনগান প্রভৃতি থাকা দরকার)।

চৌকীদার গেরিল্লাদের একজন কম্যাণ্ডার থাকিবে, তাহার দায়িত্ব গুরুতর, সে পাহারা বসাইবার পূর্বে জানিয়া লইবে :—(১) কি পরিমাণে শত্রুকে বাধা দিতে হইবে অর্থাৎ কোনও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত [যথা, যতক্ষণ দ্বিতীয় দফায় পেট্রল না পাঠানো হয় ততক্ষণ] শত্রুকে ঠেকাইতে হইবে, না, যখন শত্রু দলে বিশেষ পুরু হইয়া আসিবে তখনই হটিয়া আসিবে, কিংবা, শত্রু দৃষ্টিগোচর হইবামাত্রই চলিয়া আসিবে। (২) কোন্ কোন্ নির্দিষ্ট জায়গা বা কেন্দ্রগুলি পাহারা দিতে অথবা রক্ষা করিতে হইবে। (৩) কোন্ কোন্ পথে যাইবে এবং ফিরিবে। (৪) শত্রুকে আসিতে দেখিলে কি করিতে হইবে। (৫) কতক্ষণ অন্তর রিপোর্ট বা সংবাদ পাঠাইতে হইবে এবং কি উপায়ে তাহা প্রেরিত হইবে। (৬) শত্রু দেখিলে

বা হটিয়া আসিতে বাধ্য মনে করিলে কি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিবে। (৭) কি পরিচয় দিলে বা সাঙ্কেতিক বার্তা বলিলে তাহাকে নিজের লোকেরা বা ঘাঁটির গেরিল্লারা চিনিবে।

চৌকীদার গেরিল্লারা আত্মরক্ষার দায়িত্ব বা ঝুঁকি নিজেরাই লইবে। সুতরাং ইহাদের "পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি" বা পাহারার কেন্দ্রগুলি এমন হওয়া দরকার যাহাতে পার্শ্ব-দেশ (flank) হইতে শত্রু লুকাইয়া আড়ালে আড়ালে না আসিতে পারে। পশ্চাদপসরণের সুবিধা ইহাদের থাকা চাই এবং ইহাদের সম্মুখে বহুদূরব্যাপী খোলা জায়গা থাকে যেন, যাহাতে নিকটে আসিবার পূর্বেই শত্রু দূর হইতেই গুলী খাইয়া মরে। চৌকীদার গেরিল্লাদের সবচেয়ে বড় বিপদের আশঙ্কা হইল—মূল দল বা ঘাঁটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার ষোল আনা সম্ভাবনা। সেইজন্য ইহাদের পার্শ্বদেশ রক্ষার জন্য গেরিল্লা স্কাউট্ নিযুক্ত করিতে হইবে। কেহ যেন মনে না করেন যে, দিনের বেলায় গেরিল্লা-পাহারা বসাইতে হয় না। পাহারা সব সময়েই রাখিবেন। তবে দিনের পাহারা অনেকটা সহজ কাজ।

আর এক রকমের পেট্রল আছে তাহার নাম 'তত্ত্বতল্লাসী' (Reconnoitring) পেট্রল। ইহাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) টহলদারী (তত্ত্বতল্লাসী), রক্ষী (Protective) পেট্রল, যাহার কর্তব্য হইল মূল গেরিল্লাবাহিনীকে রক্ষা করিতে করিতে পথ দেখাইয়া আগাইয়া লইয়া যাওয়া। ইহারা গতিশীল হয় এবং চলিবার পথে সর্বদা শত্রুর তল্লাস করিতে রত থাকে। (২) আর এক শ্রেণীর তত্ত্বতল্লাসী পেট্রল আছে, যাহার কর্তব্য হইল জমির গঠন ও শত্রু সম্পর্কে বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করা। ইহাদের সংবাদবাহী পেট্রল বলা যাইতে পারে।

তাহা হইলে "দুই নম্বর পেট্রল"=টহলদারী রক্ষী গেরিল্লা (Reconnoitring Patrol on protective duty), "তিন নম্বর পেট্রল"=সংবাদবাহী গেরিল্লা (Reconnoitring Patrol to secure special informations about enemy or ground) বা চর এবং "চার নম্বর পেট্রল" হইল জঙ্গী পেট্রল (Fighting Patrol).

ইহাদের কার্যাবলী ক্রমশঃ আলোচনা করা যাউক।

টহলদারী (রক্ষী) গেরিল্লাদল :—যে গেরিল্লাদের অগ্রদূত রক্ষী হিসাবে এই টহলদারীদল কার্যে বাহির হইয়াছে, সেই গেরিল্লাদের গতিবিধি ও কার্যাদির উপরে টহলদারী গেরিল্লাদলের গতিবিধি ও কার্যাদি নির্ভর করে। এই গেরিল্লা-বাহিনীকে রক্ষা করিয়া আগাইয়া চলা হইল তাহার দায়িত্ব। সেইজন্য মূলবাহিনী ছাড়িয়া টহলদারী গেরিল্লা নিরপেক্ষভাবে বা নিজ খুশী-খেয়াল মত চলিবেনা। সে দেখিবে যেন অতর্কিতে শত্রু এই গেরিল্লা-বাহিনীকে আক্রমণ না করে; কাজেই খোঁজ করিয়া চলিতে চলিতে শত্রুর সন্ধান পাইলেই মূলবাহিনীকে সাবধান করিয়া দেওয়া তাহার কর্তব্য। সেইজন্য বাহিনীটি যখন অগ্রসর হয় তখন টহলদারী গেরিল্লারা তাহার সম্মুখ ও পার্শ্বদেশ পাহারা দিয়া রক্ষা করিতে করিতে চলে; অথবা রাত্রির অন্ধকারে শত্রুসৈন্যেরা গেরিল্লা ঘাঁটির দিকে আগাইয়া আসিল কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য শেষরাত্রে টহলদারী গেরিল্লা পাঠানো হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মূল গেরিল্লাবাহিনীর পরিকল্পনা কার্যসূচী ও গতিবিধি অনুযায়ী টহলদারী গেরিল্লাকে চলিতে হয়।

সংবাদবাহী (গুপ্তচর) গেরিল্লা :—আগে-ভাগে সংবাদ সংগ্রহের জন্য এই জাতীয় গেরিল্লা নিযুক্ত করা হয়। ছলে বা কৌশলে, লুকাইয়া বা প্রত্যক্ষে, ছদ্মবেশে বা যে কোনো প্রকারে হউক শত্রুর ঘরের খবর এবং রাস্তাঘাট ও জমির গঠন ইত্যাদি সম্পর্কে সংবাদ লইয়া হাজির হওয়া তাহার কর্তব্য বা দায়িত্ব। শত্রুর আক্রমণ হইতে মূল গেরিল্লাবাহিনী রক্ষা করা ইহার কাজ নয়। মূলবাহিনীর গতিবিধির উপর ইহার গতিবিধি নির্ভর করে না। পেট্রল-কম্যাণ্ডার নিজস্ব মতলব ও বুদ্ধি খাটাইয়া এবং উপযুক্ত সময় দেখিয়া অন্য—নিরপেক্ষ হইয়া স্বায় ইউনিট্‌কে দিয়া কাজ হাসিল করেন। এই জাতীয় (সংবাদবাহী বা গুপ্তচর) গেরিল্লাকে পাঠানো হয় শত্রুর সঙ্গে যোগাযোগ (contact) রাখিবার জন্য—কোথায় সে ঘাঁটি গাড়িল, কোন্ পথে সে অগ্রসর হইতেছে ইত্যাদি খবর লইবার জন্য। মূল গেরিল্লাবাহিনীর নিজেদের অগ্রগামী দল (troops in front) বা পার্শ্ববর্তী

দলগুলির (flanking units) সঙ্গেও যোগাযোগ রাখিবার প্রয়োজনে সংবাদবাহী গেরিল্লা নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

জঙ্গী পেট্রল :—তত্ত্বতল্লাসী (Reconnoitring) পেট্রল এবং জঙ্গী (Fighting) পেট্রলের কর্তব্যগুলি প্রায় একই প্রকারের; অর্থাৎ জঙ্গী পেট্রলের কাজও দুইভাগে ভাগ করা যায়—যথা, রক্ষণমূলক (Protective) ও বিশিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনমূলক (for some special purpose)। জঙ্গী পেট্রলের রক্ষণমূলক কাজ এইরূপ—মূল বাহিনীর পশ্চাদপসরণের সময় শত্রুকে ঠেকানো; শত্রুর পেট্রল বাহিনীকে রুখা; মূলবাহিনীর আত্মরক্ষাকালে সামনে খাড়াল দিয়া লড়াই করা (to act as covering parties in defence); নৈশ-অভিযান—উদ্যোগী গেরিল্লা বাহিনীকে রক্ষা করা (to protect troops forming up for a night attack)।

জঙ্গী পেট্রলের বিশিষ্ট কাজ হইল শত্রুদলকে সনাক্ত করা (to secure identification of enemy units), দলভ্রষ্ট শত্রুকে বন্দী করা বা হত্যা করা, শত্রুকে পর্যুদস্ত করা (harassing the enemy) অথবা "পোড়ামাটী"র নীতি কাজে খাটানো—ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া, জঙ্গী-পেট্রলবাহিনী তত্ত্বতল্লাসী—পেট্রলকে সাহায্য করিতে পারে—হয়ত এমন একটি ঘাঁটি ইহারা গাড়িল যেখান হইতে সংবাদবাহী পেট্রল তাহার নিজস্ব কার্যে বাহির হইতে পারে। আবার কখনো কখনো—বিশেষতঃ মূল গেরিল্লাবাহিনীর পশ্চাদপসরণের এবং পার্শ্বদেশ রক্ষার কাজে—জঙ্গী পেট্রলবাহিনী যান্ত্রিক যানবাহনের (mechanical transport) সাহায্যে গতিশীল সৈন্যের (mobile troops) কাজও করিয়া থাকে। এরূপ কাজে যথেষ্ট সংখ্যক গেরিল্লার দরকার হইয়া থাকে এবং মেশিনগান, রাইফেল, ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী বন্দুকগুলির প্রয়োজন।

পেট্রলবাহিনীর উদ্যোগ পর্ব (Preparatory arrangements)

(১) **পেট্রলবাহিনীর শক্তি ও সংগঠন** (Strength and composition of patrols) :—যেমন কাজ থাকিবে, পেট্রলবাহিনী সেইমত দলে ভারী হইবে। সংবাদ সংগ্রহ করা যে-পেট্রলের উদ্দেশ্য, সে বিনা প্রয়োজনে শত্রুর সঙ্গে হাতাহাতি করিবে না ; সংবাদ লইবার জন্য এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণ করিতে যতটুকু লড়াইয়ের দরকার মাত্র ততটুকু-ই করিবে।

অতএব তত্ত্বতল্লাসী (Reconnoitring) পেট্রল সংখ্যায় যত কম হয় ততই ভাল। বেশ ওস্তাদ্ স্কাউট্ হইলে দুই-তিন জনেই বাজী মাৎ করিতে পারে, তবে স্কাউটের নিজস্ব প্রাণ বাঁচানোর জন্য অথবা বহুক্ষণ ধরিয়া পর্যবেক্ষণের কার্যে যে ক্লান্তি বা অবসাদ আসে পালাক্রমে তাহা অপনোদনের জন্য এরূপ পেট্রলবাহিনীর দল একটু ভারী রাখিতে হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ইহার সংখ্যা এক সেক্শানের অর্থাৎ দশ হইতে পনর জনের বেশী হইবে না।

কিন্তু জঙ্গী পেট্রলবাহিনীর কাজ দায়িত্বপূর্ণ ও গুরুতর। কাজেই ইহা দুই বা তদূর্দ্ধ সংখ্যক সেক্শান লইয়া গঠিত হইবে। ইহারা একজন কর্মকুশল, দায়িত্বশীল নেতার অধীনে থাকিবে। ইহাদের শক্তি এবং অস্ত্রশস্ত্র যতদূর সম্ভব যথেষ্ট হয় যেন,—যাহাতে অনুরূপ শত্রু-পেট্রল বাহিনীকে কাবু করা যায়, তাহাদের বন্দী করা যায় এবং নিজেদের আহত গেরিল্লাদের বহন করিয়া ফিরাইয়া আনা যায়। পরিশ্রান্ত লোক দিয়া এ সকল কাজ করানো যায় না—প্রত্যেকে যেন সতেজ ও বলিষ্ঠ হয় এবং যেখানে অভিযান চালাইতে হইবে তাহার চারিদিকের জমির গঠন ও অন্ধি-সন্ধি সকলের জানা থাকা দরকার। সেইজন্য সাধারণতঃ মজুত সৈন্যের যে-অংশ বুদ্ধিমান ও কৌশলী তাহাদের ভিতর হইতে এই জঙ্গী পেট্রল নির্বাচন করা হয়।

পেট্রল বাহিনী সংগঠনের সময়ে মনে রাখিতে হইবে, যেন সংবাদ সরবরাহের প্রকৃষ্ট উপায় স্থির করা হয় ও প্রয়োজনীয় সাঙ্কেতিক কায়দা কৌশল প্রভৃতি ঠিক

করা হয়। ঘোড়া, সাইকেল প্রভৃতি বাহনযুক্ত গতিশীল অর্থাৎ ধাবমান লোকজনের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ করাই সুবিধাজনক হইবে।

(২) **সাজসরঞ্জাম (Equipment)**:—পোষাক, সরঞ্জাম, হাতিয়ার ইত্যাদির পরিমাণ নির্ভর করিবে ন্যস্ত কাজের পরিমাণ, স্থানীয় ভৌগলিক গঠন এবং কত সময় বাহিরে থাকিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয়ের উপরে। আসল কথা, ঝটপট্ কাজ করিতে হইবে—কাজেই সঙ্গের জিনিষ যত হাল্কা হয় ততই ভাল। একটি রাইফেল বা টমিগান বা হাল্কা মেসিনগান বা বন্দুক আর কিছু গুলি এই থাকিলেই হইল। চক্চকে কোনো জিনিষ লওয়া নিষিদ্ধ। সঙ্গের সাজসরঞ্জামগুলি যেন ঘটাঘট্ শব্দ না করে, বিশেষতঃ নৈশ-অভিযানে নিঃশব্দতা একান্ত দরকার।

(৩) **পেট্রলবাহিনীকে নির্দেশ দান**:—পেট্রল-নেতার উপরে পেট্রলবাহিনীর সাফল্য নির্ভর করে, পেট্রল-নেতাকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট আদেশ দিতে হইবে। তাহাকে বলা দরকার :—

(ক) শত্রু কি ভাবে সৈন্যসমাবেশ করিয়াছে এবং তাহার কাছাকাছি মিত্রপক্ষীয় কোন সৈন্যচলাচল করিতেছে কিনা।

(খ) তাহার কর্তব্য কি, এবং তাহাকে কোথায় সংবাদ পৌছাইয়া দিতে হইবে।

(গ) কোন্ রাস্তা দিয়া কতদূর যাইবে এবং কতক্ষণ বাহিরে থাকিতে হইবে। [চৌকীদারী (স্থিতিশীল) পেট্রলের নেতার প্রতি নির্দেশ তুলনা করুন।]

(৪) **তন্ত্রতল্লাস**:—পেট্রল-নেতা ম্যাপ ও জমির গঠন লক্ষ্য করিবেন এবং তাঁহার কর্তব্য সম্পাদনের একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা স্থির করিবেন। চলিবার পথে তিনি নিম্নলিখিত জায়গাগুলি লক্ষ্য করিবেন ও মনে রাখিবেন—যথা, 'পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি'র উপযুক্ত জায়গা, আড়ালে অবস্থিত পথ (covered routes), বিশিষ্ট ও চিহ্নিত স্থানগুলি (land marks), সুবিধাজনক বাঁক বা মোড়গুলি (suitable bounds), পথের বাধা বা অবরোধগুলি (obstacles), এবং যে-সব জায়গায় শত্রু 'ওৎ' পাতিয়া থাকিতে পারে সেইগুলি।

(৫) **পরিকল্পনা ও নির্দেশ** (Plan and orders) :—পরিকল্পনা তৈয়ারী করিবার সময় পেট্রল-নেতা বা কম্যাণ্ডার মনে রাখিবেন যে, শত্রুকে বোকা বানাইতে হইবে। পেট্রল-বাহিনীর সকলকেই তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য, মতলব (plan of action) ও পেট্রল সমাবেশের পদ্ধতি (formation to be adopted) খুলিয়া বলিবেন। প্রায় সকলকেই স্থানীয় জমির গঠন এবং এলাকার পারিপার্শ্বিকতা জানিতে সুযোগ দিবেন।

তত্ত্বতল্লাসী পেট্রল-বাহিনীর অভিযান

আগেই বলা হইয়াছে যে, টহলদারী (রক্ষী) গেরিল্লা মূলবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়া পদেপদে তাহার নির্দেশ মানিয়া চলিবে। কিন্তু সংবাদ-বাহী (গুপ্তচর) গেরিল্লা অনেকটা আপনার তাগিদে আপন সুবিধা ও সময় বুঝিয়া চলিবে। ইহার চলাচলের স্বাধীনতা বেশী; কিন্তু নিজে স্বাধীনভাবে সুযোগ ও সময় বুঝিয়া চলিবার খেয়ালে যদি মূলবাহিনীর সময় বহিয়া যায়, তবে, তাহার তথ্য-সংগ্রহের কি মূল্য থাকিতে পারে? অতএব যে-কোনও প্রকারের তত্ত্বতল্লাসী গেরিল্লাকে-ই মূল কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনের প্রতি নজর রাখিয়া কাজ করিতে হয়।

রাস্তা ঃ—মূল কর্তৃপক্ষ পথ বলিয়া দিবেন; কিন্তু পেট্রল-কম্যাণ্ডারকে এই পথের খোঁজ-খাঁজ তন্ন-তন্ন করিয়া জানিতে হইবে যাহাতে পথমধ্যবর্তী ভাল-ভাল আড়াল লইবার ও পর্যবেক্ষণ করিবার স্থানগুলির সুযোগ লওয়া যায়। যে পথে যাইবেন সে-পথে না-ফিরিয়া ভিন্ন-পথে ফিরিবেন; কেন না, ইহা খুবই সম্ভব যে, যাইবার কালে পেট্রলকে শত্রু দেখিয়া ফেলিয়াছে এবং ফিরিবার সময় তাহাকে ফাঁদে ফেলিবার আয়োজন করিতেছে। কোনও পেট্রলবাহিনী অথবা তত্ত্বতল্লাসী গেরিল্লা উপর্যুপরি দুইদিন এক-ই রাস্তা ও চলিবার এক-ই কৌশল অবলম্বন করিবে না। শত্রু যেন জানিতে না পারে—পেট্রলবাহিনী কবে কোথায় কি করিবে।

লক্ষ্যবস্তুর দিকে আগাইবার কায়দা ঃ—এ বিষয়ে পেট্রল-

কম্যাণ্ডার আগেই ভাবিয়া রাখিবেন। শত্রু যেমনটি আশা বা আশঙ্কা করিতেছে, ঠিক তেমনটি যেন না-করা হয়, সেইজন্য পিছন বা সম্মুখ দিয়া না আগাইয়া অনেক সময়ে পার্শ্ব দিয়া আগাইয়া আসা ভাল, এবং সম্ভব হইলে যে-সব জায়গা সহজেই নজরে পড়ে সেগুলি এড়াইয়া চলিতে হইবে—যেমন, আড়াল লইবার বা আত্মগোপন করিবার ছড়ানো (isolated) জায়গাগুলি, অথবা নজর-ধরা পাহাড় বা ঢিবিজমি ইত্যাদি। বেশী নড়াফেরা না করিয়া কোনও সুবিধাজনক পর্যবেক্ষণ-বিন্দুতে বা কেন্দ্রে বসিয়া বসিয়া চারিদিকে সুতীক্ষ্ণ নজর রাখিলে অনেক সময় বেশী সংবাদ সংগ্রহ করা যায়। অধুনা নিউগিনীতে জাপসৈন্য ও অষ্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে যে-জঙ্গলযুদ্ধ চলিতেছে সেখানে দেখা যায় জাপানী স্কাউটগুলি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন গাছের ডাল আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে—কখন কোন শত্রু-সেনা সে পথে আসিবে, এই আশায়। পেট্রল-গেরিল্লারা সাধারণতঃ নরম মাটি, নীচুস্থান, ঝোপের ভিতর, গাছের আড়াল ও ছায়া দিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিবে। অল্প আলোছায়া থাকিলে ধাপে-ধাপে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়; অর্থাৎ একটি আড়াল হইতে অন্য আড়াল পর্যন্ত অগ্রসর হইবার পর কিছু সময় দেখিয়া শুনিয়া আবার অগ্রসর হইতে হইবে। একটি আড়াল হইতে বাহির হইবার সময়ে কখনও সে হুপ করিয়া হঠাৎ দেখা দিবে না। ধীরে ধীরে এবং অতি অল্পে অল্পে আড়াল হইতে বাহির হইবে। ইহাতে নিকটস্থ শত্রুর দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব। নিঃশব্দে চলা-ফেলার কায়দা আয়ত্ত করিতে হইবে। (এ সম্বন্ধে অন্যত্র বিশদ আলোচনা হইয়াছে)।

পেট্রল বাহিনীর গঠন ঃ—কি রূপ কায়দায় সমাবেশ করিয়া (সাজাইয়া) পেট্রল-বাহিনীকে আগাইয়া লইতে হইবে তাহা নির্ভর করে কয়েকটি জিনিষের উপর ঃ—(ক) কতটা গোপন থাকিয়া চলিতে হইবে (concealment); (খ) নিয়ন্ত্রণের সুবিধা অসুবিধা (Control); (গ) আত্মরক্ষার প্রয়োজন (Protection); এবং (ঘ) জমির গঠন (ground)।

বেশী ছড়াইয়া অগ্রসর হইলে পেট্রল-কম্যাণ্ডার নিয়ন্ত্রণের অসুবিধা বোধ করিবেন। কিন্তু এমন ঘেঁসা ঘেঁসি করিয়াও যাওয়া চলে না যাহাতে একের সঙ্গে

অস্ত্রের ঠোকাঠুকি হইতে পারে বিশেষতঃ রাত্রিকালে। ইহার চেয়েও বড় কথা হইল এই যে, বেশী কাছাকাছি থাকিয়া চলিলে শত্রুর গুলী বা বোমার আঘাতে এক সঙ্গে বেশী লোকক্ষয় হইবার আশঙ্কা আছে। ইহা ছাড়া, এক সঙ্গে চলিলে যদি শত্রু হঠাৎ ঘিরিয়া ফেলে ত সকলেই মারা পড়িতে হইবে। সুতরাং দিনের বেলায় বেশ ছড়াইয়া চলাই উচিত। [রাত্রিতে কি রূপ নিয়ম অবলম্বন করিতে করিতে হইবে তাহা নীচে আলোচিত হইবে] আসল কথা, জমির গঠনের উপর চলাফেরা ও সৈন্য সমাবেশের কায়দা নির্ভর করিবে, [জমির গঠন সম্পর্কে "আড়াল লইবার কায়দা" শীর্ষক পরিচ্ছেদ পড়ুন]

আত্মরক্ষাকল্পে শুধু সামনের দিকে দৃষ্টি রাখিলেই চলিবে না—পার্শ্বদেশ ও পশ্চাৎভাগ আগলাইয়া চলিতে হইবে। ধরুন পেট্রল-বাহিনীতে দশজন লোক আছে (সাধারণতঃ এইরূপই থাকে)। ইহাদের দুইটী লোক পেট্রলবাহিনীর পুরোভাগে চলিবে—পঞ্চাশ গজ অন্তর অন্তর ; তাহাদের যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্কাউট বলিব। আবার তাহাদের পঞ্চাশ গজ পিছনে পিছনে থাকে পেট্রল-কম্যাণ্ডার ও দ্বিতীয় কম্যাণ্ডার এবং এই কম্যাণ্ডারদের দুইপাশে পঞ্চাশ গজ দূরে দূরে কম্যাণ্ডার ও দ্বিতীয় কম্যাণ্ডারের সমান্তরাল দুইজন করিয়া চারজন টহলদার থাকে, যাহাদের কার্য হইল পার্শ্বদেশ রক্ষা করা। গেরিল্লাদলের অস্ত্রশস্ত্র তেমন নাই, নতুবা এই টহলদার (পার্শ্বরক্ষাকারী) চারজনের সামনের (কম্যাণ্ডারের সমান্তরাল) দুই জনকে টমি-গান এবং পিছনের (দ্বিতীয় কম্যাণ্ডরের সমান্তরাল) দুইজনকে মেসিনগান একটি করিয়া দেওয়া যাইত। পেট্রলবাহিনীর সামনের স্কাউট দুইজন আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিবে না, তাহাতে শত্রু আগে হইতে সতর্ক হয় ও সমস্ত দলটি ধরা পড়িতে পারে। কিন্তু তেমন বেগতিক দেখিলে আত্মরক্ষার জন্য অবশ্য গুলী করিবে। তবে সাধারণতঃ শত্রু দেখিলেই ইহারা পিছনের পেট্রলবাহিনীকে সাবধান করিয়া দিয়াই ঝট্ করিয়া আত্মগোপন করে। পেট্রল বাহিনীর দুইজন পশ্চাৎরক্ষী (rear guard) থাকিবে—তাহারা কম্যাণ্ডার ও দ্বিতীয় কম্যাণ্ডারের বরাবর পিছনে একই লাইনে পঞ্চাশ গজ অন্তর অন্তর থাকিবে—ইহাদের নাম "run-away men" অর্থাৎ

যাহারা পিছনের মূল গেরিল্লাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিবে এবং নানা প্রয়োজনীয় সংবাদ ছুটিয়া গিয়া মূল কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া আসিবে।

পেট্রলবাহিনীর প্রথম স্কাউটটী আগাইয়া চারিদিকে নজর রাখিবে; কোনো বিপদের আশঙ্কা আছে কিনা অথবা শত্রু চোখে পড়িল কিনা এই খবর সঙ্কেতে পিছনের দ্বিতীয় স্কাউটকে জানাইয়া দিবে। সে আবার পেট্রল-কম্যাণ্ডারকে সেই অনুযায়ী ইঙ্গিত করিবে। কম্যাণ্ডার তখন সমগ্র দলটিকে অনুরূপ নির্দেশ জানাইবে। প্রথম স্কাউট যদি আগাইবার নির্দেশ দিয়া থাকে তবে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পেট্রল-বাহিনীটি আগাইয়া পরবর্তী গোপন স্থানে যাইয়া আশ্রয় লইবে। তারপর ভাল ভাবে দেখিয়া শুনিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্কাউট আবার আগাইবে। এইরূপে ছায়ায় ছায়ায়, আড়াল হইতে আড়ালে, কখনো বসিয়া কখনো শুইয়া, কখনো দ্রুত, কখনো ধীরে, কখনো বুকে হাঁটিয়া, হামাগুড়ি দিয়া এক ঝোপ বা জঙ্গল হইতে অন্য ঝোপে, এক গর্ত হইতে অন্য গর্তে আগাইতে আগাইতে পেট্রল বাহিনীটি শেষপর্যন্ত পৌঁছিবে শত্রুর সীমানার মধ্যে। তারপর ইহাদের সন্ধানী দৃষ্টি এক নজরে শত্রুর অবস্থান ইত্যাদি দেখিয়া লয়। তখনই পিছনের পেট্রল দুইটির (Run-away men) উপর হুকুম হয়—তাহারা দ্রুত পদক্ষেপে চলিয়া গিয়া পিছনে মূল গেরিল্লা-বাহিনীর ঘাঁটিতে খবর দেয়।

উপরের বর্ণনা পড়িয়া এই ধারণা করুন যে পেট্রলিং বা স্কাউটিং ব্যাপারটি পোষ্টাফিসের পিওনের ডাক-বিলির মত ধাঁ করিয়া শেষ হয় না। তবে গেরিল্লাদের সুবিধা এই যে তাহারা প্রতিটি ইঞ্চি জমির সঙ্গে পরিচিত—তাহারা হয় নিজেরাই স্থানীয় লোক, নয় স্থানীয় বিশ্বাসী লোকের সাহায্য লয়। অপর পক্ষে, বিদেশী শত্রু বা ভাড়াটিয়া সৈন্যবাহিনীর পক্ষে স্কাউটিং ও পেট্রলিং বড়ই একঘেয়ে ও নিতান্ত ক্লান্তিকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

পেট্রলবাহিনীর পশ্চাদপসরণের নিয়ম

ধাপে ধাপে আড়ালে আড়ালে পিছাইতে হইবে। প্রত্যেক ধাপে এইরূপ নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়:—পিছনের কোনও সুবিধাজনক জায়গাকে গুলীচালনার ঘাঁটি

হিসাবে পেট্রল কমাণ্ডার মনোনীত করিবেন ; সবচেয়ে নিকট রাস্তা দিয়া পেট্রল বাহিনীর এক অংশকে ঐ জায়গায় চলিয়া যাইবার নির্দেশ দিবেন ; প্রয়োজন হইলে ইহারা স্বপক্ষীয় গুলীর আড়ালে চলিতে থাকিবে এবং মনোনীত গুলী-চালনার ঘাঁটিতে পৌছাইয়া পেট্রলবাহিনীর আর সকলকে পিছাইবার কালে গুলীর আড়াল দিবে—অর্থাৎ একদল যখন পিছাইতেছে অন্য দল তখন শত্রুকে গুলী করিয়া রুখিবে ও ব্যতিব্যস্ত রাখিবে। যে জায়গাগুলি গুলীচালনার ঘাঁটি হিসাবে মনোনীত করা হইবে সেগুলির সম্মুখভাগ যেন গুলীচালনার বেশ উপযোগী হয় (অর্থাৎ সম্মুখে শত্রুকে বেশ দৃষ্টিপথে রাখিয়া সরাসরি গুলী-বিদ্ধ করা যায়) অথচ পরক্ষণেই পিছনে হটিবার সময় পেট্রলবাহিনীকে যেন ভালরূপ আড়াল দিবার উপযোগী হয়। নিজেদের সীমানায় পৌছিবার পর অবশ্য গুলীর আড়াল দিবে মূল গেরিল্লাবাহিনী।

কিন্তু গেরিল্লাদের এত কাণ্ড করিবার দরকার নাই, কেন না, চীনা "অষ্টম রুট্ বাহিনী" বা "নব চতুর্থ বাহিনী"র মত সুগঠিত, সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত গেরিল্লা বাহিনীতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত তাহারা সম্মুখ-সমরে কখনই মহড়া দিবে না বা সামনাসামনি শত্রুকে রুখিবে না ; এবং পশ্চাদপসরণের সময়ে এত বিস্তারিত ভাবে গুলীর আড়ালে লুকাইবার কৌশল তাহাদের জানিবার প্রয়োজন নাই, কেন না, তাহারা 'ছোঁ' মারিয়া ঝট্ করিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইবে—রাস্তা ঘাট ত পূর্বেই জানাশুনা ; যে যেমনে পারিবে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে দৌড়িয়া আসিয়া পৌছিবে। আর শত্রু ততক্ষণ আন্দাজে গুলীগোলা ছুঁড়িতে থাকুক, তবে অন্ধকারেও শত্রুর গুলী আসিয়া লাগিবার সম্ভাবনা, তাই অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে গেরিল্লা পেট্রলেরা আড়ালে আড়ালে বা প্রয়োজন হইলে বুকে হাঁটিয়া পিছনে পলাইয়া আসিবে। তবে যদি-ই কখনো শত্রুর সামনাসামনি পড়িয়া যাইতে হয় এবং বাধ্য হইয়া উপরে বর্ণিত কৌশল অবলম্বন করিতে হয়, তাই আগে হইতে কায়দাটি জানিয়া রাখা হইল।

তত্ত্বতল্লাসী গেরিল্লার নৈশ অভিযানের কৌশল ঃ—

পূর্ববর্ণিত সমস্ত নিয়মই খাটিবে ; কিন্তু নিম্নলিখিত রদবদলগুলি মনে রাখিবেন ঃ—অন্ধকার রাত্রে ধাপে-ধাপে না-আগাইয়া ধীরে ধীরে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া মাঝে মাঝে থামিয়া নিকটে কোনো শব্দ শোনা যায় কি না দেখিতে হইবে। প্রায়ই চলিবার দিক (direction) যাচাই করিয়া লইতে হয় এবং সব সময়ে খেয়াল রাখিতে হইবে যেন পেট্রলবাহিনী দূরে দূরে না-ছড়াইয়া পড়িয়া কাছাকাছি থাকিয়া এক-ই ভাবে সকলে অগ্রসর হয়।

এই ভাবে চলিলে গতি অবশ্যই ধীর হইবে। এরূপ পেট্রলবাহিনীর সংগঠন এই প্রকার হইতে পারে ঃ—দুইজন রাইফেলধারী স্কাউট্ ও পেট্রল-কম্যাণ্ডার আগাইয়া চলিবে আর তাদের-ই পিছনে দেখা যায় এমন দূরত্ব রাখিয়া আর সকলে কিছু-কিছু ছড়াইয়া অগ্রসর হইবে। ঠিক কি রূপ সমাবেশ হইলে ভাল হয়, সে ভার পেট্রল-কম্যাণ্ডারের উপর রহিবে। আঁধারের ঘনত্ব অনুসারে পেট্রল সংগঠন ঠিক করা উচিত। রাত্রে নিঃশব্দতা বেশী দরকার এবং চোখের চাইতে কানের উপযোগিতা বেশী।

যেমন দিনে তেমনি রাত্রিতে-ও শত্রুর সঙ্গে হাতাহাতি সম্ভবমত এড়াইয়া চলিতে হয়, কিন্তু যদি অতর্কিতে শত্রুর সঙ্গে দেখা শুনা বা সংঘর্ষ হয় তবে সে ক্ষেত্রে নির্ভীক হইয়া তড়িৎ-গতিতে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। হয়ত, হঠাৎ রাইফেলের গোড়া (Butt) বা বেওনেট্ দিয়াই আঘাত দিতে হইবে—শত্রু তৈয়ারী হইবার আগেই তাহাকে হতবুদ্ধি করিয়া দিতে হইবে।

রাত্রে অগ্রসর হওয়ার কালে মনে রাখিবেন—

(ক) পর্যবেক্ষণ ও আত্মগোপন করিবার পক্ষে নীচু জমি-ই অধিকতর উপযোগী।

(খ) উন্মুক্ত আকাশের সীমারেখাকে এড়াইয়া চলিতে হইবে ;

(গ) একান্ত ভাবে নীরবে চলাফেরার প্রয়োজন—এ সম্পর্কে নরম মাটির কার্যকারিতা স্মরণে রাখুন। আর সাজসরঞ্জামের শব্দও যেন না হয়।

জঙ্গী পেট্রলবাহিনীর অভিযান : যদি কখনো আমাদের দেশে গেরিল্লাবাহিনী যথেষ্ট শক্তিশালী ও সুসংবদ্ধ হইয়া উঠে যাহাতে গতিশীল এবং কৌশলী গেরিল্লা যুদ্ধও (mobile and manoeuvring warfare) সম্ভব হয়, তখন জঙ্গী পেট্রলবাহিনীর কলা-কৌশল কাজে আসিবে মনে করিয়া এই অনুচ্ছেদ লিখা হইল :—

জঙ্গীপেট্রলবাহিনী দলে পুরু হইবে এবং আক্রমণমূলক ও আত্মরক্ষামূলক (offensive defensive) লড়াই করিবে।

সমাবেশ—সম্মুখ ও পার্শ্বদেশ রক্ষা করিয়া চলিবে, শত্রুর দূরত্ব ও দেশের ভৌগলিক গঠনের উপর সৈন্য সমাবেশের খুঁটিনাটি নির্ভর করিবে, কাছাকাছি শত্রু নাই এমন অবস্থায় রাস্তার উপর দিয়াই সমগ্রবাহিনী চলিবে, কেবল সম্মুখে একটি সেকশান (১০।১৫ জনকে) আগাইয়া দিবে। পার্শ্বদেশ রক্ষার জন্য স্কাউট্ পাশে-পাশে চলিবে অথবা পেট্রলবাহিনীর সঙ্গে যাইতে যাইতে কয়েকটি গেরিল্লার কাজ হইবে পাশের দিকে নজর রাখা।

শত্রুর সাম্‌নাসাম্‌নি আসিলে ছড়াইয়া সৈন্য সমাবেশ করিতে হইবে। তিনটি জিনিষ মনে রাখা দরকার—(ক) আত্মরক্ষা, (খ) গতিনিয়ন্ত্রণ (control) এবং (গ) কৌশল খাটাইবার ক্ষমতা (power of manoeuvre), পরস্পর-বিরোধী কয়েকটা জিনিষের দরকার হয়—যথা, আত্মরক্ষার জন্য ছড়াইয়া থাকা দরকার এবং সম্মুখে একটি সেক্‌শানকে আগাইয়া থাকিতে হয় ও তাহার পার্শ্বদেশ রক্ষার জন্য কতকগুলি স্কাউট্ বা একটি সেক্‌শানকে নিযুক্ত করা হয়; কিন্তু গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কাছাকাছি থাকা প্রয়োজন; আবার, কৌশল খাটাইবার জন্য (for manoeuvre) দরকার হইতেছে যে, সৈন্য এমন ভাবে সমাবেশ করিতে হইবে যাহাতে শত্রুর সঙ্গে দেখা হইলে অতি অল্পসংখ্যক সৈন্যই তাহাকে হঠাৎ বিভ্রান্ত করিয়া দিতে পারে। পেট্রল কম্যাণ্ডার যেমন সুবিধা তেমনি জায়গায় থাকিবেন যাহাতে সমস্ত দলটিকে পরিচালিত করা যায়—যথা, সামনের সেক্‌শানে বা মাঝখানে অথবা পেট্রলবাহিনীর মূল অংশের সঙ্গে। জমির যেমন গঠন সেই মত দূরত্ব বজায়

রাখিয়া সেক্‌শানগুলি চলিবে, দেখিতে হইবে যেন মূল পেট্রলবাহিনী হঠাৎ শত্রুর গুলীর সীমানায় আসিয়া না পড়ে অর্থাৎ যথেষ্ট আগে থাকিয়া অগ্রগামী সেক্‌শান যেন তাহাকে সাবধান করিয়া দিতে পারে।

অগ্রগতি :—শত্রু নজরে আসিলে, পেট্রলবাহিনী আড়াল হইতে আড়ালে ধাপে-ধাপে অগ্রসর হইবে। সামনে ও পাশে নজর রাখিয়া আগাইতে হইবে একথা আগেই বলিয়াছি। সম্ভব হইলে পার্শ্বদেশ হইতে শত্রুকে আক্রমণ করিবার প্ল্যান ঠিক করিতে হইবে। কোনও লুকাইবার বা আড়াল লইবার যায়গায় যাইয়া পৌছিতে হইলে আগে হইতে নিজে লুকাইয়া লুকাইয়া লক্ষ্য করিতে হয় সেখানে শত্রু আছে কি না। যদি নাই মনে হয় তবু, হঠাৎ সেখানে না গিয়া নিজ দলের গুলীর আশ্রয়ে এবং আত্মগোপনের যে উপায় মিলে তাহার আড়ালে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পশ্চাদপসরণের কৌশল—উপরে তত্ত্বতল্লাসী পেট্রলের অনুচ্ছেদ দেখুন।

রাত্রিতে অগ্রসর হইবার কায়দা—কয়েকটি জিনিষের উপর সৈন্য সমাবেশের কৌশল নির্ভর করিবে—(ক) জঙ্গী পেট্রলবাহিনীর কর্তব্য কি প্রকারের—রক্ষণমূলক (protective), না, বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন-মূলক (for special purpose) [উপরে দেখুন]। (খ) শত্রুর দূরত্ব (গ) নৈশ অন্ধকারের ঘনত্ব এবং (ঘ) জমির গঠন। চলিবার কৌশল সম্পর্কে 'তত্ত্বতল্লাসী গেরিল্লা'র আগাইবার বিধি নির্দেশ মনে রাখিতে হইবে। কিন্তু জঙ্গী পেট্রলের বিশেষ দায়িত্বের কথাও ভুলিলে চলিবে না: আক্রমণমূলক ও কৌশলী সংগ্রাম হইল জঙ্গী পেট্রলের বিশিষ্ট কার্য। অথচ মুস্কিল এই যে, রাত্রের অন্ধকার বেশী নিবিড় হইলে দ্রুত চলাচলও যেমন সম্ভব হয় না, তেমনি আক্রমণের কৌশলী-মহড়ার সুবিধাও সীমাবদ্ধ রহিয়া যায়।

চীনা গেরিল্লাদের কৌশল

চীনা গেরিল্লারা যে সব জাপানী-ঠকানো কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে তাহার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে:—(১) সাদাসিদা কাপড় পরিয়া থাকে কিন্তু (২) তাহারা দিনে চাষী, রাতে গেরিল্লা সৈনিক। (৩) সামরিক কাজের সুযোগ যখন মিলেনা, তখন পাছে লোকের মন দমিয়া যায় সে জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে নানাপ্রকার ধ্বংস মূলক কাজ (sabotage) করে—যথা টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ তার কাটে, রাস্তার খাদ কাটিয়া, পুল ভাঙ্গিয়া রাখিয়া দেয়। (৪) এইরূপ ধ্বংস-মূলক কাজ চালাইয়া জাপ দরদীদের মনে ভয় জাগায়; (৫) গুপ্ত গেরিল্লারা শত্রুর গুপ্ত সংবাদ চুরি করিয়া আনে; (৬) পঞ্চমবাহিনীকে খুঁজিয়া বাহির করে। (৭) মূল গেরিল্লা এবং সৈন্য বাহিনীকে (Standing Army) শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে খবর দেয়। (৮) সুযোগ বুঝিলে, যেমন শত্রু যখন তাহার পিছন হইতে নূতন সৈন্য ও রসদ আনাইতে সুবিধা পাইতেছেনা, তখন শত্রুকে ছোট খাটো আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত রাখে। (৯) আক্রমণ করিয়াই দূরে পল্লী অঞ্চলে যাইয়া আত্মগোপন করে। (৯) শত্রুর সুরক্ষিত ঘাঁটি রাত্রিছাড়া আক্রমণ করেনা—নৈশ আক্রমণ অতর্কিতে করে, নিজেদের আক্রমণমূলক মনোভাব ধারালো রাখে এবং দেশের রাস্তাঘাট নখদর্পনে রাখে বলিয়া শত্রুর চোখে ধূলা দিয়া সরিয়া পড়িতে পারে। (১০) শত্রু যখন চলিতে থাকে, তাহাদের দলগুলি নানা কৌশলে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভিন্নপথে পরিচালিত করে এবং তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন দলকে একে একে আক্রমণ করে। এ সম্বন্ধে আগে হইতেই ফন্দী আঁটিয়া ওৎ পাতিয়া থাকে। (১১) সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখে কোন দলভ্রষ্ট জাপানী সৈন্য কোথায় আসিল—তাহাকে ধরিয়া হাতিয়ার কাড়িয়া নেয় ও বন্দী করে। (১২) চলিবার রাস্তায় জাপানীরা যেখানেই থাক্ সেখানের অধিবাসীদের আগে হইতেই এরূপ জাপবিরোধী করিয়া রাখে যে, আগত শত্রু সৈন্যেরা কোথাও শান্তিতে কাটাইতে পারেনা—রাত্রে ঘুম নাই, কখন গেরিল্লা আসিবে এই ভয়ে। এইরূপ ভয়ের পরিণতি এই হয় যে, তাহাদের স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য দেখা দেয় ও মন অবসাদ ও শ্রান্তিতে ভরিয়া উঠে।

(১৩) গেরিল্লারা পথপদর্শকের ছদ্মবেশে শত্রু সৈন্যকে ভুলাইয়া গেরিল্লার লুক্কায়িত ঘাঁটির কাছে আনিয়া ফেলে এবং নিজে দ্রুত অন্তর্হিত হয়—কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই এই দুঃসাহসী গেরিল্লারা সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর হাতে মারা পড়ে। (১৪) অনেক ক্ষেত্রেই গেরিল্লা গুপ্তচরেরা সাধারণ মজুরের ভঙ্গিতে শত্রুর অধীনে কাজ লয় এবং শত্রুর চলাফেরা সম্পর্কে গোপনে খবর সংগ্রহ করে; তারপর আগে আগে সংবাদ দিয়া শত্রু যে গ্রামে ঘাঁটি করিবে সেখান হইতে সকল সাধারণ অধিবাসীদের সরাইয়া দিতে জানায়; গেরিল্লারা স্বচ্ছন্দ মনে সাধারণ অধিবাসীর বেশে দৈনন্দিন কাজকর্ম করিতে থাকে। শত্রু বুঝিতেই পারেনা ইহারা গেরিল্লা কিনা? রাত্রে ক্লান্ত শত্রু সৈন্যেরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমায়, গভীর রাতে পূর্বনির্দিষ্ট সাঙ্কেতিক ধ্বনি শুনিয়া গ্রামবাসীরা (গেরিল্লারা) উঠিয়া শত্রু দলকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়। (১৫) গেরিল্লাদের আর একটি কৌশল প্রায়ই সফল হইতে দেখা গিয়াছে:—কোনও জাপানী শিবিরের কাছাকাছি ক্ষেতে বা খামারে কতকগুলি গেরিল্লাকে মেয়ের পোষাকে চমকপ্রদ ভাবে সাজাইয়া কাজ করিবার অছিলায় বসাইয়া রাখা হয়। জাপানী বোম্বেটে গুলা মদ্যপানে বিভোর হইয়া শিবির হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া পড়ে এবং ঐ মেয়ে গেরিল্লাগুলিকে ধরিতে মাঠের দিকে ধাইয়া চলে। মেয়েগুলিও নাগাল রাখিয়া রাখিয়া আগে আগে ছুটিতে থাকে, যাহাতে খ্যাঁদা-বেটারা ধরি-ধরি করিয়াও ধরিতে পারে না, অথচ পশ্চাদ্ধাবন করিতেও উৎসাহিত হয়। এমনি ভাবে তাহারা গেরিল্লাদের ফাঁদে গিয়া পা বাড়ায় এবং অচিরেই নিঃশেষ হয়। (১৬) ক্ষুধিত শত্রু সৈন্য আকৃষ্ট করিবার জন্য মেওয়াফলের দোকান, হাঁসমুরগী বা ভেড়া, ছাগাদীর প্রদর্শনী শত্রু শিবিরের অদূরে বনের ধারে বা গ্রামের উপকণ্ঠে চীনা গেরিল্লারা সাজাইয়া গুছাইয়া রাখে। যেই মাত্র তাহারা লুঠ করিবার আশায় কাছে যায়, অমনি লুক্কায়িত গেরিল্লার হাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ হাজারো কৌশলে চীনা গেরিল্লারা শত্রুকে ঠকাইয়া থাকে, এবং যে-ই শত্রু তাহাদের একটি কৌশল জানিয়া ফেলে অমনি তাহারা আরও একশটী নূতন ফন্দী মাথা খাটাইয়া আবিষ্কার করে। (১৭) চীনা বালক গেরিল্লারাও শত্রুকে ঠকাইয়া তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে:—যথা,

উত্তর-চীনে জাপানীরা একটি বালককে ধরিয়া বলিল—"যা দেখে এসে বল্ তোদের গেরিল্লা কোন্‌দিকে আছে।" ছেলেটি ফিরিয়া আসিয়া পরম স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে বলিল "পূর্বদিকে"; অথচ দেখিয়া আসিয়াছে পশ্চিমে। তাই শুনিয়া শত্রু পূর্বদিকে অবিশ্রান্ত গোলাগুলী ছুঁড়িতে লাগিল, অনেক পরে সাড়া না পাইয়া মনে করিল—"ছোঁড়া কি মিছেকথা বল্‌লো? কিংবা বোধ হয় গেরিল্লা ব্যাটারা গুলী খেয়ে মরেছে, নয়ত ছেলেটা দেখে আসার পর—ব্যাটারা স'রে প'ড়েছে—তাই উত্তর নেই।" এদিকে কিন্তু যথেষ্ট বারুদ নষ্ট হইল। (১৮) আর এক মজার জিনিষ ঘটে:—রেল লাইনের যে সব জায়গায় গেরিল্লারা ফিস্‌প্লেট খুলিয়া, সেতু উড়াইয়া জাপানী রেল গাড়ী উল্টাইয়া দেয়, সেখানে জাপানী-সৈন্তেরা সদলে গিয়া নিকটস্থ গ্রামে ঢুকে এবং গ্রামবাসীদের ডাকিয়া ভয় দেখাইয়া বলে—"এই দিকের রেললাইনে তোদের পাহারা দিতে হবে, যদি আবার গেরিল্লারা উ'পাত ক'রেছে, তো, তোর একদিন কি আমাদের একদিন।" নিরীহ গ্রামবাসীরা হাতজোড় করিয়া বলে, "হুঁজুর যা' হুকুম ক'চ্ছেন তাই হবে"। এদিকে হাড়ে হাড়ে শয়তানী বুদ্ধি খেলিতেছে: যাইয়া পাহারা দিবার ছলে নিজেরাই বা মূল গেরিল্লাদের সাহায্যে ঠিক সময়টাতে লাইন উপড়াইয়া আগত সৈন্যবাহী জাপানী গাড়ী উল্টাইয়া দিল, পরে গায়ে মুখে মারামারির চিহ্ন লেপিয়া ন্তাকা সাজিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে নিকটস্থ শত্রুশিবিরে খবর যাহা দিল, তাহার সারমর্ম কতকটা এইরূপ, "হুঁজুর সর্বনাশ হয়েছে; বেটা গেরিল্লারা এসে পঞ্চমবাহিনী ব'লে আমাদের মেরে, গাড়ী উল্টে দিয়ে পালাচ্ছে, তবে এখনো পালাতে পারেনি, হুঁজুরদের তাই খবর দিতে এলাম, শিগ্‌গীর আসুন।" জাপানীরা ছুটিল—গিয়া দেখিল কেউ কোথাও নাই। বলিল—"তোরাই একাজ করেছিস্।" চীনা প্রহরীরা শত্রুর পায়ে পড়িয়া দিব্য দিব্যান্তর করিয়া বলিল, "প্রাণে মারুন, কিন্তু দোহাই হুঁজুর অপবাদটি দেবেন না; আপনাদের খেয়ে মানুষ আমরা।" জাপানীরা মনে মনে প্রশ্ন করিল—"সত্যিই কি শয়তানদের তলে তলে যোগাযোগ আছে? নাঃ, এ রকম ক'রে চ'ল্‌বে না। কিন্তু কি-ই বা করা যায়? সবাই মিলে দিকে দিকে এরকম

ব্যাপক ষড়যন্ত্র যদি এরা ক'রতে থাকে, তো গোটা জাতিটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে না দিলে তো উপায় নেই দেখ্‌চি। কিন্তু তাই বা সম্ভব কি করে ?"

গেরিল্লার চানাচুর !

কতকগুলি টুকি-টাকি জিনিষ গেরিল্লারা শিখিবে :—(১) নৌকা চালানো, ঘোড়া ও সাইকেল চড়া, (২) সাঁতার দেওয়া, মোটর গাড়ী ও মোটর সাইকেল চালানো, (৩) দ্রুত গাছে উঠা, (৪) লাঠি খেলা। (৫) মুষ্টি যুদ্ধ ও জুজুৎসুর প্যাঁচ, (৬) ক্রমান্বয়ে ৩।৪ মাইল দৌড়ানো, (৭) ক্রমান্বয়ে ৩০।৪০ মাইল হাঁটিতে পারা, (৮) অন্ধকারে তাড়াতাড়ি চলাফেরা করিতে পারা। (৯) কুকুর, শৃগাল বা পাখীর ডাক নকল করা, (১০) আকাশের কতগুলি নক্ষত্রের নাম ও তাহার অবস্থানের দিক কোথায় জানা, (১১) যে অবস্থাতেই থাকুক আধ মিনিটের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রস্তুত অবস্থায় আসা, (১২) ঝট্ করিয়া শুইয়া পড়িতে পারা, (১৩) বুকে হাঁটিয়া বা হামাগুড়ি দিয়া দ্রুত চলিতে পারা, (১৪) বিনা শব্দে হাঁটিতে ও দৌড়িতে পারা, (১৫) নীচু হইয়া অর্থাৎ গুড়ি মারিয়া তীরবেগে ৫০।৬০ হাত বা আরো বেশী দৌড়াইতে পারা (১৬) দল বাঁধিয়া মুহূর্তে নিকটস্থ বনে বা জঙ্গলে বিনা শব্দে বহুদূর ঢুকিয়া অন্তর্হিত হওয়া, (১৭) ইঙ্গিত মাত্রে মুহূর্তে পুনরায় একত্রিত হইতে পারা, (১৮) হঠাৎ বিমান বা শত্রুর বুলেট হইতে আড়াল লওয়া, (১৯) হঠাৎ বিমান হইতে আত্মগোপন (comouflage) করিতে পারা, (২০) নিখুঁতভাবে ছদ্মবেশ পরিয়া চেনালোকের চোখ এড়াইতে পারা, (২১) চারিদিকে এক নজর চাহিয়াই কোথায় কি আছে বিশদভাবে বলিতে পারা এবং সঙ্গে সঙ্গে (২২) সন্দেহ উদ্রেক না করিয়া জানাশুনা লোকের বাড়ীতে কার্য উপলক্ষ্যে বা ছদ্মবেশে ঢুকিয়া সে বাড়ীতে কয়টা ঘর, কয়টা দরজা, জানালা, গোলা, খড়ের গাদা, জলের কূয়া ইত্যাদি দেখিয়া এবং কয়টি লোক কোন মুখে দাঁড়াইয়া কি কথা বলিতেছে শুনিয়া আসিয়া রিপোর্ট দিতে পারা। (২৩) কৌশলে লোকের মনের কথা টানিয়া বাহির করিতে পারা, (২৪) বিপদে পড়িয়া উপস্থিত বুদ্ধি খাটাইতে

পারা, (২৫) দড়ি বা কাপড় বাঁধিয়া দোতলা বা তেতলা হইতে নীচে নামিতে পারা। (২৬) লোক বা ভারী জিনিষ কাঁধে লইয়া দৌড়াইতে পারা, (২৭) একগাছা দড়ির সাহায্যে মাটি হইতে উপর তলায় উঠিতে পারা, (২৮) লাঠির সাহায্যে পাঁচিল ও বেড়া টপকাইতে পারা। (২৯) একগাছা মোটা দড়ি দিয়া নদীর দুই পারে বাঁধিয়া বাঁধিয়া কৃত্রিম পুল রচনা করিতে পারা, (৩০) কোন জিনিষের দূরত্ব হঠাৎ দেখিয়াই বলিতে পারা, (৩১) বহুক্ষণ না জিরাইয়া কাজ করিতে বা পথ চলিতে পারা, (৩২) খুব কম ঘুমাইয়া কাজ চালাইতে পারা, (৩৩) বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতে পারা, (৩৪) চলিবার সময় ১৫।২০ সের ভারী বোঝা লইয়া চলিতে পারা। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গেরিল্লা স্কাউটের শিক্ষণীয় বিষয় কতকগুলি একত্র করিয়া নিম্নে লেখা হইল :—

(১) গভীর নিঃশব্দতা রক্ষা করিয়া চলা। (২) রাত্রে পাহারা দিবার বা চলিবার সময় শত্রু মাঝে মাঝে হঠাৎ যে তীব্র আলোর সৃষ্টি করে (flash light thrown by enemy) অথবা শত্রুবিমান অন্ধকার রাত্রে লক্ষ্যবস্তু দেখিবার জন্য যে আলোকমালা নিক্ষেপ করে, তাহা হইতে আত্মগোপন ও সতর্কতা অবলম্বন। (৩) রাত্রে চলিবার সময় ঢালু জমির উঁচু মাথার উপর দিয়া (crest line of slopes) বা সমতল জমির 'আইল' দিয়া অথবা টিলা বা ঢিবি কিংবা পাহাড়ের চূড়ার উপরে উঠিয়া না চলা বা দাঁড়াইয়া পর্যবেক্ষণ না করা। (৪) রাত্রে নিজের পিছনে (back ground; খোলা আকাশ বা চাঁদ রাখিয়া না চলা, অর্থাৎ পিছনে গাছ, পাঁচিল, উচু জমি, ঝোপ, বেড়া প্রভৃতি রাখিয়া চলা। (৫) দিনে চলার সময় রৌদ্র এড়াইয়া ছায়ায় ছায়ায় চলা। (৬) দিনে বা রাত্রে ফাঁকা জায়গায় গাছ, পাঁচিল, বেড়া, টিলা, ঢিবির বা ঝোপের পিছনে দাঁড়াইয়া মাথা তুলিয়া মুখ না বাড়াইয়া বা উঁকি না দিয়া বরং এই আড়ালগুলির সম্মুখে আসিয়া হেলান দিয়া বা ঠেসিয়া মিশিয়া দাঁড়ানো অথবা বসা ভালো। (৭) রাতে ঘন অন্ধকারে চলিবার সময় যোগাযোগ রাখিবরে জন্য পরস্পর লাঠি, বর্শা, দড়ি প্রভৃতি ধরাধরি করিয়া আস্তে আস্তে চলিবার কৌশল শিখুন ও শিখাইবেন। ছোট টর্চ লাইট্ পুরু করিয়া লাল

বা হলদে কাগজে ঢাকিয়া পিছনে দেখাইয়া যথাক্রমে বিপদ অর্থাৎ আক্রমণোদ্যত শত্রুর আগমন এবং বিপদ ও নিরাপত্তির মাঝামাঝি অবস্থা, অর্থাৎ নিকটে শত্রুর অবস্থিতি ইত্যাদি অবস্থা জ্ঞাপন করিতে হইবে। (৮) নৈশ অভিযান কালে বিড়ি সিগারেট্ খাওয়া বা আলো জ্বালা নিষিদ্ধ। (৯) দিনে সংবাদ বহন করিতে বা রাস্তা ঘাট জানিতে বাহির হইলে স্কাউট্ সাধারণ গ্রামবাসী গোয়ালা, কলু, জেলে, ময়রা, তাঁতি, ফেরিওয়ালা, লাঙ্গল কাঁধে চাষী, কাঠুরিয়া, গোচারক, ডাক্তার, স্কুল মাষ্টার বা ফকির বোষ্টোম, খোঁড়া অন্ধ বা ভিখারীর বেশ ধরিবে। সাজসজ্জা যেন নেহাৎ স্বাভাবিক হয়। (১০) শত্রু সৈন্যদল কোন্ কোন্ দিকে অগ্রসর হইতেছে, কোন পথে আসিতেছে, কোথায় আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে, কোথায় তাঁবু ফেলিতেছে বা শিবির স্থাপন করিতেছে, কোথায় আক্রমণের আয়োজন করিতেছে, কোন কোন এলাকায় শত্রু সৈন্য গ্রামে ঢুকিয়া রসদ ও সমর্থক সংগ্রহ করিতেছে, কোন কোন স্থানে পঞ্চম বাহিনী ক্রিয়াশীল হইয়া শত্রুকে সাহায্য করিতেছে, কোন কোন স্থানে পুতুল শাসন ব্যবস্থা (Puppet administration) চালু হইতেছে এবং এই সব 'পুতুল' শাসকেরা দেশবাসীকে কি বলিয়া বুঝাইতেছে—তাহাদের স্বপক্ষে কত জন এবং বিপক্ষে কত লোক সেই এলাকায় রহিয়াছে, কোন জমিদার মহাজন বড়লোক জাপ-প্রণয়ী হইল ইত্যাদি এবং ইহা ছাড়া কোন বাড়ীতে বা গ্রামে খাদ্য, যথা আটা, চিনি, চাল, ধানের গোলা, আড়ৎ বা গুদাম আছে, কোন জায়গায় কোন কোন পথ মিশিয়াছে, পথের কোথায় বন-জঙ্গল, নদী, পাহাড়, গ্রাম, মাঠ, শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি আছে; নদী বা খালের কোন বাঁকে কোথায় পারঘাট আছে, কত নৌকা পাওয়া যায়, কোন গ্রামে কিরূপ ও কতগুলি যানবাহন আছে—যথা, ঘোড়া, সাইকেল, গরুমহিষ গাড়ী, পাল্কী, মোটর গাড়ী, বা লরী, নৌকা, ডোঙ্গা বা পান্‌সী ইত্যাদি আছে—এই সব রকমের খবর ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্কাউটকে অবিরত জানিতে হইবে ও নখদর্পণে রাখিতে হইবে। গেরিল্লা বাহিনীকে পথ দেখাইয়া নৈশ অভিযানে লইয়া যাইবার ভারও স্কাউটের এ সব কথা আগে বলা হইয়াছে। (১১) স্কাউট সংবাদ লইবে—

শত্রু সৈন্যরা কত সংখ্যায় দলে দলে ভাগ হইয়াছে, একদল অন্য দল হইতে কতদূরে অবস্থিত; দলটি যখন বিশ্রাম গ্রহণ করে তখন তাহাদের রক্ষী দল কিভাবে পাহারা দেয়; দলের অধীনে কি অস্ত্র ও কত অস্ত্র আছে; পথে চলিবার সময় ইহারা কিভাবে চলে; ইহাদের রসদ ও গোলাগুলী কিভাবে পশ্চাৎ হইতে আনা হয়। (১২) এই প্রকারের নিখুঁত সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইলে দিনের বেলা ছদ্মবেশে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবার অছিলায়—নিতান্ত সাহসে ভর করিয়া শত্রু শিবিরে যাইতে হইবে—সন্দেহ না হইলে হত্যা করিবে না; হয়ত বন্দী করিয়া রাখিবে; রাখুক; সুযোগ বুঝিয়া পলাইয়া আসিয়া খবর দিতে হইবে। (১৩) কখনো বা মজুর সাজিয়া শত্রুর রাস্তাঘাট বা শিবির নির্মাণ কাজে যোগ দিয়া ভিতরের খবর টানিয়া বাহির করিতে হইবে। কখনও ভাল মানুষটি সাজিয়া কাজের তাগিদে স্থানান্তরে যাইবার ভান করিয়া শত্রুর ঘাঁটি, সৈন্য ও রসদ চলাচলের সংবাদ লউন। একই কৌশল একজনে দুইবার বা দুই ব্যক্তি উপর্যুপরি অবলম্বন করিবেন না।

(১৪) রাতেই কি দিনেই কি—সদাই শত্রু মিত্র চিনিবার ক্ষমতা স্কাউটের থাকিবে। দূরে আসিতে দেখিলেই শত্রু বা মিত্র বলিয়া ধরিয়া না লইয়া প্রথমে ভাল করিয়া চিনিতে হইবে; কিন্তু অন্ততঃ ২০০ গজ দূরে থাকিতে আগত লোককে চিনিতে পারা চাই। বিপদের কথা এই যে, পুরোপুরি চিনিবার আগেই লোক দেখিলেই মারিবার আগ্রহাতিশয্যে গুলী করা হয়। ইহা অনভিজ্ঞতার লক্ষণ। চিনিতে দেরী হইতেছে অথচ লোকটি বা লোকগুলি কাছে আসিয়া পড়িতেছে, এরূপ অবস্থায় তাহাদের চেঁচাইয়া থামিতে হুকুম দিয়া নাম ধাম সঙ্কেত বার্তা (Pass word) শুধাইবেন, নতুবা ফাঁকা আওয়াজ করুন অথবা উপরে গুলি ছুঁড়িয়া সাবধান করুন; তবুও অগ্রসর হইতে থাকিলে জানিবেন তাহারা নির্ঘাত শত্রুর লোক।

(১৫) ধরা পড়িলে তৎক্ষণাৎ বুদ্ধি খাটাইয়া আত্মগোপন বা আত্মরক্ষার অথবা শত্রুর সন্দেহ নিরসন করিবার ক্ষমতা স্কাউটের থাকা চাই। এই প্রসঙ্গে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের উপস্থিত বুদ্ধি স্মরণ করুন। বিগত মহাযুদ্ধে শত্রুর হাতে

ধরা পড়িয়া শত্রু শিবিরে আনীত হইলেন। চারিদিকে সতর্ক পাহারা। পকেটে বহুতথ্যপূর্ণ লিখিত কাগজ পত্র ছিল, ধরা পড়িলে রক্ষা নাই ; কিন্তু ব্যাডেন পাওয়েল মাথা ঠাণ্ডা করিয়া বসিয়া আছেন ! খানিক বসিয়া প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন সিগারেট খাইতে পারেন কিনা, অনুমতি পাইয়া পকেট হইতে লিখিত কাগজে তামাক পুরিয়া সিগারেট বানাইয়া একটার পর একটি নিঃশেষ করিলেন এবং যখন কাগজগুলি শেষ হইল তখন নিশ্চিন্তে চাপিয়া বসিলেন। দেহ অনুসন্ধান করিয়া কিছুই না পাওয়ায় বেচারী খালাস পাইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
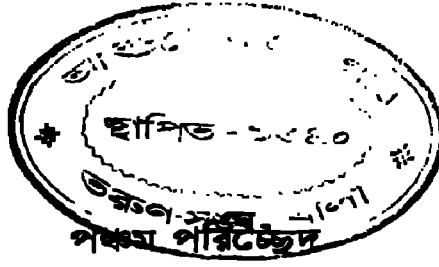
ফিল্ড ট্যাকটিক্‌ (১ম পর্ব) : রণক্ষেত্রের কৌশল

রণক্ষেত্রের কৌশল, নীতি বা কায়দার নাম ফিল্ড ট্যাকটিক্‌। এইগুলির মধ্যে আত্মরক্ষার সর্বপ্রধান দুইটী কৌশলের কথা প্রথমেই উল্লেখ করা যায় —

(১) আড়াল লওয়া (Cover from view and fire or air observation)

(২) আত্মগোপন করা (Camouflaging) বা শত্রুকে ঠকাইবার কৌশল নির্ণয় করা :—

আড়াল লওয়ার কৌশল নির্ভর করে জমির গঠন বা আকৃতির উপর।

জমি চার প্রকারের হইতে পারে :—

(অ) ভাঙ্গা বা অসমতল (Undulating or broken)

(আ) ঝোপ জঙ্গল বিশিষ্ট (Bushy)

(ই) সমতল (Plain)

(ঈ) "মরা" (Dead)

এই চতুর্থ প্রকারের জমি এমন উচু নীচু ও এবড়ো থেবড়ো হয় যে ইহার একদিকের মানুষকে নিকটে থাকিলেও অপরদিক হইতে কেহ দেখিতে পায় না। এরূপ জমিতে স্বাভাবিক এবং বুলেট-দুর্ভেদ্য আড়াল সহজেই মিলে। সমতল জমিতে আড়াল মিলিবেনা, ভাঙ্গা জমি এ হিসাবে ভাল ; খানিকটা আড়াল অন্ততঃ মিলিয়া থাকে যদি শুইয়া পড়া যায়। ঝোপের বিশেষতঃ গাছের পিছনে বেশ আড়াল পাওয়া যাইবে। অতএব এরূপ জমিতে চলাফেরার সুবিধা গেরিল্লাদের হইবে ভাল। দেখিতে হইবে কি কি বিভিন্ন উপায়ে আড়াল লওয়া ও আড়ালে চলা ফেরা করা যায়। নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি মনে রাখিবেন :—

শুইয়া পড়ুন, কিন্তু—

(ক) সূর্য্য বা পরিষ্কার চাঁদের আলোতে শুইবেন না।

(খ) খোলা জায়গায় শুইবেন না।

(গ) জঙ্গলের বা ঝোপের বা দিকে শুইবেন না।

(ঘ) ঝোপ বা জঙ্গলের ভিতরে শুইবেন না।

(ঙ) নড়িবেন না ; আস্তে আস্তে নিশ্বাস লউন।

(চ) ঠিক যেদিক দিয়া অথবা যে জায়গা দিয়া আড়ালের পিছনে বা নীচে ঢুকিয়াছেন সেদিক বা সে জায়গা দিয়া কখনই একবারের বেশী মাথা বাড়াইবেন না। বাহির হইবেন না। শত্রুকে আড়াল হইতে লক্ষ্য করিতে হইলে আড়াল হইতে এক বিন্দুতে বা এক জায়গায় মাত্র একবার মাথা বাড়াইয়া পরক্ষণেই মাথা সরাইবেন ও নামাইবেন। কিন্তু তারপর আবার দেখিতে হইলে মাথা বাহির করিবার জায়গা ছাড়িয়া দিক পরিবর্তন করিয়া আড়ালে আড়ালে অন্যত্র দ্রুত বেগে চলিয়া যান এবং এমন জায়গায় আবার মুখ বাড়ান বা মাথা তুলুন যেখানে শত্রু আপনাকে দেখিবে আশা করে নাই। এই কৌশলকে বলে বিলীন হইয়া যাওয়া (fading out)।

শুইবার ও আড়ালে চলিবার এই কৌশলগুলি মনে রাখিবেন :—

(ক) ছায়ায় শুইবেন (Lie in shade)

(খ) কোন কিছুর পিছনে শুইবেন।

চাঁদ বা সূর্য থাকিলে আড়ালের অপর দিকে আশ্রয় লওয়া দরকার, কেন না সেখানে চাঁদের বা সূর্যের আলোর কিরণ নাই, তাই কোমল আঁধার পাওয়া যাইবে। এবং খোলা আকাশের দিকচক্রবাল (horizon) কে এড়ানো যাইবে, অর্থাৎ আপনার সিলোট বা দেহের কাঠামোর প্রতিচ্ছবিকে লুকাইতে পারিবেন।

(গ) ঝোপ বা জঙ্গলের ডাইন দিকে অথচ পিছনের আড়ালে শুইবেন।

(ঘ) ঝোপের পিছনে শুইবেন—ঝোপের ভিতরে নহে, কেন না বন নড়িয়া উঠিলে শত্রুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

(ঙ) যে দিক দিয়া আড়ালে ঢুকিয়াছিলেন তাহার অন্যদিক দিয়া বাহির হইবেন।

(চ) সমতল ভূমিতে চলিতে হইলে হয় গুড়ি মারিয়া (অর্থাৎ নীচু হইয়া) বিদ্যুৎবেগে দৌড়াইবেন—নতুবা শামুকের মত মাটির সঙ্গে মিশিয়া বুকে হাঁটুন। আড়াল লওয়া দুই উদ্দেশ্যে দরকার :—

(১) শত্রুর দৃষ্টি এড়ানো : (sight cover) ইহা ঠিক আসল ও মজবুত (solid) আড়াল নয়—যেমন ঝোপের পিছনে বা গাছের ছায়ায় শোওয়া।

(২) শত্রুর গুলি এড়ানো—shot cover—ইহা বুলেট ঠেকাইবার পক্ষে যেন যথেষ্ট মজবুত হয়। যেমন গাছের গুড়ি, খাদ বা ট্রেঞ্চ বা পুরু দেওয়াল। দৃষ্টি আড়ালের (sight cover) এর মধ্য হইতে কখনই গুলী ছুড়িবেন না—মাত্র শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করুন। Solid coverএর পেছন হইতে প্রয়োজনবোধে গুলী করিবেন।

গেরিল্লার দ্রুত ও সহজ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা থাকা দরকার। কোনও একটি আড়ালে লুকাইয়া সে ঝটিতি দেখিয়া ঠিক করিবে পরক্ষণেই কাছাকাছি অপর কোন্ আড়ালে যাইয়া আশ্রয় লইতে পারে এবং কোন্ প্রকারের জমি কৌশলে চলা ফেরার পক্ষে উপযোগী হইবে।

আড়াল লওয়ার প্রথম ও সর্ব-শ্রেষ্ঠ কৌশল হইতেছে ঝট করিয়া শুইয়া পড়া। দাঁড়ানো মানুষকে গুলি বিদ্ধ করা সহজ শোয়া মানুষের চাইতে! গুলি বা বোমা-নির্গত লৌহ টুকরা (splinters) প্রভৃতি হইতে নিজেকে বাঁচাইতে হইলে মাটির সহিত উপুড় হইয়া একেবারে দেহ মিশাইয়া মাথাটি বুকসহ ঈষৎ উঁচু করিয়া কানে হাত চাপিয়া পা দুটো ফাঁক্ বা জড়ো করিয়া আরামের কায়দায় শুইতে হইবে। ইহাকে prone positionএ শোয়া বলে।

মাথার সামনে যে কোন প্রকারের একটু আড়াল খুঁজিয়া লইতে হইবে। উঁচু জমি, গাছের ডাল বা গুঁড়ি, একখানা ইট, মরা গরু ঘোড়া বা সৈনিক, অন্ততঃপক্ষে যোদ্ধার কাটা পা হাত আড়াল দিয়া শুইতে হইবে। স্টালিনগ্রাডের

পথযুদ্ধে এমনকি খাটের একটা পায়াও আড়াল স্বরূপে ব্যবহার করা হইতেছে দেখিয়াছি। পরিখা তৈয়ারী করিয়া আড়াল লইলে সবচেয়ে ভাল হয়। কিন্তু (বোমারু) উড়োজাহাজ বোমা ফেলিয়া বা মেসিনগান দিয়া পরিখার লুক্কায়িত সকলকে খতম করিতে পারে, তাই পরিখার মুখ তিনচার হাত অন্তর আঁকিয়া বাঁকিয়া রহিবে, যেন কতকগুলি ইংরাজী জেড্ (Z) অক্ষরের সমষ্টি; পরিখার গভীরতা সাধারণতঃ দুই হইতে চার হাত হইবে। শত্রুর গোলন্দাজবাহিনীর সুতীব্র গোলাবর্ষণ হইতে আত্মরক্ষার্থে পরিখার ভিতরে দেয়ালের গায়ে (যেদিক হইতে গোলা আসিতেছে সেই দিকের দেওয়ালে) শেয়ালে গর্ত (fox hole) খুঁড়িয়া আশ্রয় লইতে হইবে। পরিখা খনন করার ফলে যে মাটি উঠিবে তাহা কখনই পরিখার উপরে পরিখার কাঠামো ধরিয়া জমা করিয়া রাখিতে নাই। রাখিলে হাওয়াই জাহাজ সহজেই পরিখার অবস্থিতি বুঝিয়া ফেলিবে। এবং বোমা ফেলার নিশানা পাইবে। অথচ পরিখার উত্তোলিত মাটি কাজে লাগাইতে হইবে। সামনের শত্রুর গোলাগুলি হইতে আড়ালস্বরূপ বা চলমান ট্যাঙ্ককে হাত বোমা দ্বারা ধ্বংস করিবার জন্য আশ্রয়স্বরূপ উচু করিয়া এই মাটি সাজাইয়া রাখা দরকার। অতএব মাটিগুলি কিছু দূরে জমা করিয়া রাখিতে হইবে। তবে যদি জল দিয়া লেপিয়া পুঁছিয়া বা ঘাস পাতা বা ধান্যাদি বুনিয়া সবুজ রঙে আবৃত করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে মাটিগুলিকে পরিখার উপরেই দুইদিকে বরাবর সাজাইয়া রাখা চলিবে। অনেকে মনে করেন উপর-খোলা পরিখা আবার আশ্রয় কি দিবে? কিন্তু নেহাৎ ঝুপ করিয়া পিঠের উপর বোমা আসিয়া না পড়িলে, এই উপর খোলা পরিখাই লাখো লাখো জীবন বাঁচাইতে পারে। এক কংক্রীট নির্মিত মজবুত বাড়ী ছাড়া যে কোন আশ্রয়স্থল হইতে এই পরিখাগুলি আত্মরক্ষার্থে অনেক উপযোগী। অবশ্য পরিখার উপরে খিলান গাঁথিয়া লতাপাতা বা বালির বস্তা ঢাকিয়া রাখিলে সবচেয়ে নিরাপদ; কিন্তু সকলকে এইরূপ আশ্রয় যোগান কঠিন। আড়ালে আশ্রয় লইবার বহু উপায় আমাদের দেশে রহিয়াছে। চলিবার পথে মাঠের আইল, রাস্তার পাশের খাদ, রেল লাইনের উচুজমি, নদী বা

পুকুরের পাড়, বাঁধ বা গর্ত, নদীর তীরে খেয়া ঘাটের আশে পাশে বাঁধা বা উপুড় করা নৌকাগুলি, বাগানের বা মাঠের খেজুর আম বা জামগাছ উত্তম আড়াল হিসাবে ব্যবহার করা চলিবে। কিন্তু পুনরায় স্মরণ করাইয়া দেই—খানিকটা ঝোপকে কখনও বুলেট হইতে আত্মরক্ষার্থে আশ্রয় মনে করিবেন না। উহা কেবল পর্যবেক্ষণের গোপন জায়গা হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

শুইয়া পড়া যদি আত্মরক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশল হয়, তবে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কৌশল হইল শত্রুর গোলাগুলীর সামনে জড় না হইয়া দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতে জানা। বিশেষতঃ বিমান আক্রমণ ও বিমান পর্যবেক্ষণ হইতে আড়াল লইবার এবং আত্মরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়া। মাঠের মাঝখানে চলিবার সময় যদি হঠাৎ শত্রুবিমাণ আসিয়া পড়ে অথচ দৌড়িয়া আশ্রয় লইবার সময় না থাকে তবে গেরিল্লারা নড়াচড়া বা চলাফেরা বন্ধ করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইবে। যদি দুই চার সেকেণ্ডও সময় মিলে ত ঝট্ করিয়া সেইখানেই ৮।১০ হাত অন্তর ছড়াইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িবে এবং বুক উচু করিয়া তর্জনী আঙ্গুল দুটি দুই কাণে ঢুকাইয়া দাঁতের দুই পাটির মধ্যে নেকড়া গুজিয়া বা হাঁ করিয়া এবং মাথা গুজিয়া মুখ একেবারে নীচু করিয়া অথচ ভূমি সংলগ্ন না করিয়া স্থির হইয়া কাঠের মত শুইয়া থাকিতে হইবে। যদি আরও একটু সময় মিলে ত ৪০।৫০ হাতের মধ্যে যে খাদ, গর্ত, ঢিপি, জমি, ঝোপ বা গাছের ছায়া যাহা পাওয়া যায় দ্রুত সেখানে দৌড়াইয়া পূর্বোক্তবৎ শুইয়া পড়িতে হইবে। যখন শত্রুকর্তৃক দেশ আক্রান্ত হইয়াছে এবং আপনার এলাকায় সাইরেন নাই, সে ক্ষেত্রে বিমান দেখিলেই ধরিয়া লওয়া ভাল যে তাহা শত্রুবিমান; কেন না সকলে শত্রু ও মিত্রের বিমানের পার্থক্য বুঝিতে পারে না। বিশেষতঃ অনেক সময়ে শত্রু তাহার বিমানগুলিকে মিত্রপক্ষীয় বিমানের চিহ্ন আঁকিয়া সুহৃদ সাজিয়া প্রতারণা করে। অতএব গেরিল্লাদের নিয়ম হইবে বিমানের শব্দ পাওয়ামাত্র আশ্রয় লওয়া। বিমানের চোখে আত্মগোপন করার যে কতখানি প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা সহস্রবার বলিয়াও শেষ করা যায় না। শত্রুবিমান

সবসময়েই যে বোমা ফেলিতে আসে তাহা নয়। গেরিল্লা আক্রমণের খবর বেতারে জানিয়াই ঘাঁটি হইতে দশ কি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শত্রুবিমান খুঁজিয়া যায় কোন্ জায়গায় গেরিল্লারা ঘাঁটি গাড়িয়াছে বা আক্রমণ করিয়াছে। নিকটস্থ গ্রাম ও নগর প্রভৃতির জনসাধারণ কিভাবে তখন চলাফেরা করিতেছে। গেরিল্লারা আক্রমণ করিয়া কোন পথ ধরিয়া কোন দিকে চলিতেছে এবং কোথায় আশ্রয় লইতেছে ইত্যাদি। অবশ্য গেরিল্লারা সাধারণতঃ রাত্রে আক্রমণ করে বলিয়া তখনই অন্ধকারে তাহাদিগকে খোঁজ করা শত্রু বিমানের পক্ষে অসম্ভব হয়। কিন্তু পরদিন সকালেই দেখা যাইবে আক্রান্ত ঘাঁটির চারিদিক বেড়িয়া গ্রামের পর গ্রাম ব্যাপিয়া শত্রু বিমান পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছে। এরূপ অনুসন্ধানের ফলে যদি গেরিল্লাদের গতিবিধি ধরা পড়ে তো রক্ষা নাই, সেই গ্রাম বা নিকটস্থ জনপদগুলি যথাসময়ে এলোপাথারি বোমা খাইবে। সুতরাং গেরিল্লারা রাত্রে শত্রুকে আক্রমণ করিয়া নিজেদের সাফল্যের গর্বে আত্মহারা হইয়া পরদিন নিজস্ব গতিবিধি যেন শত্রুবিমানের কাছে প্রকাশ করিয়া না ফেলে। মনে রাখিবেন, কোন গাছ দেওয়াল বেড়া বা বাড়ীর ছায়ায় থাকিলে বিমানচালক এক হাজার ফিট্ উপর হইতেও নজর করিতে পারে না। বিমান মাথার উপর ঘুরিতে থাকিলে গেরিল্লারা বনজঙ্গল বা গাছের আড়াল ছাড়িয়া পথে বা মাঠে পা বাড়াইবে না।

(২) আত্মগোপন (camouflage) বা কৃত্রিম উপায়ে শত্রু ঠকানো

এতক্ষণ আমরা আড়াল লওয়ার কথা আলোচনা করিয়াছি। অবশ্য আড়াল লওয়া মানে আত্মগোপন করা। কিন্তু ইংরাজি ক্যামোফ্লেজ কথা অর্থে আত্ম-গোপন শব্দ ব্যবহার করিলে বলা যায়—আত্মগোপন মানে এমন সব কৌশল অবলম্বন করা যাহাতে শত্রু পাশ দিয়া চলিয়া গেলেও আমার অস্তিত্ব টের না পায়। গেরিল্লার এই প্রকার আত্মগোপনের সমস্যাটি অপেক্ষাকৃত সহজ; কেননা বড় বড় কামান, যানবাহন, তাঁবু, গুলিগোলার আড্ডা, কারখানা, রেলগাড়ী, বিমানঘাঁটি

প্রভৃতি গোপন করিবার সমস্যা তাহার নহে ; তাহার সমস্যা ব্যক্তিগত আত্মগোপন ; এই হিসাবে প্রত্যেক গেরিলা এমন রঙের পোষাক পড়িবে যাহা পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক শোভার সঙ্গে এক হইয়া মিশিয়া যাইবে, রাত্রে কালো রঙ ও দিনে ধূসর অর্থাৎ খাকী অথবা সবুজ রঙ সবচেয়ে বাঞ্ছনীয়। নিউগিনির জঙ্গলে জাপ ও অষ্ট্রেলিয়ার ফৌজের যে লড়াই চলিতেছে, তাহাতে দেখা যায় জাপানীরা এমন নিখুঁতভাবে গাছের পাতার রঙে রঙ মিশাইয়া বা শেওলা ধরা গাছের গুড়ির রঙে রঙ মিশাইয়া আত্মগোপন করিয়া থাকে যে মাত্র দুই গজ দূর হইতে তাহাদের চেনা যায় না।

এই সম্পর্কে গেরিলারা কয়েকটি কাজ করিবে :—শাদা, নীল, লাল বা হলুদ রঙের পোষাক পড়িবে না। ধূসর, সবুজ এবং কালো রঙ বাঞ্ছনীয়। ময়লা কাপড় পড়িয়া খালি পায়ে রাত্রে চলাফেরা করা ভাল। আরও ভাল হয়, বিশেষতঃ শীতের দিনে, যদি প্রত্যেকে একখানি থলে (ছালা বা বোরা—gunny bag) সঙ্গে লইয়া বাহির হয়। যেই বিমান দেখা অমনি মুড়িয়া ঢাকিয়া বসা। দিনের বেলায় হাত, পা, গা, মুখ প্রভৃতি খুলিয়া রাখা একেবারে নিষিদ্ধ। যদি বিমান হইতে আত্মগোপন করিতে হয় সবুজ বা খাকী রঙের গামছা বা লুঙ্গি সঙ্গে সর্বদা রাখা ভাল। ইহা ছাড়া খোলা পথে চলাফেরার সময়ে প্রত্যেক গেরিলা মাথায় লতাপাতা বা ঝোপ বাঁধিয়া চলিবে। অথবা দিনমানে মাথার কালোচুল ঢাকিবার জন্য ধূসর রঙের রুমাল বা গামছা বা ধূলিধূসরিত ছেঁড়া কাপড় মাথায় বাঁধিবে। প্রত্যেকে পুরু ও ঘন একগোছা তৃণগুল্ম, ঝোপ বা কনকসুন্দা, সোনালী সেওড়ার গাছ বা আম, জাম কাঠালের ভাঙ্গা ডালপালা হাতে করিয়া পথ চলিবে। বিমান আসিলেই বা সামনে শত্রু আসিতেছে বুঝিলেই ঝুপ করিয়া শুইয়া বা বসিয়া ঐ ডালপালা দিয়া নিজেকে ঢাকিতে হইবে। এই সময়েও ছড়াইয়া পড়া দরকার। তবে যদি সময় না মিলে তবে একই সঙ্গে ভেড়ার পালের শীতের রৌদ্র পোহানর মত গাদাগাদি করিয়া ঝোপগুলি মাথায় ধরিয়া একটা ছোট জঙ্গলের সৃষ্টি করিয়া বিমানকে ঠকাইবে। এমন কি ছড়াইয়া শুইয়া পড়িলেও নিজের মাথায় ও গায়ে ঐ গাছপালাগুলি বিছাইয়া আত্মগোপন করিবে।

বিমান হইতে মানুষের মুখ ও খোলা হাত পা বেশ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। আর চলমান প্রাণীকে প্রাণী বলিয়া ধরা যায়। হাত ও গায়ে কাদা, রঙ বা গোবর মাখিবে। মুখ লুকাইবার সহজ উপায় মুখের আদল বা কাঠামোকে বিকৃত করা। গায়ে হাতে বা মুখে একটানা রঙ মাখা উচিৎ নয়, আধ খানা মুখ কোনাকুনি ঢাকিয়া বা কালো রঙ (আলকাতরা বা মসিনার কালী দিয়া) বা কাদা বা গোবর দিয়া বিকৃত করিলেই মুখের আদল ধরা পড়ে না। অপরপক্ষে আত্মগোপনের সব কৌশল অবলম্বন করিয়াও যদি নড়াচড়া করা যায় তো ধরা পড়িতে দেরী লাগিবে না। মনে করুন মাথায় বা মাথার উপরে লতা জড়াইয়া শরীর ঝোপে ঢাকিয়া মাঠের বা রাস্তার উপর দিয়া চলিতে শুরু করিলাম। তখন উপরের বিমানচালক বা সামনের জমীর উপরে পর্যবেক্ষণকারী শত্রু ভাবিবে "একি! গাছপালা বা তৃণগুল্মকে তো কখনও চলিতে দেখি নাই। নিশ্চয়ই মানুষ, মারো"। আমরা ভলান্টিয়ার বাহিনীর শিক্ষাকালে স্কাউটিং বা দৌত্যকার্য শিখাইতে গিয়া নবাগত অনভিজ্ঞ শিক্ষানবীশের এই ভুল প্রায়ই লক্ষ্য করিয়াছি। উপরোক্ত কৌশলগুলি আত্মগোপনের কৌশল। এই কৌশল অবলম্বনের উদ্দেশ্য শত্রুর চোখে ধূলি দেওয়া ; কিন্তু শত্রু যদি একবার চিনিতে পারে তাহা হইলে এই আত্মগোপনের কৌশলে আত্মরক্ষা হয় না। সে ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার উপায় হইতেছে আড়াল লওয়া অর্থাৎ কার্যকরী (solid) আড়াল। বেসামরিক লোকজন বা গেরিল্লাদের পক্ষে বিমানের বোমার তুলনায় তাহার মেসিনগানের গুলীবর্ষণই বেশী ভীতিপ্রদ হইয়া দেখা দেয়। সে ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য পরিখা, গর্ত, খাল, নালা, উচু নীচু ঢালু জমী প্রভৃতির আশ্রয়ে কি করিয়া আড়াল লইতে হয় উপরে তাহা বলা হইয়াছে।

ব্যক্তিগত (Personal camouflage) আত্মগোপনের সঙ্গে প্রসঙ্গতঃ মনে রাখিতে হইবে যে, হাতে অস্ত্র থাকিলে যেমন রাইফেল, তরোয়াল প্রভৃতি ইস্পাতের জিনিষ যাহা আলোতে, এমন কি অন্ধকারেও ঝকমক্ করিয়া উঠে, তাহা গোপনের উপায় স্থির করিতে হইবে। রাইফেল বা হাতিয়ারকে পেঁচাইয়া পেঁচাইয়া কাল রঙে লেপিবেন অথবা কালো বা পাঁচরঙ্গা ফিতা দিয়া জোড়া কাটিবার মত ফাঁক ফাঁক

করিয়া বেড়িয়া বাঁধুন। সবচেয়ে ভাল হয় যদি এইরূপে লতা ও শেওলা জড়াইয়া রাখেন।

আত্মগোপন বা ক্যামোফ্লেজের আর একটি কথা গেরিল্লাদের স্মরণে রাখিতে হইবে। সকলেই জানে যে গেরিল্লারা গ্রাম বা নগর ছাড়িয়া সাধারণতঃ ঘন বনে তৃণসমাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বা পর্বতের গভীর গহনে ঘাঁটি গাড়িয়া থাকে। কোথায় তাহাদের হেড্‌কোয়ার্টার্স থাকে তাহা বলা কঠিন, কিন্তু এই সকল দুর্গম স্থানে তাহারা যাতায়াত করে। রসদ, গুলী, গোলা এবং ধৃত বা লুণ্ঠিত হাতিয়ার প্রভৃতি তাহারা সঞ্চয় করে। তাই শত্রু এবং শত্রুর গুপ্তচরেরা সদাই এই ঘাঁটিগুলির সন্ধানে ফিরে। বিমান হইতে পর্যবেক্ষণ এই সন্ধান কার্যে বিশেষ সহায়তা করে। প্রায়ই যাওয়া আসার ফলে উক্তপ্রকার ঘাটিগুলির উপকণ্ঠ পর্যন্ত—এমন কি গুপ্ত এলাকার গভীর অভ্যন্তর পর্যন্ত—পায়ে চলা রাস্তার দাগ পড়িয়া যায়। উপরে বিমান হইতে ঐগুলি সূতার মত দেখায়, কিন্তু বেশ স্পষ্ট ভাবেই দেখা যায়। এই সূতার মত দাগে দাগে মিলাইয়া রাস্তার আগাগোড়া সবটাই ইলেক্‌ট্রো ফটোগ্রাফে ছাকিয়া লওয়া হয় এবং এই ফটোগ্রাফ মিলাইয়া বোমারু বিমান বোমাবর্ষণ, মেসিনগান প্রভৃতি চালায়। কিন্তু তাহার চেয়েও বড় কথা স্থলসৈন্যবাহিনী পাঠাইয়া এই ঘাঁটিগুলি ঘেরিয়া ফেলিয়া গেরিল্লাদের ধ্বংস বা বন্দী করা যায়। এই বিপদ এড়াইবার পথ হইল ক্যামোফ্লেজের সাহায্যে পথের সঠিক খবর হইতে শত্রুকে বঞ্চিত করা বা বেঠিক খবর দিয়া প্রতারণা করা।

উপায় হইল, খোলা মাঠ দিয়া ঘাঁটিতে পৌছিতে হইলে সাধারণতঃ নূতন রাস্তা তৈয়ারী না করিয়া বর্তমান পথরেখাগুলি ব্যবহার করাই সমীচীন—যথা দুই শস্য ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী আইল, খাদ, লাঙ্গল-খনিত প্রণালীগুলি। এই গুলির উপর দিয়া চলিলে একটানা খুব সরু একটি রাস্তার দাগ পড়িবে সত্য, কিন্তু ইহা এই আইল প্রণালী বা খাদের সঙ্গে এক হইয়া মিলিয়া যাইবে। ইহা ছাড়া চারিদিকে ছড়াইয়া-পড়া বহু সুস্পষ্ট রাস্তার চেয়ে এই প্রকার একটি সরু রাস্তা বিমান চালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে কম।

লক্ষ্য রাখিবেন চলিবার রাস্তা যেন হঠাৎ শেষ হইয়া গেরিল্লা এলাকার প্রান্তে একটি বিন্দুতে গিয়া না মিশে। কেননা এইরূপ ঘটিলে বেশ বোঝা যাইবে যে ঐ বিন্দুটির নিকটেই ঘাঁটি বা উহারই আশে পাশে মাল আছে। এক্ষেত্রে শত্রুকে ঠকাইতে হইলে রাস্তাটি বাড়াইয়া একটি মিথ্যা রাস্তা বানাইতে হইবে যাহা চলিয়া মাঠ বা বনের অপর প্রান্ত পর্যন্ত যাইয়া অন্য রাস্তার সঙ্গে খাপ খাইয়া মিলিয়া যায়। এই মিথ্যা রাস্তা বজায় রাখিতে হইলে তাহার উপর চলিতে হইবে বা মাঝে মাঝে কোদাল শাবল প্রভৃতির সাহায্যে পরিষ্কার করিয়া খাঁড়িয়া দিতে হইবে। অনেক সময় আসল রাস্তা দু একদিন অন্তর চষিয়া খুঁড়িয়া অস্পষ্ট করিয়া দিয়া অন্যদিক দিয়া রাস্তা বানাইয়া রাখিতে হইবে। আবার আসল রাস্তাটি সঠিক ঘাঁটিতে লইয়া যাইবার আগে যে বিন্দুতে বন বা পাহাড়ের উপকণ্ঠে তাহা মিলিবে, ঠিক সেই বিন্দু হইতে একটি মিথ্যা রাস্তা বানাইয়া অন্যদিকে লইয়া যাইতে হইবে যেন ঐ রাস্তাটি পূর্বোক্ত বিন্দুতে শেষ না হইয়া বাঁকিয়া বনের বা পাহাড়ের কোল ঘেঁসিয়া ভিন্নগ্রামে চলিয়া যায়।

এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে: বনের উপকণ্ঠে মাঠের যে রাস্তা শেষ হইয়া ভিতরে ঢুকিল তাহা যদি গাছপালার ঘন পাতায় ঢাকা থাকে তবেই বিমান হইতে দেখা যাইবে না, কিন্তু তবু উপর হইতে গাছের ফাঁকে ফাঁকে রাস্তাকে বিন্দুচিহ্নিত (dotted line) রেখার মত দেখাইবে। এবং যখন শীতের শেষে গাছের পাতা সাধারণতঃ ঝড়িয়া পড়ে তখন ত এই রাস্তাকে বিমান হইতে স্পষ্টই দেখা যায়। কাজেই জঙ্গলের মধ্যের রাস্তাকেও নিরাপদ মনে না করিয়া ক্যামোফ্লেজ করিতে হইবে। এ বিষয়ে উপরের নির্দেশই খাটিবে। পাহাড়ে ঘাঁটি করিলেও উপরের সাধারণ নির্দেশ জানিয়া চলা দরকার। ঘাঁটিতে অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার কৌশল হইল গাছের ছায়ায় রাখা বা গর্তে বা জমির উপর রাখিয়া লতাপাতা দিয়া ঢাকিয়া বা অন্য উপায়ে চারিপাশের রঙের সঙ্গে রঙ মিশাইয়া দেওয়া।

ক্যামোফ্লেজ বা আত্মগোপনের উদ্দেশ্য শত্রুর দৃষ্টি এড়ানো, কিন্তু এই আত্ম-গোপনের কৌশল যদি অসম্পূর্ণ হয় বা বুদ্ধি খাটাইয়া করা না হয় তো অবস্থা

হইবে উট্‌পাখীর মত—বালুতে মুখ লুকাইয়া মনে করিতেছে শরীরের সবটাই ঢাকিয়াছে।

আত্মগোপনের প্রয়োজন প্রধানতঃ আত্মরক্ষার্থে, কিন্তু আক্রমণমূলক কার্যেও এই আত্মগোপন বা ক্যামোফ্লেজ-কৌশল কম সহায়ক নহে। গেরিল্লারা সদাই অতর্কিত আক্রমণ করিয়া শত্রুকে বিস্ময়াবিষ্ট ও ভয়বিহ্বল করিয়া দেয় এবং সে কার্য প্রকৃষ্ট উপায়েই হইতে পারে যদি আত্মগোপনের ফলে চোখ এড়াইয়া শত্রুকে তাহার অপ্রত্যাশিত স্থানে বা অসময়ে হঠাৎ আক্রমণ করা যায়।

ফিল্ড ক্রাফ্‌ট্‌ (Field craft) দ্বিতীয় পর্ব

(1) Distance judging—দূরত্ব নির্ণয়

(2) Path finding—দিক্‌ ও রাস্তা নির্ণয়

দূরত্ব নির্ণয় :—হাতবোমা, রাইফেল, বন্দুক, তীরধনুক, বল্লম, সড়কী বা অপর যে কোন হাতিয়ারই ব্যবহার করি না কেন, লক্ষ্যবস্তু হইতে নিজের দূরত্ব নির্ণয় করিতে পারা চাই। যে হাতিয়ারের পাল্লা ৫০।৬০ (যেমন তীর, হাতবোমা) অথবা ৩০।৪০ হাত (যেমন বর্শা, সড়কী ইত্যাদি) তাহা ছুঁড়িতে লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করা তেমন কিছু সমস্যার বিষয় নহে। কিন্তু হাতিয়ারের পাল্লা যতবেশী হইবে (যেমন ১০০।২০০ হাতপাল্লার শিকারী বন্দুক, ৫০০।৬০০ গজ পাল্লার রাইফেল বা টমিগান ইত্যাদি) বিষয়ে অধিক দূরত্ব নির্ণয়ের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অভ্যাসের দ্বারা ও অভিজ্ঞতার ফলে দূরত্ব বোঝা যায়। দূরত্ব নির্ণয়ের দুইটি সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করা যাইতে পারে।

হাতখানা সম্মুখে প্রসারিত করিয়া বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ মাটির সমান্তরাল রাখিয়া দূরের কোন ঘর বা দালানের দিকে ধরিতে হইবে। এখন এক চক্ষু বুজিয়া লক্ষ্যণীয় হইতেছে আঙ্গুলের এবং ঘরখানির পারস্পারিক প্রস্থ। হাতের দৈর্ঘ্য এবং আঙ্গুলের প্রস্থ প্রতি লোকের ভিন্ন ভিন্ন থাকাতে প্রত্যেককে নিজ নিজ অনুযায়ী অনুমাণ করিতে

শিখিতে হইবে। ধরুন—আমার আঙ্গুল যখন ঘরখানিকে ঠিক পুরাপুরি ঢাকিয়া ফেলে তখন তাহার দূরত্ব হয়ত ২৫০ গজ।

দ্বিতীয় পন্থা হইতেছে একই ভাবে হাত প্রসারিত করিয়া বৃদ্ধ অঙ্গুলিকে উর্ধ্বমুখী করিতে হইবে। প্রথমে ডান বা বাম চোখ বুজিয়া ঘরের লাইনে আঙ্গুলকে রাখিব এবং সেই অবস্থায় হাত স্থির রাখিয়া আর এক চোখ বুজিয়া দেখিব আমার আঙ্গুলটি এবার ঐ ঘর হইতে কতদূরে সরিয়া গেল। দেখা যাইবে ঘরখানি যতদূরে বা কাছে থাকিবে ততই সেই অনুযায়ী আমার আঙ্গুলটি বেশী বা কম সরিয়া যাইবে। লক্ষ্য যত নিকটে আঙ্গুল তত কম সরিবে এবং লক্ষ্য যতদূরে থাকিবে ততই আঙ্গুল বেশী সরিয়া যাইবে। আঙ্গুল ও ঘরের এই পারস্পারিক সম্বন্ধ দিয়া দূরত্ব অনুমাণ করা সম্ভব। (New ways of war—Wintringham)

দূরত্ব নির্ণয়ের আরও কয়েকটা কৌশল আছে। নীচে সেইগুলি উল্লেখ করা হইল ঃ—

(ক) Appearance Method—কোন একটি নির্দিষ্ট উল্লেখ-বিন্দু, (Reference point) যেমন, কোন বড় গাছ বা বাড়ী কতদূরে আছে জানা চাই। সেই অনুপাতে লক্ষ্য বস্তুর দূরত্ব আন্দাজ করিতে পারা যায়। এই উল্লেখ-বিন্দু সাধারণতঃ লক্ষ্যবস্তুর সঙ্গে একই অভিমুখে এবং প্রায় একই লাইনে থাকা চাই।

(খ) Bracketing method—নিজের দাঁড়াইবার জায়গা হইতে লক্ষ্যবস্তুকে নিকটতম দৃষ্টি কোণ (point of view of shortest possible range) দিয়া দেখুন এবং দূরত্ব আন্দাজ করুন—যথা ৫০০ গজ; আবার ঠিক সেই জায়গা হইতেই দূরতম দৃষ্টিকোণ (point of view of greatest possible range) দিয়া লক্ষ্যবস্তুকে দেখুন এবং দূরত্ব আন্দাজ করুন যথা—৮০০ গজ; তাহা হইলে ঠিক দূরত্ব হইবে $\frac{৫০০+৮০০}{২}$ ৬৫০ গজ। দূরত্ব ঠিক করিবার এই কৌশলটি সাধারণতঃ বহুদূরের লক্ষ্যভেদ করিবার পক্ষে উপযোগী।

(গ) Key ranging—একটি বিশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি বা বিন্দু যাহা লক্ষ্যবস্তুর সঙ্গে একই লাইনে নহে অর্থাৎ আড়াআড়ি আছে, তাহার দূরত্বকে মাপিবার ইউনিট্ বা মাপকাঠি স্বরূপে লইয়া লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব ঠিক করুন, নীচে ছবি দেওয়া হইল।
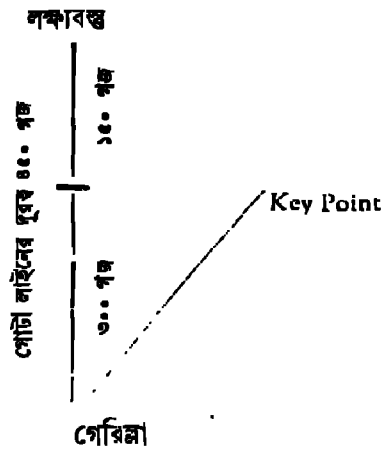
(ঘ) Observation of fire—দাড়াইয়া বন্দুক বা রাইফেল ছুঁড়িয়া লক্ষ্য করুন কোথায় গিয়া বুলেট পড়িতেছে। এবং সেই বুলেটবিদ্ধ স্থান হইতে লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব তুলনা করিয়া লইয়া মোট দূরত্ব ঠিক করুন। এই কৌশল সর্বাপেক্ষা সহজ ও কার্যকরী হয় রাত্রে। রাইফেলের বুলেট কোথায় যাইয়া বিঁধিতেছে ধরা যাইবে রাইফেলে নির্দিষ্ট রেঞ্জ বা পাল্লা দেখিয়া; আর বন্দুকের পাল্লা তো সাধারণ ভাবে ১০০ হইতে ২৫০ গজ হয়। অতএব মোট দূরত্ব ঠিক করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া যাইবে।

রাত্রে দূরত্ব নির্ণয়ের নিম্নলিখিত কৌশলটি শিখা যাইতে পারে:—একজনকে সামনে যতদূর খুসী চলিয়া যাইতে বলুন। কিন্তু যে মুহূর্তে লোকটি দৃষ্টির বাইরে গেল অমনি পূর্বনির্দিষ্ট সংকেতানুসারে থামাইবেন। সে কত কদম গিয়াছে জিজ্ঞাসা করুন। লোকটিকে ছাড়িয়া দিন। যে দিকে সে যাইতেছিল সেই দিকে অন্ধকারে খানিকটা

আগাইয়া দিয়া আবার ঠিক একই রাস্তায় ফিরিয়া আসিতে তাহাকে বলুন। আসিতেছে এমন সময়ে ঠিক যে মুহূর্তে তাহাকে দেখা যাইবে, ব্যস, থামিতে বলুন। তারপর সে সেই বিন্দু হইতে হাঁটিয়া আসিয়া সর্বপ্রথম যেখান হইতে রওনা হইয়াছিল সেইখানে থাকুক এবং ইহাতে তাহার কত কদম হাঁটিতে হইল বলুক। আগের ও পরের গণনা মিলাইয়া দেখুন কত দূর হইতে অন্ধকারে মানুষকে দেখা যায়। অবশ্য পায়ে হাঁটিবার পাল্লা বা মাপ যেন ঠিক থাকে। এইভাবে কত দূর হইতে চাঁদনি রাতে বা নৈশ আকাশের পটভূমিকায় আগুয়ান কোন লোক বা শত্রুকে দেখা যায় এবং ঠিক কতখানি আগাইলে তাহাকে বন্দুকের পাল্লায় পাইব তাহা শিখিতে হইবে। আর কতদূর হইতে সিগারেটের বা বিড়ির বা প্রজ্বলিত দেশলাই অথবা মুখঢাকা টর্চের আলো দেখা যায় তাহা পরীক্ষা করিয়া মনে রাখিতে হইবে।

দূরত্ব নির্ণয়ের শিক্ষা যখন দিবেন তখন স্কোয়াড দাঁড় করাইয়া প্রত্যেককে কোন লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব আন্দাজ করিতে বলুন এবং তাহার নাম এবং উত্তর লিখিয়া রাখুন। প্রত্যেককে এইরূপে জিজ্ঞাসা করার পর আসল দূরত্ব নিজে মাপিবেন বা মাপাইবেন। ইহা হইতে ধরা পড়িবে কাহার আন্দাজ কতখানি সত্য হয়। একব্যক্তি প্রায়ই যদি মোটামুটি ঠিকভাবে দূরত্বের আন্দাজ করিতে পারে তো বুঝিবেন তাহার দূরত্ব সম্পর্কে সাধারণ ধারণা বা জ্ঞান ভালই আছে। এইভাবে রোজ ১৫।২০ মিনিট শিখাইবার ফলে এক সপ্তাহেই অনেকের দূরত্ব নির্ণয়ে পারদর্শিতা জন্মিবে।

দিক ও পথ নির্ণয়ঃ (Path or position finding, including map reading) :—কোন লক্ষ্যস্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে বা সেখানে যাইয়া পৌঁছিতে হইলে প্রথমতঃ সেইস্থানের ম্যাপ অথবা তাহার পারিপার্শ্বিক ভৌগলিক পরিচয় জানিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ দিক সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যেখানে যখন সেকশন্ কমাণ্ডার পৌঁছিবেন সেখানে নিজে বা আর কাহাকেও সঙ্গে নিয়া পায়ে হাঁটিয়া রাস্তাঘাট ও বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য জিনিষগুলি দেখিয়া একখণ্ড কাগজে স্থানীয় একখানা পরিষ্কার ম্যাপ আঁকিবেন।

ইহাতে ম্যাপ পরিচয়ের জ্ঞান বাড়িবে। সেক্শনের প্রত্যেককে ম্যাপ আঁকিতে এবং চিনিতে সুযোগ দিতে হইবে। যথা, সেই ম্যাপের একখানি খসড়া (copy) সরবরাহ করিয়া নিজেদের দলের কাহাকেও (যে স্থানীয় রাস্তাঘাট কিছুই দেখে নাই) কোন নির্দিষ্ট বাড়ী বা দ্রব্য বা স্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে দেওয়া হউক। ম্যাপের খসড়া দেওয়া মানেই লক্ষ্য স্থানের বা লক্ষ্য বস্তুর দিক্ বর্ণনা করিয়া দেওয়া; কিন্তু ম্যাপে দিক্ বর্ণনা করা থাকিলেও আসলে যেখানে রহিয়াছি বা যে জায়গা দিয়া যাইতেছি সেই জায়গাগুলি যদি অপরিচিত হয় তবে কোন্ দিকটি উত্তর, কোন দিকটি দক্ষিণ বা পূর্ব বা পশ্চিম স্থির করা কঠিন। আর দিক না জানিতে পারিলে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া যায় না।

এইরূপ দিক্ দর্শন করিতে হইলে (১) লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হয়, (২) দিগদর্শন যন্ত্রের সাহায্য লইতে হয়, (৩) সূর্য বা চন্দ্র উঠিবার ও অস্ত যাইবার অভিমুখ লক্ষ্য করিয়া—মাসের নাম ও ঘড়িতে সময়ের হিসাব অনুমান করিতে হয়, (৪) নক্ষত্রের অবস্থান জানিয়া রাখিয়া বিশিষ্ট নক্ষত্র (যেমন ধ্রুবতারা, সপ্তর্ষিমণ্ডল, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, কালপুরুষ, বৃশ্চিকরাশি বা প্রভাতী তারা ইত্যাদি) লক্ষ্য করিতে হয়, (৫) ঝড় বা বায়ুর গতি পর্যবেক্ষণ করিতে হয়। (৬) দূর দূরান্তরের রাস্তায় দিক্‌ভ্রম হইলে কতকগুলি বিষয় মনে রাখিলে কাজ হাসিল হয়, যথা (অ) স্থানীয় গ্রামঘরের কতকগুলি সাধারণ বস্তুর নাম, (আ) স্থানীয় লোকের ভাষা, মাটির রং, দেশভাগের ভৌগলিক গঠন, (ই) গাছপালা বা শাকশব্জী ও ফসলের বিবরণ।

সম্মুখের কয়েক মাইলের মধ্যে অবশ্য রাস্তা বা দিক ঠিক করিয়া লওয়া সহজ। এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন উঁচু গাছ বা গির্জা বা মন্দির মসজিদ্ অথবা চৌরাস্তা ইত্যাদির সাহায্য কার্যকরী হইয়া থাকে। এইরূপ গাছ বা বাড়ী বা রাস্তা চলমান গেরিল্লার উল্লেখ-বিন্দু হিসাবে (Reference points) কাজে আসিবে। অর্থাৎ ইহাদিগকে নজরে রাখিয়া রাস্তা বা জায়গার মোড় অথবা দিক ঠিক করিয়া লওয়া যাইবে। তবে গেরিল্লার আসল সম্বল স্থানীয় লোকের সহায়তা।

নিঃশব্দে চলিবার কায়দাঃ—দস্যু তস্কর ব্যতীত সাধারণ অধিবাসীরা শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে স্বাধীনভাবে নিঃসঙ্কোচে চলিতে ফিরিতে অভ্যস্ত। নিঃশব্দে ও লুকাইয়া চলিবার কৌশল তাই তাহাদের কাছে বাহুল্য ও উপেক্ষণীয় বিষয় মনে হইতে পারে, কিন্তু শত্রু যখন আমাদের নিজের "জমি জরু গরু" অপহরণ করিতে দুর্বার গতিতে আসিয়া পড়িল তখন তাহাদের রুখিবার সব কিছু কৌশলই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব সাধারণতঃ শান্তিকামী ও স্বাধীন হইলেও যুদ্ধের খাতিরে দুষমণকে আঘাত হানিবার প্রয়োজনে আমাদিগকে অস্বাভাবিক জীবন যাপন করিতে শিক্ষা করিতে হইবে।

গেরিল্লারা নেহাৎই সাধারণ মানুষ, তাহারা সাধারণ কাজ করিতেই অভ্যস্ত। গোপনে চলাফেরার অস্বাভাবিক কৌশল তাই তাহাদের চেষ্টা করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে।

গেরিল্লা আক্রমণ সাধারণতঃ রাত্রেই হইয়া থাকে। সুতরাং অন্ধকারে নিঃশব্দে চলিতে শিক্ষা করা বিশেষ করিয়া দরকার।

প্রথমে কোন হাতিয়ার না লইয়া একা একা চলিতে শিখুন, তারপর অনেকে এক সঙ্গে, আবার একা একা হাতিয়ার ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম লইয়া চলতি অভ্যাস করুন। তারপর দল বাঁধিয়া সুসজ্জিত হইয়া অর্থাৎ আক্রমণ করিবার সময় যেমন দল বাঁধিবার নিয়ম বা কৌশল সেই ভাবে ক্রমশঃ বিভিন্ন কায়দায়—অর্থাৎ কখনো দল বাঁধিয়া, কখনো একা একা, কখনো ২।৩ জন এক সঙ্গে নিঃশব্দে চলিবার অভ্যাস করুন। রাস্তার উপর দিয়া, ধানক্ষেতের বা জঙ্গলের বা ঝোপের আড়ালে শুকনা পাতার উপর দিয়া—ঘাসের জমির ভিতরে, জলামাঠ পার হইয়া, খাল বিল সাঁতার দিয়া পার হইয়া চলুন। চলিবার সময়ে সেক্শন কমাণ্ডার নিজের ইউনিটের সকলের সঙ্গে পরস্পর যোগাযোগ রক্ষা করিবেন—ফিস্ ফিস্ করিয়া কাণে কাণে হুকুম বা নির্দেশ একজন হইতে অপরকে চালু করিতে হইবে।

অনেক সময় ইসারায় ইঙ্গিতে দৌড়িতে, চলিতে ফিরিতে বা বসিতে কি উঠিতে অথবা শুইয়া পড়িতে শিক্ষা করিবেন। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন নিজেদের

হাতিয়ার পরস্পর ঠোকাঠুকি হইয়া শব্দ হইয়া না যায়। অথবা সাজসজ্জাগুলি মচ্ মচ্, ক্যাচ্ ক্যাচ্, চক্ চক্ বা চন্ চন্ করিয়া না উঠে।

নরম জমিতে চলিবার সময় যে পা বাড়াইবেন প্রথমে তাহার গোড়ালি বা গুড়মুড়ো (heel) মাটিতে রাখিয়া পরে আস্তে আস্তে পায়ের সমগ্র পাতাটি জমিতে পাতিবেন। তারপর অন্য পা বাড়াইবেন—আবার অন্য পা। শক্ত জমিতে উল্টা কাজ করুন অর্থাৎ প্রথমে পায়ের পাতার অগ্রভাগ মাটিতে ফেলুন। পরে সমস্ত পা, তারপরে অন্য পায়ের পাতা ও সমস্ত পা ফেলিবেন। আঙুলে ভর দিয়া বা আলগোছে হাঁটা ইহাকেই বলে।

ঘাসের জমিতে চলিবার সময় পায়ের পাতা ঘাসের আগা পর্যন্ত তুলিয়া তুলিয়া চলুন। যে জমিতে শুকনো পাতা বা অন্য কিছু আছে যাহাতে পা রাখিলে কড়মড় বা খস্খস্ করিয়া শব্দ অবধারিত হইবে সেখানে চলিবার সময় ধারে-পাশের অন্য কোনও স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক শব্দের তালে পা ফেলিলে চলিবার শব্দ ঢাকা পড়িবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সাধারণতঃ হাতদিয়া শুকনো পাতাগুলি খানিকটা সরাইয়া নিঃশব্দে পা রাখিবার জায়গা একটু করিয়া লইতে হয়। পায়ের পাতা বা হাঁটু ডুবে এমন জলে বেপরোয়া হাঁটিলে খুব থল্থল্ শব্দ হয়, উচিৎ হইবে পা না তুলিয়া আস্তে আস্তে ডুবানো পায়ে জল কাটিয়া চলা। কোমর জলে চলিতে হইলে ইচ্ছা করিয়া আকণ্ঠ ডুবিয়া গলা দিয়া জল কাটিয়া চলা ভাল। এই সময়ে হাত নীচু করিয়া জলের তলে মাটি ছুঁইয়া ছুঁইয়া অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে।

কমাণ্ডার মাঝে মাঝে আগুন ধরাইয়া সাঙ্কেতিক আলো জ্বালাইয়া দেখিবেন আলোর আভায় শরীর বা মুখ প্রকাশ হইবার আগেই শিক্ষানবীশরা দ্রুত এবং নিঃশব্দে মাটিতে মিশিয়া শুইয়া পড়িতে পারিল কি না। যদি তাহা করিবার সময় না পায় তো যেমন ছিল তেমনি অবস্থায় একেবারে নিশ্চল হইয়া যাইবে। এবং যেই আগুন নিবিয়া গেল অমনি দ্রুত চলিতে সুরু করিবে। আলোর রশ্মির দিকে কখনই তাকাইবেন না। তাহাতে চোখ ঝলকাইয়া যাইবে। ফলে আলো নিভিবার

কয়েক মিনিট পরেও অন্ধকারে আগাইতে পারিবেন না। যে অবস্থাতেই চলিতে হউক স্থানীয় সমগ্র দলের সঙ্গে যেন যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলা হয় তাহা দেখিবেন।

রাত্রে যে-যে রাস্তা বা জমি দিয়া চলিতে হইবে, কমাণ্ডার যাত্রার প্রারম্ভেই তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া খুঁটিনাটি প্রশ্নের উত্তর দিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিবেন। দিনের বেলায় ঐ রাস্তা বা জমিগুলি আগে একটু দেখিয়া রাখা উচিৎ। ইহা ছাড়াও দিনে একজনের চোখ বাঁধিয়া দাঁড় করাইয়া দিবেন এবং আর সকলকে তাহার দিকে নিঃশব্দে অগ্রসর হইতে বলিবেন। শব্দ শুনিলেই সে সেইদিকে আঙ্গুল দেখাইবে। ইহাতে কে নিঃশব্দে উহার কত কাছে আসিয়া পৌছিতে পারে তাহা বুঝা যাইবে।

ঝোপ বা ছোট জঙ্গলের মধ্যে আগাইবার সময় হাত দিয়া আস্তে আস্তে ডালপালা সরাইয়া সরাইয়া হামাগুড়ি দিয়া চলা ভাল। তবে টান বা দোল খাইয়া কোনও লতাপাতা বা শাখা প্রশাখা যেন হাত ছাড়িবামাত্র ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া ঝপাস করিয়া শব্দের সৃষ্টি না করে বা সর্‌ সর্‌ করিয়া ঝোপের মাথা কাঁপিয়া না উঠে। যদি কোন কাঁটাতারের বেড়া পাওয়া যায় তো মাটির উপর পিঠে হাটিয়া শরীর গলাইয়া পার হওয়া দরকার। ভেরেণ্ডা বা চিতার বেড়া বাঁশের বাতা দিয়া বাঁধা থাকিলে হাত দিয়া নীচে সরাইয়া ফাঁক করিয়া প্রবেশ করুন, ডিঙ্গাইয়া ঝপ্‌ করিয়া পড়িবেন না। ঘন কঞ্চির বেড়া হইলে মাথা গলাইয়া যাওয়া সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হইয়া সন্তর্পনে ডিঙ্গাইতে হইবে।

নিঃশব্দে চলিবার একমাত্র উপায় ধাপে ধাপে পায়ে পায়ে অগ্রসর হওয়া। ধৈর্য হারাইলে বা তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিবার আগ্রহ থাকিলে চলিবে না। কখনো পা বাড়াইয়া চলিতে হয় (যাহা প্রথমেই আলোচনা করা হইয়াছে), কখনো বুকে হাটিয়া, কখনো বা হামাগুড়ি দিয়া যাইতে হয়। যখন শত্রুর লক্ষ্যে আসিয়া পড়িবার ভয় অপেক্ষা দ্রুত চলিবার আবশ্যক বেশী তখন এইরূপ হামাগুড়ি দিয়া চলিবার সময় হাত ও হাঁটুর সাহায্যে চলিতে হইবে। হাত দুখানি ঠিক যে যে স্থানে

পড়িবে হাঁটু দুখানি ঠিক ঠিক সেই সেই স্থানে স্থাপন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাতে অযথা শব্দ হইবার আশঙ্কা কম। শত্রু নিকটে থাকিলে হাতের কনুই ও হাঁটুর সাহায্যে চলিতে হইবে। শত্রু যদি অতি নিকটে থাকে তবে হাত ও পায়ের পাতার সাহায্যে হামাগুড়ি দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই অবস্থায় হাত দুটি মাথার বেশ খানিকটা আগে আগে স্থাপন করিতে হইবে। হামাগুড়ি দিবার সময় ডান বা বাঁ পার্শ্বে সরিতে হইলে দেহকে আড়াআড়ি ঘুরাইয়া না চলিয়া ধীরে ধীরে সম্মুখে মুখ রাখিয়া পার্শ্বে সরিয়া বা গড়াইয়া যাওয়াই শত্রুর দৃষ্টি এড়াইবার কৌশল।

গেরিল্লা যুদ্ধের নকল মহড়া

১। প্রহরী বসানো ও তাহাকে আক্রমণের কৌশল ঃ— প্রহরী কখনো একজন বসান উচিত নয়, সর্বদা অন্ততঃ দুইজন বা ততোধিক প্রহরী বসান উচিত। জ্যোৎস্না থাকিলে সঙ্গীন চক্‌চক্ করিবে। সুতরাং মেঘাচ্ছন্ন রাত বা কৃষ্ণপক্ষ ছাড়া রাইফেলে সঙ্গীন বসান নিষেধ। তবে গোবর বা কাদা মাখাইয়া ইহা বিবর্ণ করা যায়। প্রহরী বসাইয়া ও তাহাদের উপর আক্রমণের নকল মহড়া চালাইয়া ফলাফল লক্ষ্য করুন। প্রহরী কোন না কোন উপায়ে ঘাঁটিকে সতর্ক করিয়া দিতে চেষ্টা করিবেই। পাহারা দিবার প্রথম দিকে প্রহরীকে আক্রমণ করিতে নাই, সে যখন ক্লান্ত বা অমনোযোগী ও অসতর্ক হইবে তখনই আক্রমণ করা উচিত। আক্রমণ করার জন্য বহু কৌশল অবলম্বন করা যায়। যেমন পূর্বে সময় ঠিক করিয়া দুইদল দুইদিক হইতে একসঙ্গে যুগপৎ আক্রমণ চালাইবে। কিংবা একদল কোন প্রকার শব্দ করিয়া প্রহরীর দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ করিবে এবং ইত্যবসরে অন্যদল আক্রমণ করিবে।

দূর হইতে প্রহরী বধ করার কাজে তীর ধনুক, সড়কি বা বর্শা ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। তবে খুব সন্তর্পণে বুকে হাঁটিয়া প্রহরীর পিছনে যাইতে পারিলে ধারাল রামদা বা হেঁসো দিয়া এক আঘাতেই কাজ হাসিল হইতে পারে। কিন্তু আঘাত যাহাতে বিফল না হয়, এবং বিফল হইলে যাহাতে নিজে আত্মরক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে হইবে।

বিনা অস্ত্রে প্রহরীকে বধ করার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা যায়। পিছন দিক হইতে খুব সন্তর্পণে বুকে হাঁটিয়া যাইতে হইবে। তাহার পিছন হইতে দক্ষিণ বাহু (হাত নয়) দ্বারা গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিজের বাম হাত দিয়া ডান হাত ধরিয়া সজোরে চাপ দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ডান হাটুর দ্বারা প্রহরীর পিঠে

আঘাত করিতে হইবে। ইহাতে সে ঘুরিয়া পাল্টা আক্রমণ করিতে পারিবেনা। এই ভাবে ধরিয়া শত্রুকে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করা যায়।

দ্রুত অস্থায়ী (inprovised) উপায়ে নদী অতিক্রম করিবার কৌশলঃ—নদী পার হওয়া অভ্যাস করিবার জন্য নদীর যে স্থান সঙ্কীর্ণ সেই স্থানই মহড়ার উপযোগী। কিন্তু সম্পূর্ণ সাজ সরঞ্জাম লইয়া নদী পার হওয়া সহজ নহে। প্রথমে একজন কোমরে সরু অথচ শক্ত এবং লম্বা দড়ি বাঁধিয়া সাঁতার দিয়া পার হইবে। পরে ঐ দড়ি টানিয়া উহার সহিত যুক্ত অপেক্ষাকৃত মোটা ও শক্ত 'কাছি' হাতে আনিবে। ঐ কাছির দুই প্রান্ত নদীর উভয় পারে গাছের সহিত বা খুব শক্ত খুঁটির সহিত ভাল ভাবে এমন করিয়া বাঁধিতে হইবে যেন নদীর মাঝখানে জলের লেভেল (level) হইতে দড়ি ছয় ফুট উপরে ঝুলিয়া থাকে। এখন দড়ি ধরিয়া ঝুলিলে জলের মধ্যে শরীরের কতকটা ডুবিয়া যাইবে। ইহাতে সুবিধা এই যে জলে শরীর ডুবিয়া থাকায় অনেকটা হাল্কা বোধ হইবে ও প্রয়োজন মত অনেকক্ষণ দড়ি ধরিয়া ঝুলিতে পারা যাইবে। এই ভাবে একে একে সকলেই নদী পার হইতে পারে। সব সাজ সরঞ্জাম পিঠে করিয়া পার হওয়া যায়, অথবা পরে ঐ কাছির উপর ঝুলাইয়া টানিয়া লওয়া যায়। শিক্ষা কালীন কাছি কতটা টান করিয়া বাঁধা উচিত, বিশেষতঃ ঝুলিয়া অপর পারের কাছে আসিলে কিরূপ অবস্থা হয় তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। অপর পারে সাহায্য করিবার জন্য একজন লোক না থাকিলে জল হইতে পারে উঠা কঠিন।

নদী খুব অগভীর হইলে এইভাবে কাছি টাঙ্গাইয়া লইলে তাহা ধরিয়া পার হওয়া বেশ সুবিধা। খুব সঙ্কীর্ণ নদী বা খাল হইলে নদীর পার্শ্ববর্তী কোন বড় গাছ দেখিয়া লইবেন। তাহার পর নদীর উপরকোন ঝুলন্ত শক্ত শাখার সঙ্গে দড়ি বাঁধিয়া ঝুলিতে হইবে। তার পর ঐ দড়ি ধরিয়া দোল খাইয়া অপর পারে, লাফাইয়া পড়িলেই হইল।

নৈশ অভিযানের পাঠ

নৈশ স্কাউট ও জঙ্গী পেট্রল গঠন :—সম্পূর্ণ দলকে দুই সেকশন (section) 'ক' ও 'খ' তে ভাগ করুন, এই দুই দলকে এক বা দেড় মাইল তফাতে রাখুন এবং প্রত্যেকের স্বতন্ত্র হেড কোয়াটারস (Head Quaters) বা ঘাঁটি থাকিবে।

"ক" দলের নায়কের প্রতি নির্দেশ :—একটি পূর্ব নির্দ্ধারিত সময়ে তাহার দলকে "খ" দলের ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। দলকে জানাইবেন যে তাহারা এই মহড়ার দ্বারা স্কাউটিং (Scouting) ও নৈশ অভিযানের অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে যাইতেছে। পথে শত্রুর সাক্ষাৎ পাইলে তাহাকে আক্রমণ করিতে হইবে। না পাইলে সোজা ঘাঁটিতে পৌছিয়া অভিযান শেষ হইল ধরিয়া লইবে।

এই মহড়া বড় রাস্তা ধরিয়া করাই সুবিধা। ভবিষ্যতে উন্মুক্ত প্রান্তরেও করা চলিবে।

প্রথম স্কাউট ও দ্বিতীয় স্কাউটের মধ্যে পঞ্চাশ হইতে একশত পঁচিশ গজ ব্যবধান থাকিবে। প্রথম স্কাউট একটি ঢাকা দেওয়া টর্চ (Torch) এর সাহায্যে তাহার সঙ্গীর সহিত সংযোগ রাখিবে। টর্চের আলো যেন দেড়শত গজের অধিক দূর হইতে দেখা না যায়। [এ সমস্তের বিশদ আলোচনা "স্কাউটিং ও পেট্রলিং" পরিচ্ছেদে পাইবেন]

প্রকৃত যুদ্ধের সময় টমি গান, হাত বোমা প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হইবে। তবে শিক্ষানবীশেরা হাতে লাঠি লইবে। উভয় স্কাউটেরই নিঃশব্দে চলার জন্য পা খালি অথবা রবার সোল (rubbber sole) জুতা পরা থাকিবে। দ্বিতীয় স্কাউট মূল পেট্রল বাহিনীর প্রায় দশ গজ সামনে থাকিয়া প্রথম স্কাউট প্রদত্ত নির্দেশগুলি জানাইবে।

মাঝে মাঝে প্রথম স্কাউট টর্চ নাড়িয়া—ধরুন বৃত্তাকারে নাড়িয়া—জানাইবে যে

পেট্রল বাহিনী গতিরোধ করুক। একটু অনুসন্ধান করা দরকার, বিশেষতঃ শত্রুর কোনও শব্দ কর্ণগোচর হয় কিনা নৈশ অভিযানে ইহা লক্ষ্য করা অত্যন্ত প্রয়োজন। পুনরায় টর্চের আলো না দেখাইলে পেট্রল বাহিনী অগ্রসর হইবে না।

প্রথম স্কাউট যদি কেবল তাহার টর্চ নিভাইয়া দেয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সে শত্রুর খোজ পাইয়াছে। এবং দ্বিতীয় স্কাউট অবিলম্বে পেট্রলবাহিনীকে সতর্ক করিয়া দিবে, পেট্রলবাহিনী তদনুযায়ী ছড়াইয়া পড়িয়া আত্মগোপন করিবে অথবা আদেশ পাইলে আক্রমণ করিবে। প্রথম স্কাউট যদি ফিরিয়া পেট্রলবাহিনীতে যোগ দিতে না পারে তবে তাহার কর্তব্য হইতেছে ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে আত্মগোপন করা যাহাতে শত্রু কোন প্রকার সন্দেহ না করিয়া ফাঁদে পা দেয়। অনেক সময় দেখা যায় যে আত্মগোপনকারী স্কাউটের রাইফেল, হাঁটু বা অন্য কোন অঙ্গ ঝোপের বাহিরে রহিয়াছে, এইরূপ হইলে অন্ধকারেও শত্রুর দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা। আড়ালকে ব্যাক গ্রাউণ্ড (back ground) করিয়া তাহার রঙে পোষাকের রঙ মিলাইয়া এক হইয়া মিশিয়া যাওয়া আত্মগোপন করিবার ভাল কায়দা।

"খ" দলকেও অনুরূপ নির্দেশ দিবেন। উপরন্তু তাহারা শত্রুর সাক্ষাৎ পাইলেই আক্রমণ চালাইবে। এই মহড়া হইতে অনেকগুলি শিক্ষা লাভ করা যায়—নিঃশব্দ গতিবিধির প্রয়োজনীয়তা; অপেক্ষাকৃত নরম অংশের ব্যবহারের উপযোগিতা; হাত মুখ প্রভৃতির রঙ বিকৃত করা ইত্যাদি। তা ছাড়া ছায়ায় আশ্রয় লওয়া, লুকাইয়া থাকা,—এগুলির প্রয়োজনীয়তা ও গুণাগুণ উপলব্ধি করিতে হইবে। আর স্কাউটদেরও কতবার থামিতে হয় ও অনুসন্ধান চালাইতে হয় সে সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা জন্মিবে।

শত্রুর গোপন ঘাঁটির উপর আক্রমণঃ—"ক"দল নিজেরা আক্রান্ত হইবে জানিয়া সুবিধামত স্থান বাছিয়া লইবে ও সেখানে আত্মরক্ষার ঘাঁটি করিবে। এ উদ্দেশ্যে গোপন ঘাঁটি বসান যায় বড় রাস্তার বা মাঠের কাছাকাছি কোন বনে বা ইটখোলায় বা এই রকম কোন স্থানে।

"খ"দলকে দুই বা তিন ভাগে ভাগ করা হইবে। প্রথম দল খুঁজিতে খুঁজিতে "ক"দলের গোপন ঘাঁটি হইতে কিছু দূরে পৌছিয়া আড়ালে থাকিয়া আক্রমণ চালাইবে। এ আক্রমণ অবশ্য শত্রুকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্য। আসল আক্রমণ করিবে অন্য দল। তাহারা ঘুরিয়া শত্রুর ঘাঁটির পিছন হইতে বা যে দিক হইতে শত্রু আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা করে না সেদিক হইতে অতর্কিতে আক্রমণ চালাইবে। অবশ্য ইহারা কোন দিক হইতে কিরূপ ভাবে অগ্রসর হইবে তাহা প্রথম দলের জানা থাকিবে, নচেৎ পরস্পর শত্রু মনে করিয়া স্বপক্ষেই খণ্ডযুদ্ধ হইতে পারে। প্রথম প্রথম ইহারা শত্রুর ঘাঁটির দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবে, কিন্তু ঘাঁটির অপেক্ষাকৃত নিকটে যাইয়া তাহাদের খুব নিঃশব্দে ও সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহার জন্য ছোট ঝোপঝাড়, আগাছা ইত্যাদির মধ্য দিয়া বুকে হাঁটিয়া চলিতে হইতে পারে। ইহাদের অস্ত্র হইবে নকল টমিগান ও নকল হাতবোমা। যদি ইহারা শত্রুর ঘাঁটিকে অতর্কিতে আক্রমণ করিতে পারে তবে এই অভিযানে ইহাদের জয়লাভ হইল ধরা হইবে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য হইতেছে যে যাহারা গোপন থাকিবে, তাহাদের সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে—ইহা বুঝান। আক্রমণকারী দলের শিক্ষা হইবে কেমন করিয়া নিঃশব্দে অতর্কিতে আক্রমণ চালান যায়।

স্নাইপিং (sniping) ও দূরত্ব নির্ণয়

মডেল হইবার জন্য আটজন লোক বাছিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে তিনজন স্নাইপার হইবেন। উঁচু জমির উপর সুবিধামত স্থানে সম্পূর্ণ দলকে একত্র করিবেন। সম্ভব হইলে এই জায়গা নদী বা বিলের কাছে হওয়া ভাল। কারণ জলের উপর দূরত্ব নির্ণয় করা বেশ কঠিন।

মহড়া আরম্ভ হওয়ার অন্ততঃ একঘণ্টা পূর্বে শিক্ষককে কাজে লাগিতে হইবে। প্রথম একদিকে একজন মডেলকে (সম্ভব হইলে নদী বা বিলের অপর পারে) প্রায়

আধ মাইল দূরে বসান হইল। তারপর অপর একদিকে একজন স্নাইপারকে পঁচিশ গজ দূরে এবং দুইজন মডেলকে একশত ও তিনশত গজ দূরে রাখুন। আর একদিকে বাকী মডেল দুইজনকে দুশ' ও একশ' গজ দূরে রাখিয়া বাকী স্নাইপার দু'জনকে পচাত্তর ও চল্লিশ গজ দূরে দূরে বসান।

এদের অবস্থিতির জায়গার বৈচিত্র্য থাকিতে পারে, ধরুন কোন মডেল খড়ের জমিতে, কেউ হয়ত ঝোপের মধ্যে বা বাগানের বেড়ার আড়ালে জায়গা নিল, স্নাইপাররা চষা বা এবড়ো খেবড়ো জমি, বড় ঝোপ বা বিলের মধ্যে অবস্থান করিতে পারে। মহড়া যতক্ষণ আরম্ভ না হয় ততক্ষণ প্রত্যেক মডেল উপুড় হইয়া শুইয়া থাকিবে (prone positionএ) এবং সংকেত না হওয়া পর্যন্ত নিঃশব্দ অবস্থায় থাকিতে হইবে। কিন্তু কেহই শরীরকে সম্পূর্ণ গোপন রাখিবে না। দর্শকবৃন্দ মডেলদের আবিষ্কার করার চেষ্টা করিবে এবং ইহাতে উৎসাহ ও আগ্রহ বাড়িবে। তাহারা জড় হইলে প্রদর্শক বাঁশী বাজাইয়া বা নিশান দ্বারা প্রত্যেক লোককে আক্রমণাত্মক অবস্থায় রাখিবার আদেশ দিবেন।

সন্ধানী দলকে মডেলদের খুঁজিয়া বাহির করার জন্য দশ মিনিট সময় দিন। অনেকে হয়ত দুই একজনকে বাহির করিতে পারিবে কিন্তু অনেকেই ঠাহর করিতে পারিবে না। যদি না পারে সেও ভাল, কেননা সামান্য দূরবর্তী লোককেও নিঃস্পন্দ অবস্থায় থাকিলে ঠাহর করা কিরূপ কঠিন এ সম্বন্ধে ধারণা জন্মিবে।

এখন শিক্ষক সংকেত করিয়া সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী মডেলকে আত্মপ্রকাশ করিতে বলুন এবং অন্য লোকদের এই দূরত্ব জানাইয়া দিন। এই মডেল আত্মপ্রকাশ করিয়া পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরিয়া গেলে ব্যাপার পরিষ্কার বুঝা যাইবে। এখন পঁচিশ গজ দূরবর্তী মডেল আত্মপ্রকাশ করিবে ও পুনরায় আক্রমণাত্মক অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে মহড়া শেষ করুন।

সর্বশেষে বার (১২) জন লোককে একই দিকে যাইতে বলুন। প্রতি একশ' গজ দূরে একজনকে দাঁড়াইতে হইবে। ইহাতে প্রত্যেকেই একশ' হইতে বারশ' গজ পর্যন্ত দূরত্বের একটা আন্দাজ পাইবে। [Andrew Eliot অবলম্বনে]

নিরস্ত্র অবস্থায় আত্মরক্ষার কৌশল

১। কণ্ঠরোধ হইতে নিষ্কৃতি—পিছন হইতে শত্রু গলা টিপিয়া ধরিলে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই শেষ। কিন্তু আতঙ্কগ্রস্ত না হইয়া ডান হাত দ্বারা আততায়ীর ডান হাতের যে কোন আঙ্গুল ও বাঁ হাত দ্বারা তাহার বাম হাতের যে কোন আঙ্গুল সজোরে চাপিয়া ধরুন। এখন একসঙ্গে আঙ্গুল বাঁকাইতে চেষ্টা করুন ও জোরে ঝাঁকি দিয়া কণ্ঠ মুক্ত করিয়া নিন। কিন্তু দেখিবেন, তাহার আঙ্গুল একেবারে ভাঙ্গিয়া দিবেন না। সে ক্ষেত্রে তাহার লড়িবার ক্ষমতা থাকিবে না এবং আপনিও তাহার উপর আধিপত্য পাইবেন না। কণ্ঠমুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুদ্বেগে ঘুরিয়া মুখোমুখি দাঁড়ান। কিন্তু তাহার আঙ্গুল ভাঙ্গিয়া গেলে এ সুবিধা থাকিবে না। এখন তাহার আঙ্গুলের উপর চাপ অব্যাহত রাখিয়া হাত দু'খানি মোচড়াইতে থাকুন, যে পর্যন্ত না সে আর টান সামলাইতে না পারিয়া মাটিতে পড়ে। কিন্তু সে যেন লাথি মারিতে না পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখিবেন। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সজোরে পাঁজরে বা মুখে বা ঘাড়ে লাথি মারুন। একবার কাজ না হইলে আরও দুই একবার মারুন।

২। পেটে ঢুঁ মারার কৌশল—হয়ত আপনাকে নিরস্ত্র ও অতর্কিত অবস্থায় সঙ্গীন উঁচাইয়া শত্রু আক্রমণ করিয়াছে। সে ক্ষেত্রে ধীর মস্তিষ্কে ও বিদ্যুতের গতিতে কাজ করিতে হইবে।

বাম হাতের একপাশ দিয়া রাইফেল ধরিয়া ইহাকে শত্রুর ডানপাশে ঠেলিয়া ধরিয়া আপনার ডান হাতে শত্রুর কোমর বেড়িয়া তাহাকে সামনে টানিয়া আনুন ও ছুটিয়া জোরে তাহার পেটে ঢুঁ মারুন। ইহাতে প্রথমতঃ তার হাত দু'টি রাইফেল ধরা অবস্থায় আটকা পড়িবে এবং তাহাকে একটু বেসামাল হইতে হইবে। এবং ঢুঁ মারাতে সাময়িকভাবে সে কাবু হইবে। এই অবসরে যথাবিহিত ব্যবস্থা করুন।

৩। শত্রুর রিভলভার হইতে নিরস্ত্র অবস্থায় আত্মরক্ষা—নিরস্ত্র অবস্থায় রিভলভারের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা নিতান্ত

কঠিন কাজ। কিন্তু তবুও চেষ্টা করিতে হইবে। আততায়ী যদি পাঁচ গজের বেশী দূরে দাঁড়াইয়া আপনাকে নিশানা করে, তবে তাহার উদ্যত রিভলভারের মুখ হইতে আত্মরক্ষার সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। সে ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় কি? কেন না আগাইয়া তাহাকে ধরিবার পূর্বেই যে আপনাকে সে শেষ করিবে। অবশ্য যদি বন্দী করার চেয়ে আপনাকে নিহত করাই আততায়ীর উদ্দেশ্য হয়, তো মরিয়া হইয়া আত্মরক্ষার যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।—অন্ততঃপক্ষে ঝট করিয়া শুইয়া পড়িয়া নিমেষে গড়াইয়া স্থান পরিবর্তন করা হইবে আপনার প্রথম কাজ এবং সেই মুহূর্তে চেয়ার টেবিল বা অন্য কোনো আড়াল খুঁজিয়া তাহার পিছনে লুকোচুরি খেলিতে খেলিতে দু-চার মুহূর্ত সময়ক্ষেপ হ'তে দিন। আর আড়ালকেই আশ্রয় করিয়া বিদ্যুদ্বেগে আগাইয়া আড়াল সমেত শত্রুর উপরে ঝাপাইয়া পড়ুন। বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন।

আততায়ী আপনার খুব কাছে থাকিয়া নিশানা করিলে তাহার আক্রমণকে ব্যর্থ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। কিন্তু তাহার কোমর বা নিতম্বের উপরে পিস্তল তুলিয়া যদি আপনাকে নিশানা করিতে থাকে তবে সে ক্ষেত্রে নিতান্ত কাছে থাকিলেও আপনার বাঁচার আশা নাই বলিলেই চলে।

তবে ভাগ্যের কথা এই যে বেশীর ভাগ লোকেই পিস্তল তাহাদের সামনে খানিকটা তুলিয়া ধরিয়া নিশানা ক'রে; সে ক্ষেত্রে আপনি যদি আততায়ীর নিকটেই থাকেন তবে আপনার বাঁচিবার অনেকটা আশা আছে জানিবেন। সে আদেশ দিবে "হাত তোলো" (hands up); তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করুন। শত্রুর চোখে চোখে তাকান; সেও আপনার চোখে চোখে তাকাইতে বাধ্য হইবে। হঠাৎ বিদ্যুদ্বেগে লাথি মারিয়া তাহার হাত হইতে পিস্তল ফেলিয়া দিন এবং পা নামাইবার আগেই সেই অবস্থায় সামনে সবেগে ঝাপাইয়া তাহার পাঁজরে বা পেটে সজোরে লাথি মারুন। তখন তাহার উপরে লাফাইয়া পড়িয়া আপনার কাজ শেষ করুন। মনে রাখিবেন এই অবস্থায় আততায়ীর মুখে লাথি মারিলে ভাল ফল দর্শিবে।

বেড়াইবার সৌখিন লাঠি দিয়া আত্মরক্ষা—সঙ্গে লাঠি থাকিলে ইহার দ্বারা উপর হইতে বলিদানের ভঙ্গীতে আঘাত করিবেন না। টেনিস খেলায় যে ভাবে ব্যাক হ্যাণ্ড (back hand) ড্রাইভ (drive) মারিতে হয় সেইভাবে নীচে বামদিক হইতে উপর দিকে লাঠি চালাইয়া জোরে মুখে মারুন। অথবা খোঁচা মারিতে পারেন। খোঁচা মারিলে জোরে মুখে চোখে মারিবেন।

রুমাল দিয়া আত্মরক্ষা—আপনার কাছে একখানা রুমাল থাকিলে তাহা দ্বারাও অনেকক্ষেত্রে সাময়িকভাবে আত্মরক্ষা চলিতে পারে। ঢিল বা কোন ভারী জিনিষে রুমাল জড়ান।—বাঁধিবেন না। এখন চকিতে পার্শ্বে সরিয়া রুমাল ছুড়িয়া জোরে আততায়ীর মুখে মারুন, সঙ্গে সঙ্গে সামনে লাফাইয়া পড়িয়া আক্রমণ করুন।

ছোরা হইতে বাঁচিবার উপায়—আততায়ী ছোরা নিয়া দুইভাবে আক্রমণ করিতে পারে। উপর হইতে নীচের দিকে বা নীচ হইতে উপর দিকে সে ছোরা চালাইতে পারে।

যদি উপর হইতে ছোরা মারিবার চেষ্টা করে তবে দৃঢ় মুষ্টিতে বাম হাতে তাহার কব্জি চাপিয়া ধরিয়া তাহার হাত সজোরে মোচড়াইয়া ধরুন ও ডান হাতে তাহার কনুইতে জোরে আঘাত করিয়া (raffit punch) হাত ভাঙ্গিয়া দিন। অথবা আপনার বাম হাতের মুষ্টিতে তাহার ডান হাতে কব্জি বা একটু উপরে সজোরে চাপিয়া হাতখানিকে তাহার ডান দিকে সরাইয়া ধরুন। আর ইত্যবকাশে ডান হাত দিয়া তাহার ঘাড়ে তীব্রভাবে ঘুঁসি (raffit punch) মারুন। যদি নীচের দিক হইতে ছোরা মারার চেষ্টা করে তবে দুই হাতে তাহার কব্জি ধরিয়া হাত মোচড়াইতে থাকুন, এবং ঐ অবস্থায় ধরিয়া মুহূর্তে সাঁ করিয়া ঘুরিয়া তাহাকে আপনার পিঠের উপর দিয়া উল্টাইয়া ফেলুন। এবং তাহার পতনের সময় ঝুঁকি দিয়া বা আঘাত করিয়া হাত ভাঙ্গিয়া দেওয়া সহজ কাজ এবং তাহা করুন।

ট্যাঙ্ক ও ট্যাঙ্ক ধ্বংস

ট্যাঙ্ক যদিও অতিকায় লৌহ দানবের মতই এবং ইহার ধ্বংস করিবার ক্ষমতা খুবই বেশী তবুও সে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। একথা মনে রাখিবেন ট্যাঙ্ক মরজগতের বস্তু, এবং তাহা ধ্বংস করাও খুব কঠিন নয়। যতটা সাহস ও বুদ্ধির সঙ্গে আপনি ট্যাঙ্ক আক্রমণ করিবেন ঠিক তদনুপাতে আপনি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করার কাজেও সফল হইবেন।

ট্যাঙ্ক হইতে নিরাপদ এলাকা:—ট্যাঙ্ককে ধ্বংস করিতে গিয়া ইহার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য সব সময় আড়াল লইয়া লুকাইতে হইবে। এবং চলিবার পথে ইহার কাছাকাছি নিরাপদ স্থানে থাকা উচিত, ট্যাঙ্কের কাছাকাছি হামাগুড়ি দিয়া পৌঁছাইতে পারিলে ইহার মেসিনগানের গুলী হইতে আত্মরক্ষা করা যায়। সবচেয়ে বিপদজনক স্থান ট্যাঙ্কের সামনে দুইশ' গজ দূরে। সাধারণতঃ ইহার সম্মুখে দশ হাত ও পিছনে কুড়িহাত জায়গা নিরাপদ ক্ষেত্র।

ট্যাঙ্কের অসুবিধা:—ট্যাঙ্কের কতকগুলি অসুবিধাও আছে—(১) ট্যাঙ্কের ভিতরে জায়গা খুব কম, এবং চালকের দৃষ্টি খুবই সীমাবদ্ধ, ট্যাঙ্কের গায়ে কতকগুলি ছিদ্র দিয়া চালককে দেখিতে হয়। সুতরাং কোন লোক বা বস্তু আশে পাশে লুকানো থাকিলে ট্যাঙ্ক চালককের দৃষ্টিগোচর হয় না। রাত্রিতে সেইজন্য আরো অসুবিধায় তাহারা পড়ে। এমন কি দিনের বেলাও ধূম্র বোমা (Smoke bomb) দিয়া উহাদের কাণা করা যায়। (২) খুব কম ট্যাঙ্কই চারিদিকে সমানভাবে গুলী চালাইতে পারে। (৩) ট্যাঙ্কের উপর যে কামান এবং মেসিন গান থাকে তাহাকে বিপরীতমুখী করিতে ১৫ সেকেণ্ড সময় লাগে, সুতরাং নিরাপদ এলাকা ও মেসিন ঘুরানর এই সময় জানা থাকিলে যে কোন ক্ষিপ্রকারী, হিসাবী ও সাহসী লোক ট্যাঙ্কের কাছে যাইয়া তাহাকে মারিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে। (৪) ট্যাঙ্ক চলার সময়ে বিরাট ঘড় ঘড় আওয়াজ হয়। সুতরাং ইহার চালকেরা বাহিরের শব্দ প্রায় শুনিতেই পায় না আর অতর্কিত ভাবে সেই জন্যই ইহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয় নাই।

ট্যাঙ্কের দুর্ব্বল স্থান :—(১) চালকের মাথার উপরে ট্যাঙ্কের লোহার চাদর (কারণ ট্যাঙ্কের গায়ের ইস্পাতের চাদর অপেক্ষা ইহা অনেক পাতলা, অতএব উপরের চাদর একটি দুর্বল জায়গা) (২) চাকার চালক-খিলগুলি (Driving shokets)। (৩) গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করার রবারের চাকা (rubber wheels)। (৪) শিকলের (chain) ভর রাখার জন্য নিরেট রবারের নির্ম্মিত কতকগুলি চাকা। (৫) ট্যাঙ্কের তলপেট—অর্থাৎ তলায় পিছন দিকে ইঞ্জিনের নীচের অংশগুলি। সেইজন্য যখন ট্যাঙ্ক মরা জমির (Dead ground) উপর হইতে অপরদিকে নামিতেছে সেই সময় পিছন হইতে উহার পেটে গুলী করিতে হয়।

ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় :—কতকগুলি ট্যাঙ্কবিরোধী ব্যবস্থা নীচে দেওয়া হইল। (১) ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী রাইফেল চালান (ক) চালকের দেখিবার ছিদ্রগুলির মধ্যে এবং (খ) পেরিস্কোপের ভিতর।

(২) রবারের চাকার উপর জলন্ত পেট্রল নিক্ষেপ করা চলে।

(৩) চাকার খিলগুলির (spoke) মধ্যে মোটা লোহার শক্ত সাবল (crowbar) ঢুকাইয়া দেওয়া।

(৪) দুই চাকার মধ্যে বা চাকা ও শিকলের মধ্যে কাঁটা তারের বোঝা ঢুকাইয়া দেওয়া।

(৫) মেসিনগানের নলের মধ্যে সাবল ঢুকাইয়া দেওয়া। ইহাতে বিস্ফোরণ ঘটিয়া ট্যাঙ্ক অচল হইতে পারে।

(৬) সাবল বা হাতুড়ির দ্বারা আঘাত করিয়া মেসিন গানের নল ভাঙ্গিয়া দেওয়া বা বাঁকাইয়া দেওয়া।

(৭) পিছন বা পাশ হইতে ইহার তলে বা পাশে চাকার মধ্যে হাত বোমা মারা।

(৮) ট্যাঙ্কের উপরকার ফাঁক দিয়া আগুনে বোমা এবং আগুনে বোতল বা মলটভ ককটেল (Molotov-cocktail) ছুড়িয়া দেওয়া—ইহাতে জলন্ত তরল পদার্থ দেখিয়া ট্যাঙ্কের ভিতরকার লোক খুবই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

(৯) ট্যাঙ্কের জন্য ফাঁদ পাতা—রাস্তার চারদিকে প্রশস্ত গভীর খাদ কাটিয়া সেগুলিকে ঢাকিয়া রাখা।

(১০) ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী দল যেন আক্রমণের পরই উধাও হইতে পারে।

(১১) ট্যাঙ্ক ধ্বংস করিবার হাত বোমা সহ বেমালুম আড়ালে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হইবে।

(১২) ট্যাঙ্কের রাস্তায় তিন হাত উঁচু করিয়া পাশাপাশি দশ বারটা মোটা গাছের গুঁড়ি দ্বারা প্রাচীর তৈয়ারী করা ইত্যাদি।

ট্যাঙ্ক ধ্বংস করার কাজে সর্বপ্রধান কথা হইতেছে যে অতর্কিতে অসতর্ক মুহূর্তে আক্রমণ করা এবং ট্যাঙ্ক ধ্বংস করার কাজে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইহাকে ধ্বংস করিতে নূতন কৌশল উদ্ভাবন করিতে হইবে এবং আক্রমণ-মুখী হইতে হইবে।

ট্যাঙ্ক থামাইবার কৌশল ঃ—(১) পথে বাধার সৃষ্টি করা—পথে যে অবরোধ বা প্রাচীর খাড়া করা হইবে তাহা যথেষ্ট শক্ত না হইলে কার্যকরী হইবে না, মাঝারি ও ভারী ট্যাঙ্কগুলিকে আটকানো খুবই শক্ত, তবে অগ্রগতিতে খানিকটা বাধা প্রাপ্ত হইলেও লাভ। ট্যাঙ্কের পথ প্রদর্শক মোটর ও সাইকেল আরোহী সৈন্যদের গুলী করিয়া খতম করা দরকার। কারণ রাস্তার বাধাকে ইহারা হাত বোমা দিয়া পরিষ্কার করিয়া আগাইয়া চলে। ট্যাঙ্ক চলাচলের রাস্তায় চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের চারিদিকে প্রাচীর গাঁথিয়া মাঝখানে বালির বস্তা ও মাটী দিয়া ভরাট করিয়া ভাল বাধার সৃষ্টি করা যায়। এবং ইহার আড়ালে ট্যাঙ্ক ধ্বংসী গেরিল্লারা লুকাইয়া থাকিতে পারে।

ফাঁদ তৈয়ারী ঃ—রাস্তায় ছয় ফুট বা ততোধিক গভীর করিয়া খাদ কাটুন, রাস্তা যতটা চওড়া ইহা তদপেক্ষা একটু কম চওড়া হইবে, ট্যাঙ্ক যে দিকে যাইবে সে দিকের দেওয়াল খাড়া হইবে। এবং যে দিক হইতে আসিবে সেদিকে একটু ঢালু হইবে। তবে ট্যাঙ্ক যতটা পর্যন্ত ঢালু কোণ (৪৫°) বাহিয়া উঠিতে পারে তাহা হইতে ঢালু বেশী হইবে। খাদের মধ্যে ট্যাঙ্ক যাহাতে ঘুরিতে ফিরিতে

না পারে সে ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। খাড়া দেওয়াল যাহাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে না পারে সেই জন্য কাঠের স্লিপার বা শক্ত গুঁড়ি পুতিয়া দেওয়ালের গা'কে শক্ত করা উচিত। উপরে রাস্তার সমান করিয়া খাদকে বেমালুম ভাবে ঢাকিয়া দিতে হইবে। যেখানে ফাঁদ তৈয়ারী করিবেন সেখানে আড়াল দেওয়ার ব্যবস্থাও দেখিতে হইবে। কারণ ট্যাঙ্ক বাধাপ্রাপ্ত হইলে হাত বোমা মারিবার কালে শত্রুর বিমান সেই বাধা অপসারণ করার ভার লইবে।

উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা ট্যাঙ্ক থামান যায়। ফ্ল্যাণ্ডার্সে (ফ্রান্সে) এক অধিনায়ক দেখিলেন যে সমস্ত জিনিষপত্র লইয়া হটিতে প্রায় ২০ মিনিট সময় লাগিবে। অথচ শত্রুর ট্যাঙ্ক আসিল বলিয়া। তিনি তাড়াতাড়ি কতকগুলি সাদা চিনা মাটীর প্লেট রাস্তার পর পর সাজাইয়া দিলেন, শত্রুর প্রথম ট্যাঙ্কখানি দূর হইতে উহা দেখিয়া ভাবিল উহা মাইন, বুঝিবা পলাতকেরা তাড়াতাড়িতে উহা ঢাকিতে পারে নাই। আবার ভাবিল মাইন তো সাদা হয় না। তবে নিশ্চয়ই ঐখানে গেলেই শত্রুর কামান যাহাতে লক্ষ্য ঠিক করিয়া গোলা চালাইতে পারে সেই জন্য নিশানা দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া সে হটিল, গুলী চালাইল, তারপর অনেক ঘুরিয়া অগ্রসর হইল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব ট্যাঙ্কও ঐরূপ করাতে তাহাদের আধঘণ্টা সময় বেশী লাগিল। ইতিমধ্যে অপর পক্ষ নিশ্চিন্ত মনে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইল। আমরা অনুরূপভাবে পাকা চালকুমড়া, চুণ মাখানো তাল, কালো বা চুণ মাখানো হাড়ি, ব্যবহার করিতে পারি।

৪। এইরূপ ভাবেই কম্বল ব্যবহার করিয়া স্পেনে ট্যাঙ্ক থামান হইয়াছিল। এক গ্রাম্য রাস্তায় উচু করিয়া আড়াআড়ি তার খাটাইয়া কম্বল প্রভৃতি বাঁধিয়া দেওয়া হইল, শত্রুর ট্যাঙ্কবাহিনী আসিয়া কম্বলের পিছনে কিছুই দেখিতে পাইল না, এবং অগ্রসর হইতে সাহস পাইল না। তাহারা পিছু হটিয়া গুলী চালাইতে লাগিল। গুলী কম্বল ফুটা করিয়া চলিয়া যায়। কম্বল ও পড়ে না রাস্তাও দেখা যায় না। যতক্ষণ না গুলী লাগিয়া তার ছিড়িয়া গেল ততক্ষণ তাহাদের অগ্রগতি ব্যাহত হইয়া রহিল।

৫। ট্যাঙ্ক থামাইবার আর একটা কৌশল হইতেছে যে প্রায় আড়াই ইঞ্চি ইস্পাতের ঢালাই তার রাস্তার এপাশ হইতে ওপাশ পর্যন্ত পাঁচফুট উঁচু করিয়া ঝুলাইয়া ঢিলা করিয়া দুই মোটা গাছে মজবুত করিয়া বাধিয়া রাখা। মাঝারি ট্যাঙ্ক এই ভাবে আটকাইয়া থাকিতে বাধ্য হইবে। সেই অবসরে নিকটস্থ কোনও গর্ত বা গাছের আড়াল হইতে যে গেরিল্লা হাত বোমা ছুঁড়িবে তাহার বেশ সুবিধাই হইবে।

হাত বোমা (Hand Grenades)

গেরিল্লাদের সবচেয়ে সুবিধাজনক অস্ত্র—হাত বোমা। সঠিক পদ্ধতিতে ছুঁড়িতে পারিলে ইহার দ্বারা ট্যাঙ্কও অনায়াসে খতম করা যায়। কয়েকজন গেরিল্লা শিক্ষিত, বেপরোয়া ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলে হাত বোমার দ্বারা শত্রুর অগ্রগতি সম্পূর্ণ রোধ করিতে না পারিলেও অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য পিছাইয়া দেওয়া খুবই সম্ভব। আধুনিক যুদ্ধে সময়ের গুরুত্ব খুব বেশী। মনে রাখা উচিত ওয়াটর্ল্যুর যুদ্ধে সাহায্য আসিতে মাত্র পনেরো মিনিট দেরী হওয়াতে নেপোলিয়নের পতন হয়। আর এখনকার যুদ্ধের কৌশল হইল ব্লিৎক্রিগের (Blitzkrieg) বা বিদ্যুৎগতির কৌশল। এখন দুই, এক মিনিট বা কয়েক সেকেণ্ড সময়েরই মূল্য অনেক বেশী।

অবশ্য শুধু হাত বোমা দিয়া সফল ভাবে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তবে হাত বোমা ও মেসিনগান থাকিলে শত্রুর হাত হইতে ঘাঁটি রক্ষা করা খুব দুরূহ নয়।

হাত বোমার আকার ও ওজন বিভিন্ন রকমের। আকার ও ওজনের তারতম্য অনুসারে তাহাদের বিধ্বংসী ক্রিয়ারও তারতম্য ঘটিবে ইহা স্বাভাবিক। সিগারেটের টিনের আকারে দেড়পোয়া বা আধসের ওজনের বোমা দ্বারা অনায়াসে মানুষ মারা চলে এবং ইহা দ্বারা রসদবাহী গাড়ী জখম বা ধ্বংস করা সম্ভব। অপেক্ষাকৃত বড় আকারের বোমা, যেমন বোতলের মত দেখিতে—একসের হইতে দেড় সের

ওজনের হইলে—ইহাদ্বারা সৈন্যবাহী গাড়ী বা লরিগুলি অনায়াসেই ধ্বংস করা চলে। ট্যাঙ্ক ধ্বংস করিবার কাজে আরও বড় আকারের বেশী ওজনের হাত বোমাই কার্যকরী হইবে। এগুলির ওজন হইবে দুই সের হইতে তিন সের।

ব্যবহারযোগ্য হাত বোমা বাড়ীতেও তৈয়ার করা যায় এবং ইহাদের প্রস্তুত প্রণালীও বিশেষ কঠিন নয়। উপযুক্ত পরিমান বিস্ফোরক, টিনের কৌটা, লোহার পাইপ এবং ইহার জন্য ব্যবহৃত পলিতা সংগ্রহ করিতে পারিলে এবং বিস্ফোরক সম্বন্ধে সামান্য রকমের অভিজ্ঞতা থাকিলেই যে কোন ব্যক্তি বাড়ীতেই হাত বোমা প্রস্তুত করিতে পারে। তবে এগুলি সবসময় নির্ভরযোগ্য বা নিরাপদ নয়। এ সম্পর্কে কিন্তু এইটুকুও জানা উচিত যে যুদ্ধ মোটেই নিরাপদ বা সুখকর কি আরামদায়ক ব্যাপার নহে। যখন ফ্যাসিস্ট দস্যুর আক্রমণে সারা দেশের উপর ধ্বংসের করাল ছায়া নামিয়া আসিবে তখন ঘরে হাত বোমা তৈয়ারী নিরাপদ নয় বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা মোটেই দেশপ্রেমিকের লক্ষণ নহে। আমাদের দেশের সাধারণ মোটর দুর্ঘটনার পরিমাণ হইতে এরূপ দুর্ঘটনা নিশ্চিতই কম হইবে। আর তাছাড়া দেশের কতকগুলি কারখানাও অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে হাত বোমা প্রস্তুত করিতে পারে এবং ফ্যাসিস্ট আক্রমণের সময় সেগুলি যে আমাদের সাহায্য করিবে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তবে আমাদের বিস্ফোরক তৈয়ার করার কারখানা খুব কম। সেদিক হইতে আমাদের অসুবিধা হইবে, একথা ঠিক। কিন্তু গেরিল্লাদের নীতি হইতেছে শত্রুর অস্ত্র ছিনাইয়া সেই অস্ত্রের সাহায্যে শত্রু নিধন করা। আমাদের গেরিল্লাদেরও জাপানী হাতবোমা দিয়াই জাপানী সৈন্য মারার নীতি অবলম্বন করিতে হইবে।

হাতবোমা যে বিভিন্ন আকারের ও ওজনের হয় তাহা আগেই বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে এইগুলির দ্বারা কাজ হাসিল অর্থাৎ শত্রু ও যানবাহন ধ্বংস করিতে হইলে পূর্ব হইতেই ভাল করিয়া অভ্যাস করার প্রয়োজন। আমাদের গেরিল্লাদের হাতবোমা সম্বন্ধে প্রথম ও প্রধান করণীয় বিষয় হইতেছে ইহা ছুঁড়িবার কৌশল আয়ত্ত করা। এই কায়দা আয়ত্ত করার জন্য শ্রম ও অধ্যবসায়ের

সহিত শিক্ষা লইতে হইবে, এবং বেশ যত্ন সহকারে অভ্যাস করিতে হইবে। বিভিন্ন প্রকারের হাতবোমা লইয়া অভ্যাস করা উচিত। হাতবোমা প্রয়োগ করিয়া সফল হইতে হইলে সঠিক মুহূর্তে লক্ষ্য বস্তুর তলে নিক্ষেপ করিতে হইবে। লক্ষ্য বস্তু স্থির (static) না হইয়া গতিশীল হইতে পারে। সুতরাং লক্ষ্য বস্তুর দূরত্ব, গতি, হাতবোমা কতদূরে ফেলা যাইবে এবং ছুঁড়িবার পর উহার পড়িতে ও ফাটিতে কত সময় লাগে এইগুলির সঠিক আন্দাজ থাকা চাই—এবং সেইজন্য প্রচুর অভ্যাসের প্রয়োজন। বিভিন্ন ওজনের ইট লইয়া অভ্যাস করিতে হইবে।

লক্ষ্যভেদের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন দূরত্ব নির্ণয় করা (Distance Judging)। দূরত্ব নির্ণয় করা আবার শুধু দণ্ডায়মান অবস্থায় করিতে পারিলেই হইবে না। কারণ গেরিল্লাদের থাকিতে হইবে প্রায় সব সময়ই আড়ালে মাটী কামড়াইয়া। এবং সে অবস্থায় দূরত্ব নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং ভবিষ্যৎ গেরিল্লাদের এখন হইতেই রাস্তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কতটা চওড়া, দু'টি গাছ বা লাইট পোষ্টের মধ্যে কতটা ব্যবধান, টেলিগ্রামের খুঁটী পরস্পর কতদূরে থাকে হঠাৎ দেখিয়াই এইগুলি আন্দাজ করিয়া পরে মাপিয়া সেই আন্দাজের সঠিকতা নির্ণয় করিতে হইবে। ক্রমান্বয়ে এইভাবে অভ্যাস করিতে থাকিলে চট করিয়া যে কোন গেরিল্লা বলিতে পারিবেন যে ঐ সাইকেল আরোহী কতদূরে আছে; এবং সেই হিসাবে ট্যাঙ্ক ও সামরিক লরী দেখিয়া দূরত্ব অনুমান করিতে বেগ পাইতে হইবে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রধান কথা হইতেছে চকিতে চলমান লক্ষ্য বস্তু দেখিয়া দূরত্ব অনুমাণ করিতে হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে দাড়ান, শোওয়া, বসা প্রভৃতি যে কোন অবস্থায় এই অনুমান করায় সমানভাবে ওস্তাদ হওয়া প্রয়োজন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে হাতবোমা ছোঁড়ার সঙ্গে শোওয়া, আড়াল লওয়া, এত সব হাঙ্গামার কি প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে গেরিল্লা দলকে সব সময়ই আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হইবে। এবং সেই অবস্থায়ই আক্রমণ চালাইতে হইবে। তা ছাড়া হাতবোমা যে ভাবে খুসী ছুঁড়িলেই হয় না—উহার

বিশিষ্ট পদ্ধতি বা কায়দা আছে। সেই কায়দা অনুযায়ী না ছুঁড়িলেই হাতবোমার স্পিণ্টারে নিজেরাই খতম হইবার আশঙ্কা আছে।

সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এক পোয়া হইতে উর্ধ্বদিকে দুই বা আড়াই সের ওজনের ইট লইয়া নিম্নলিখিত ভাবে নিক্ষেপ করিয়া অভ্যাস করুন। সাধারণতঃ হাতবোমা ২৫ হাত হইতে ৫০ হাত দূর পর্যন্ত ছোড়া হয় এবং দূরত্ব ইহার বেশী হইলে হাতবোমা নিক্ষেপকারী কার্যকরিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারে না। হাতবোমা ছুঁড়িবার কায়দা দুই প্রকার :—(১) ক্রিকেট বল ছোঁড়ার মত হাত পিছন দিক দিয়া ঘুরাইয়া উপর দিকে উঁচু করিয়া নিক্ষেপ করা, আর (২) হাত নীচু করিয়া সাধারণভাবে কড়ি চালনার মত চালিয়া দেওয়া। কিন্তু হাতবোমা ক্রিকেট বল নিক্ষেপ করার মত সোজা লক্ষ্য বস্তুর দিকে অত জোরে যাইবে না। ইহা বাহুর উপর দিয়া অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে ছুটিয়া লক্ষ্য বস্তুর নিকটেই 'ধপ্' করিয়া পড়িয়া যাইবে। নীচু হাতে (under arm) ছোঁড়া সাধারণতঃ গাছের বা অন্য আড়ালে দাঁড়াইয়াই সুবিধা হয়। এবং উপর হাত করিয়া ছোঁড়া (over-arm) পরিখা হইতে বা কোন নীচু আড়াল হইতেই সুবিধাজনক। এখন এইভাবে অভ্যাস করুন :—

দাঁড়ানো অবস্থায় বাম পা সামনে আগাইয়া দিয়া পা ফাঁক করিয়া দাঁড়ান। সম্পূর্ণ দেহের ভার ডান পায়ের উপর দিয়া পিছনে হেলিয়া পড়ুন। সঙ্গে সঙ্গে ভার সাম্য (balance) রাখার জন্য বাঁ হাত উপরে উঠিবে। ডান হাতে বোমা ধরুন। এখন সমস্ত শরীরে জোর দিয়া ডান হাতখানি অর্ধবৃত্তাকারে পিছন দিক হইতে কাঁধের উপর দিয়া ঘুরাইয়া হাত বোমা উপর দিকে ছুঁড়িয়া লক্ষ্যবস্তুর নিকটে ফেলিয়া দিন। সঙ্গে সঙ্গে শরীর সামনের দিকে ঝুঁকাইয়া দুই হাতে মাটীতে ভর রাখুন। বোমা কোথায় পড়িল এটুকু দেখিয়াই মাটী কামড়ান অর্থাৎ মাটীতে মিশিয়া prone positionএ শুইয়া পড়ুন। মাটী না কামড়াইলে বোমার টুকরায় নিজেই আহত হইতে পারেন, ইহা আগেই বলা হইয়াছে। বোমা ঠিক কোথায় পড়িল এইটুকু লক্ষ্য করা দরকার বেশী। যেখান

হইতে বোমা ছুঁড়িবেন তাহার নির্দিষ্ট কয়েক গজ দূরে নির্দিষ্ট বস্তুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই অভ্যাস করিতে থাকুন। সঠিক লক্ষ্যভেদের উপর অবশ্য বেশী জোর দিবার প্রয়োজন নাই। লক্ষ্য বস্তুর এক ফুটের মধ্যে ফেলিতে পারিলেই চলে। এবং যখন প্রতি তিনবারে অন্ততঃ দুইবার লক্ষ্যভেদ করিতে পারিবেন তখন শিক্ষা কার্যকরী হইয়াছে ধরা যায়। এখন দূরত্ব ও ইটের ওজন বদলাইয়া অভ্যাস করিতে থাকুন।

চলন্ত লক্ষ্যে আঘাত করিতে হইলে সাইকেলের পিছনে পেরাম্বুলেটর কি কেরোসিন কাঠের বাক্স দিয়া তৈয়ারী গাড়ী বা খালি কেরোসিন তেলের টিন বাঁধিয়া কোন সাহসী বন্ধুকে সাইকেল চালাইয়া যাইতে বলুন, এবং পিছনের বস্তুকে মারিবার চেষ্টা করুন। সাইকেলের উপর ফেলিবেন না তাহাতে অনর্থক আরোহীর বা যন্ত্রের ক্ষতি হইতে পারে। চলন্ত বস্তুতে বোমা নিক্ষেপ অভ্যাস করার সময় একসঙ্গে অনেক ভলান্টিয়ারকে লাইন বাঁধিয়া পর পর দাঁড় করান। ইহাতে কার্যক্ষেত্রে লরী বা ট্যাঙ্ক মারিবার সময় প্রথম দুই একটি বোমা না লাগিলেও পরেরগুলি লাগিবে এ নিশ্চয়তা থাকে। লাইন রাস্তার দু'পাশে আগেপাছে করিবেন ও প্রতি দুইজন লোকের মধ্যে যেন কয়েকগজ ব্যবধান থাকে।

নীচু হাতে (under-arm) ছোঁড়াই বেশী প্রয়োজন হইবে। ট্যাঙ্কের গায়ে বা উপরে হাতবোমা ফেলা নিরর্থক। ট্যাঙ্কে কতকগুলি যে দুর্বল স্থান আছে সেই স্থানে বোমা না মারিলে ট্যাঙ্ক সহজে কাবু হয় না। এ সম্বন্ধে ট্যাঙ্কের বিষয়ে আলোচনার মধ্যে বিস্তারিত বলা হইয়াছে।

জঙ্গল যুদ্ধ

ঘন জঙ্গলে যুদ্ধ করার সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে। জঙ্গল থাকাতে সেনা-বাহিনী যেমন দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে না তেমনি আবার উহার আশ্রয়ে শত্রুর চোখের আড়ালে নির্বিবাদে অগ্রসর হইতে পারে। আমাদের বাংলা দেশের সম্পূর্ণ দক্ষিণ ভাগ এবং উত্তর ও উত্তরপূর্বভাগ বনে ও ঘন জঙ্গলে পূর্ণ। এবং সেই সব দিক হইতে জাপানী আক্রমণের সমূহ আশঙ্কা আছে। কারণ জাপানীরা জঙ্গলযুদ্ধে বিশেষ অভ্যস্ত এবং ওস্তাদ। বাঙ্গলা দেশে যদি শত্রু ঢোকে তবে দুইটি জঙ্গল যুদ্ধ বেশ জোরালো হইবে মনে হয়। যথা সুন্দর বন এলাকায় ও দার্জ্জিলিংএ ডুয়ার্সের জঙ্গল এলাকায়। সুতরাং জঙ্গল যুদ্ধ আমাদের বেশ ভাল করিয়াই রপ্ত করিতে হইবে।

আধুনিক যুদ্ধ যতই যান্ত্রিক যুদ্ধে পরিণত হউক না কেন, যন্ত্র ও যান্ত্রিক বাহিনী জঙ্গল যুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করিতে পারে না। সেদিক হইতে জঙ্গল যুদ্ধের কতকগুলি বিশিষ্টতা আছে। (১) ট্যাঙ্কগুলি যদিও জঙ্গল ভাঙ্গিয়া চলিতে পারে তবুও অনবরত জঙ্গল ভাঙ্গিবার জন্য ব্যস্ত থাকিলে তাহার আসল কাজ—পদাতিক বাহিনীর সম্মুখ রক্ষা করা হইয়া উঠে না। আর আমাদের বাঙ্গলা দেশের মাটী নরম এবং সামান্য বৃষ্টি হইলেই অধিকাংশ ট্যাঙ্ক কাদায় অনেকটা অচল হইয়া যাইবে। (২) জঙ্গল যুদ্ধে কামান, মেসিনগান, প্রভৃতিও বিশেষ কার্যকরী হইবে না। কামানের পাল্লা সাধারণতঃ ১০।১২ মাইল হয় ও মেসিনগানের পাল্লা ৩।৪ মাইল। কিন্তু বনের মধ্যে গাছপালায় মেসিনগানের গুলী বাধা পায়, তা ছাড়া জঙ্গলের মধ্যে বেশীদূর লক্ষ্য করা চলে না। এবং এইজন্য গুলী কার্যকরী হইতে পারে না। কামানের পক্ষেও একই কথা। (৩) এয়ারোপ্লেন হইতে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত সৈন্যকে খুঁজিয়া বাহির করা অত্যন্ত কঠিন। এমন কি মাত্র হাজার ফুট উপর হইতেও গাছের ছায়ায় নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিলে উড়ো জাহাজ হইতে লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যকার রাস্তাগুলি উপর হইতে ইলেক্‌ট্রো ফটোগ্রাফ সাহায্যে ধরা যায়।

সেইজন্ত গেরিল্লা দলকে এইগুলি এড়াইয়া চলিতে হইবে [ফিল্ড ক্রাফ্ট—প্রথম অধ্যায়]। জঙ্গল যুদ্ধে শত্রু দূর হইতে দেখিতে পাওয়ার সুবিধা পাইবে না। যখন খোলা প্রান্তরে যুদ্ধ হয় তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুই পক্ষের ব্যবধান থাকে কয়েক মাইল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে জঙ্গলের আড়াল পাওয়ার সুবিধা থাকায় একটু সন্তর্পণে অগ্রসর হইলে অতর্কিতে শত্রুর খুব নিকটবর্তী হইয়া তাহাকে আচম্বিতে আক্রমণ করা যায়। প্রধান কথা হইতেছে সাহস ও আক্রমণমুখী হওয়া।

বহুদিন হইতে, প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই, সেনা বাহিনীকে যুদ্ধের জন্ত যে শিক্ষা দেওয়া চলিয়া আসিতেছে, আধুনিক যুদ্ধে, বিশেষতঃ জঙ্গল যুদ্ধে, সে শিক্ষা মোটেই কার্যকরী হইবে না। প্রমাণ স্বরূপ বর্তমান যুদ্ধের উপরে জেনারেল ওয়াভেলের বক্তৃতা দেখিতে বলি। বর্তমান আরাকান অভিযানের বিফলতাও লক্ষ্যণীয় বিষয়। তা ছাড়া মালয় ও ব্রহ্মের যুদ্ধে ইহা বিশেষ ভাবেই প্রমাণ হইয়াছে যে তথাকথিত ও প্রচলিত সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত বৃটিশ বাহিনী জঙ্গল যুদ্ধে ওস্তাদ জাপ বাহিনীকে রুখিতে পারে নাই। জাপানীরা সাধারণতঃ খুব ছোট ছোট স্বয়ং সম্পূর্ণ দলে বিভক্ত হইয়া শত্রুব্যূহকে সূচীভেদের প্রণালীতে (infiltration) ভেদ করিয়া ও পাশ কাটাইয়া পিপীলিকার মত পিল পিল করিয়া মিত্র পক্ষীয় সৈন্তের পশ্চাতে আসিয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছে। জঙ্গল যুদ্ধেও তাহারা অনুরূপভাবে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া পার্শ্ব ও পশ্চাৎ হইতে অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়া মিত্রপক্ষীয় বাহিনীকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। সুতরাং একথা আমাদের ভাল করিয়া জানিয়া রাখিতে হইবে যে জঙ্গল যুদ্ধে একস্থানে ঘাঁটি বা ব্যূহ করিয়া শত্রুকে বাধা দেওয়ার নীতি অচল। তা ছাড়া বনের মধ্যে আত্মরক্ষার ব্যূহ সৃষ্টি করিতে গেলে অসুবিধা আছে। কারণ সাধারণ প্রান্তরে যে পরিমাণ সৈন্ত দ্বারা যত দৃঢ় ও গভীর ব্যূহ রচনা সম্ভব তাহা জঙ্গলে হয় না। কারণ দৃষ্টি সেখানে খুবই সীমাবদ্ধ; তাই পরস্পর সংযোগ রাখা সম্ভবপর করিতে হইলে খুব ঘন করিয়া সৈন্ত সমাবেশ করিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে অল্পসংখ্যক সৈন্ত লইয়া ব্যূহ করিলে ব্যূহের কতকগুলি স্থান দুর্বল হইয়া পড়িবে। সুতরাং সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে জঙ্গল যুদ্ধ গতিশীল (mobile) যুদ্ধ।

জঙ্গল যুদ্ধে স্কাউট ও টহলদারী সৈন্যের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। তাহাদের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি দুইই সুতীক্ষ্ণ হওয়ার প্রয়োজন। তাহাদের দৃষ্টি সুদূর প্রসারী হওয়া প্রয়োজন। কোন খুঁটিনাটিও তাহাদের চক্ষু এড়াইলে চলিবেনা। কোথাও গাছের ছোট একটি ডাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, হয়ত শত্রুর পায়ের চাপে ছোট আগাছা-গুলি বেঁকিয়া গিয়াছে এগুলি সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহাদের অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু হইতে হইবে। হয়ত গাছের ডালে ঘন্টার পর ঘণ্টা ঝুলিয়া থাকিতে হইবে। অনেক সময় গাছের ডালে পাখীরা শত্রুর অস্তিত্ব জানাইয়া দেয়। সুতরাং পাখীদের বিভিন্ন প্রকারের চিৎকার ও ডাকের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারা দরকার। তাছাড়া জঙ্গলে দিগভ্রম হইবার সমূহ আশঙ্কা। সেজন্য বনের মধ্যে যাহাতে পথ বা দিকভুল না হয় সে শিক্ষাও লইতে হইবে। অবশ্য এক্ষেত্রে কম্পাসই (compass) সবচেয়ে নির্ভর যোগ্য। কিন্তু গেরিল্লাদের যন্ত্রপাতি খুব কমই থাকিবে। সুতরাং এইসব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ শিকারী বা স্থানীয় গাইডের শরণ লওয়া ছাড়া উপায় নাই।

জঙ্গল যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। যোদ্ধাকে সর্বদা অকুতোভয়, আত্মবিশ্বাসী ও সহিষ্ণু হইতে হইবে। ধৈর্য হারাইলে কখনও চলিবেনা। সর্বোপরি প্রগাঢ় দেশপ্রেম, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অবিচলিত সাহস আর শত্রুর প্রতি অমানুষিক ঘৃণা প্রয়োজন।

বনের মধ্যে শত্রু অন্বেষণের প্রণালী:—জনকয়েক লোক বনের মধ্যে লুকাইয়া অবস্থান করুক। ইহারা বনের একদিকে একদল লোক লুকাইয়া রাখুক। বন ঘেরাও করিয়া খোঁজ আরম্ভ হইলে পলায়নপর শত্রুকে এইদিক দিয়া পলাইতে হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করুন। তখন ইহারা শত্রুকে গুলী করিবে। তাহাদিগকে বেশ ছড়াইয়া থাকিতে হইবে এবং কোন ভাল আড়াল লইতে হইবে, নচেৎ স্বপক্ষের সন্ধানীদলের গুলী খাইবার আশঙ্কা আছেই। যদি ঐদিকে জমি সমতল হয় তবে তাহাদের বনের প্রান্তভাগে ঢুকিয়া গাছের আড়াল লইতে হইবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সন্ধানী দলকে তাহাদের অবস্থিতির স্থান জানাইয়া দিবেন।

এখন সামান্য কয়েকজন সন্ধানী অগ্রসর হউক, কিন্তু তাহাদের আগেই কয়েকজন স্কাউট পাঠান উচিত। তবে শিক্ষিত কুকুর থাকিলে স্কাউটের কাজ তাহাদের দ্বারাই চলিবে। এই ছোট দলের অনুসরণ করিয়া চলিবে আসল সন্ধানীদল। সন্ধানীদল আঁকাবাঁকা লাইন করিয়া অগ্রসর হইবে। কিন্তু লাইন যেন অল্পবিস্তর সজ্ঘবদ্ধ থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, না হইলে নিজেদের গুলীতে শত্রুর পরিবর্তে নিজেরাই হতাহত হইবে। সে দিক দিয়া স্কাউটদের অবশ্যই বিপদের আশঙ্কা আছে, কিন্তু বেশী নয়। এইটুকু ঝুকি লইতেই হইবে! এ অন্বেষণের কাজে সন্ধানীদল, বিশেষ করিয়া স্কাউটদের যে খুব সন্তর্পণে ও নিঃশব্দে চলিতে হইবে এ বলাই বাহুল্য। জঙ্গলের মধ্যে স্কাউটরা সাধারণতঃ পিছনের দল হইতে দশ কি বারো গজ ব্যবধান রাখিবে, তাহা না হইলে স্কাউটদের সঙ্কেত পিছন হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। ইহাতে সুবিধা এই যে শত্রুর সন্ধান পাইলে স্কাউটগণ ফিরিয়া দলে যোগ দিতে পারে এবং সকলে পরামর্শ করিয়া উপায় বাৎলাইতে পারে। সম্ভব হইলে শত্রুর সন্ধান লইয়া স্কাউটদের সন্ধানীদলে যোগ দেওয়া উচিত।

এখন সমস্ত দলটাই হাত বোমা লইয়া ও সঙ্গীন উঠাইয়া এক লাইনে অগ্রসর হইতে পারে কিংবা লাইনে বেঁকিয়া ধীরে ধীরে শত্রুকে ঘেরাও করিয়া ফেলাও সুবিধাজনক। অনেক সময় কয়েকজন টমি গান ও হাত বোমা প্রভৃতি দিয়া আগে পাঠানই ভাল। কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত তাহা কার্যক্ষেত্রেই বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হইবে।

আসল যুদ্ধের সময় বন হইতে শত্রুকে নির্মূল করা অনেকক্ষেত্রে বিপদজনক হইবে, সেরূপ অবস্থায় শত্রুকে হাতে না মারিয়া ভাতে মারিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করাই ভাল। কিন্তু শত্রু এরূপ ক্ষেত্রে বেপরোয়া আক্রমণ চালাইতে পারে এবং সে জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এইজন্য এবং শত্রুকে তাড়াতাড়ি নির্মূল করার প্রয়োজন হইয়া পড়িলে নিম্নলিখিত উপায় কার্যকরী হইতে পারে:—

প্রথমে দুই বা তিনজন খুব অভিজ্ঞ এবং ওস্তাদ স্কাউট পাঠান হউক। ইহারা গাছে চড়িয়া বা অন্য কোন উপায়ে শত্রুর খবর আনিয়া দিবে। ইহাদের দৃষ্টিশক্তি খুব

তীক্ষ্ণ হওয়া চাই। তাহা না হইলে শত্রুর ঘাঁটি খুঁজিয়া পাওয়া ইহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বনের অন্ধকারে ও গাছপালায় দৃষ্টি ব্যাহত হয় বলিয়া ইহাদের অনেক সময় শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইবে। ইহারা ফিরিয়া যে সংবাদ দিবে সেই সংবাদ অনুযায়ী যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা চলিবে। তবে সর্বদা মনে রাখা দরকার যে শত্রু যেন ঘুণাক্ষরেও ইহাদের গতিবিধি জানিতে না পারে।

নীচে জাপানীদের জঙ্গল যুদ্ধের কতকগুলি কৌশল দেওয়া হইল। খবরগুলি রয়টার প্রদত্ত, সাধারণ খবরের কাগজেই এগুলি বাহির হইয়াছিল। তবু খুব অল্প লোকেই এগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু আগে জঙ্গল যুদ্ধের প্রকৃতি সম্বন্ধে যেটুকু লেখা হইল সেটুকু পড়িলেই এই খবরগুলির বৈশিষ্ট্য অধিকাংশ ব্যক্তির নিকটেই সুস্পষ্ট হইবে।

নিউগিনি ৮।৯।৪২

মিত্রবাহিনীকে প্রায় 'অদৃশ্য' (invisible) জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করিতে হইতেছে। এই যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ একটি সামরিক ঘাঁটি হইতে দেওয়া হইয়াছে।

(১) রাজকীয় অষ্ট্রেলিয়ান বাহিনীর সৈন্যদের অত্যন্ত ঘন জঙ্গলের মধ্যে অগ্রসর হইতে হয়। এই জঙ্গল এত ঘন যে দেড় বা দুই হাতের বেশী নজর চলে না। (২) বনের মধ্যে মাটি অত্যন্ত পিছল। মাঝে মাঝে চট্‌চটে কাদা এবং গাছের শিকড়ে হোঁচট খাইতে হয়। ইহার মধ্য দিয়াই সৈন্যদের অতি সন্তর্পনে ছড়াইয়া পড়িয়া অগ্রসর হইতে হয়। এই বনের চারিদিক ভীষণ নিস্তব্ধ। গাছের ছোট একটি ডাল ভাঙ্গার শব্দ, কি এক ফোঁটা বৃষ্টির জল পড়ার শব্দেই চমকাইয়া উঠিতে হয়—এই বুঝি জাপানী ঝাঁপাইয়া পড়িল। (৩) বেশীর ভাগই হয় হাতাহাতি যুদ্ধ; গুলী ছোঁড়ার সময় দুই পক্ষের

ব্যবধান থাকে দশ গজের বেশী নয়। (৪) জাপানীরা প্রায়ই নৈশ আক্রমণ চালায়। আর বৃষ্টি হইলে তাহারা সুবিধা পায় এবং খুসী হয়। কারণ তাহা হইলে বৃষ্টির শব্দে তাহাদের চলাফেরার শব্দ চাপা পড়িয়া যায়।

লিবিয়ার যুদ্ধ-ফেরত অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্তরা জার্মান সৈন্য অপেক্ষা জঙ্গল যুদ্ধের উপযোগী সবুজ পোষাক পরা জাপানীদেরকে বেশী পৈশাচিক প্রকৃতির বলিয়া মনে করে।

(৫) জাপানীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমন কি দিনের পর দিন দাঁত বাহির করিয়া মরার মত পড়িয়া থাকে। কিংবা গাছের ডালে ঝুলিয়া থাকে, এই আশায় যে হয়ত একজন অষ্ট্রেলিয়ান টহলদারী সৈন্যকে খতম করিতে পারিবে।

সিডনী ১২ই সেপ্টেম্বর '৪২।

সিডনীর 'সানডে সান' (Sunday Sun) পত্রিকা লিখিতেছেন: জাপানীদের রণ কৌশলকে প্রতিরোধ করিতে হইলে আমাদের সামরিক কৌশল সম্বন্ধে যে ধারণা আছে তাহার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। আমাদের জাপানীদের অপেক্ষা বেশী কৌশলী হইতে হইবে, (৬) সূচীভেদের প্রণালী (infiltration tactics) তাহাদের চাইতে অনেক ভাল ভাবে শিখিতে হইবে। এবং (৭) সর্বদা আক্রমণমুখী হইয়া প্রথম আঘাত হানিতে হইবে।

সামরিক ঘাঁটি হইতে প্রেরিত এক রিপোর্টে বিশেষ জোরের সঙ্গে বলা হইয়াছে যে (৮) অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্তেরা আত্মগোপন করিবার (Camouflage) কৌশল ও কায়দা এখনও ভাল আয়ত্ত করিতে পারে নাই। রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে অষ্ট্রেলিয়ানরা মালয় ও ব্রহ্মের যুদ্ধে যে শিক্ষা পাইয়াছে সেগুলি সম্পূর্ণভাবে তাহাদের সামনে রাখা সত্ত্বেও তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতেছে না বা ব্যবহারের সুবিধা করিয়া উঠিতেছে না। (৯) এমন

কি এখনও তাহাদের স্বয়ং সম্পূর্ণ দলে বিভক্ত হইয়া শত্রুর পার্শ্ব ও পশ্চাৎ আক্রমণ করিয়া বিপন্ন করা অপেক্ষা এক স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিয়া ব্যূহ রচনার দিকে ঝোঁক বেশী।

নিউগিনি, ১৬ই সেপ্টেম্বর।

(১০) নিউ গিনিতে অষ্ট্রেলিয়ানদের সঙ্গে জাপানীরা যে কৌশলে যুদ্ধ করিতেছে তাহা অনেকটা লুকোচুরি খেলা। ব্রিসবেন (অষ্ট্রেলিয়া) সহরে প্রত্যাগত আহত অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যরা এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছে। প্রকাশ যে জাপানীরা হঠাৎ অদ্ভুত শব্দ করিয়া অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যদের চমকিত ও আতঙ্কগ্রস্ত করার চেষ্টা করে। এই শব্দ না করিলে অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যেরা জাপানীদের অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারিত না। কারণ (১১) জাপানীদের সাজ পোষাক আত্মগোপন থাকিবার পক্ষে এত উপযোগী এবং তাহারা আত্মগোপন (Camouflage) করায় এত ওস্তাদ যে কয়েক হাত দূর হইতে যদি উহারা সন্তর্পণে আক্রমণ করে তাহা হইলে টের পাইবার উপায় নাই।

নদীযুদ্ধ

খবরের কাগজে যারা যুদ্ধের খবর মনোযোগ দিয়া পড়েন তারা রুশ রণক্ষেত্রে যুদ্ধ সম্বন্ধে দু'টি নাম বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন—'ডন' আর 'ভলগা'। ফ্রান্সের যুদ্ধ সম্পর্কেও একটা নাম খুব বেশী শুনা যাইত, সেটা 'রাইন'। যাঁরাই ভূগোলের খানিকটা খোঁজ খবর রাখেন, তারাই জানেন যে এগুলি নদীর নাম। স্পষ্ট করিয়া এই কথাটাই বলা হইতেছে যে আধুনিক যুদ্ধে নদীর এক প্রধান ভূমিকা রহিয়া গিয়াছে। ব্রহ্ম ও মালয়ের যুদ্ধের খবরেও লক্ষ্য করিয়াছি—পেনাং, টাঙ্গু, সালুইন, চিন্দুইন, ইরাবতী প্রভৃতি নদীগুলি বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। আমাদের বাঙ্গলা দেশ বিশেষতঃ পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ নদীমাতৃক। অসংখ্য নদী তাহাদের ধারায় যেমন ভূমিকে উর্বরা করিয়াছে তেমনি যাতায়াতের সুবিধাও করিয়াছে। বাঙ্গলা দেশের নগর বা বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি প্রায়ই নদীর তীরে। আর নদীর দুই তীরই সাধারণতঃ ঘন-অধ্যুষিত। সুতরাং রাস্তা ঘাটও সেই অঞ্চলেই ভাল। সেইজন্য শত্রুর আক্রমণ প্রথম এইদিকেই কেন্দ্রীভূত হইবে ইহা স্বাভাবিক। বাঙ্গলা দেশ বিশেষতঃ দক্ষিণ বঙ্গে নদীগুলি অসংখ্য ধারায় বিভক্ত হইয়া জালের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনাও এদিক দিয়া সমধিক। সুতরাং নদীযুদ্ধ এখানে হইবেই। গেরিল্লাদলকেও এ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান রাখিতে হইবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

ঘন জঙ্গল যেমন যুদ্ধের পক্ষে সুবিধা ও অসুবিধা দুইই সৃষ্টি করিতে পারে তেমনি নদীও আমাদের এবং শত্রুর সুবিধা ও অসুবিধা দুইই সৃষ্টি করিবে। নদীর গতিপথ সব দেশেই সোজা নয়—আঁকাবাঁকা। কিন্তু একটু মন দিয়া লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় উৎপত্তি স্থান হইতে মোটামুটি একদিকে প্রবাহিত হইয়া নদী গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়াছে। যেমন আমাদের বাঙ্গলা দেশে অধিকাংশ নদী উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখী। নদীর এই গতিপথের সহিত রণক্ষেত্রের সম্মুখ মহড়ার (front line) সম্বন্ধ অনুযায়ী নদী সৈন্যদলের সুবিধা, অসুবিধা বা বাধা সৃষ্টি করিবে।

নদীর গতিপথের সহিত ফ্রণ্ট লাইনের অবস্থান অনুযায়ী যাতায়াত, সৈন্য ও রসদ আমদানি, সৈন্য চালনা প্রভৃতি কাজে নদীর সাহায্য লওয়া যায়। নদীকে যদি সম্মুখ মহড়ার সমান্তরাল (parallel to front line) ভাবে পাওয়া যায় তাহা হইলে ডান ও বাম যে কোন দিকে ইচ্ছামত রসদ ও সৈন্য চালনা করা যাইতে পারে। আধুনিক যুদ্ধে রণক্ষেত্রের পশ্চাৎস্থিত যাতায়াতের ব্যবস্থাগুলি যথা রেল-লাইন ও রাস্তা মোটেই নির্ভরযোগ্য নহে, বোমারু বিমানের সাহায্যে শত্রু অনবরতই এই যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিন্ন করিবে ও করার চেষ্টা করিবে, কিন্তু হাজার বোমা বর্ষণ করা সত্ত্বেও নদীর গতিপথ কোথাও রুদ্ধ করা যাইবে না। সুতরাং নদীর উপর আধিপত্য থাকিলে নির্বিবাদে রসদ, গোলা, গুলী ও সৈন্য আমদানি ও চালনা করা যাইবে। স্ট্যালিনগ্রাদে যে যুদ্ধ হইতেছিল সেখানে ইহার দৃষ্টান্ত বর্তমান। রুশসৈন্যগণ ভল্‌গা নদীতে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া ভল্‌গার সাহায্যেই ক্রমাগত সৈন্য ও সমরোপকরণ আনাইয়াছে, এবং দেখিয়াছি জার্মানরা বিমানের উপর আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও এই সমরোপকরণ আমদানি বন্ধ করিতে পারে নাই। বরঞ্চ ভল্‌গা নৌবাহিনীর (Volga flotilla) গানবোটগুলি স্ট্যালিনগ্রাদ রক্ষায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

কিন্তু বিপদ আছে ; একবার যদি শত্রুবাহিনীর কোন দল আমাদের আত্মরক্ষার ব্যূহভেদ করিয়া নদী অতিক্রম করিতে পারে তাহা হইলে এই দ্বিখণ্ডিত আত্মরক্ষা-কারী বাহু দুইটির যে কোনটি প্রধান ঘাঁটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। এবং এই দুই অংশের মধ্যেও যোগাযোগ থাকিবে না। ফলে একটি বাহু সম্পূর্ণ অচল ও অকর্মণ্য হইবে। জাপানীরা ব্রহ্ম ও মালয়ের যুদ্ধে বৃটিশবাহিনীকে এইভাবে নদীর সমান্তরাল ভাবে দাঁড় করাইয়া যুদ্ধ করিয়াছে। এবং তাহাদের চিরাচরিত নীতি সূচীভেদের প্রণালীতে ব্রিটিশবাহিনীর পশ্চাৎ ও পার্শ্বদেশ বিপন্ন করিয়াছে। খুব সম্ভব বাঙ্গলা দেশেও তাহারা একই নীতি অবলম্বন করার চেষ্টা করিবে।

নদীর গতিপথ যদি সম্মুখ মহড়ার সমান্তরাল না হইয়া লম্বভাবে (per-

pendicularly) উহাকে ভেদ করিয়া যায় তাহা হইলে নদীর সাহায্য আরো ভালভাবে ও নির্বিবাদে গ্রহণ করা চলে। এবং নদী যদি কতকগুলি ধারায় বিভক্ত হইয়া পরস্পর সমান্তরাল হইয়া লম্বভাবে ফ্রণ্ট লাইন ভেদ করিয়া যায় তাহা হইলে আরও সুবিধা। দক্ষিণ বঙ্গে নদীগুলির গতিপথ এইভাবে ব্যবহার করার উপযোগী।

যুদ্ধে নদীর ব্যবহার হইতে পারে—শত্রু ব্যূহ ও নিজস্ব ব্যূহের ব্যবধানে প্রাকৃতিক বাধারূপে। নদী খুব বিস্তীর্ণ হইলে বা স্রোত যদি খুব প্রখর হয় তবে বাধা সৃষ্টির কাজ ভালই হইবে। আরও সুবিধা এই যে অনতিক্রমনীয় বাধা স্বরূপ না হইলেও নদী অতিক্রম করিতে গেলেই শত্রু আমাদের গোলাগুলীর হাত হইতে আত্মরক্ষার কোন আড়াল পাইবে না। উপরন্তু নদীর উভয় পার সমান উচু থাকে না। উচ্চতর তীরে যদি আমরা আশ্রয় লইয়া থাকি তবে তাহার আড়ালে শত্রুর অলক্ষ্যে সৈন্য চালনার সুবিধা আমরা পাইব। প্রস্তরের মধ্যে পরিখার আশ্রয়ে এবং জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ আক্রমণে শত্রু আমাদের বিপর্যস্ত করিতে পারে, কিন্তু দুই পক্ষের মাঝখানে নদী থাকিলে শত্রু কখনই অতর্কিত আক্রমণ চালাইতে পারিবে না।

অবশ্যই নদী যে বাধা সৃষ্টি করে তাহা দুরতিক্রম্য নয়। সেতু বন্ধন বা অন্য উপায়ে—নৌকাযোগে—শত্রু নদী পার হইয়া আসিতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে নদীর যে কোন স্থান এই কার্যের যোগ্য নহে। কতকগুলি বাছাই করা সঙ্কীর্ণ স্থানেই ইহা করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে এই স্থানগুলি আক্রমণ করিয়া শত্রুর চেষ্টা বিফল করিয়া দেওয়া যাইবে।

কিন্তু মামুলি বাধা সৃষ্টি করিলেও আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধে নদীর বাধা খুবই সামান্য। শত্রুর যদি প্রচুর বিমান বাহিনী থাকে তবে নির্বিচারে বোমাবর্ষণের দ্বারা আত্মরক্ষী বাহিনীকে বিপর্যস্ত করিয়া শত্রু অনায়াসে নদী অতিক্রম করিতে পারে। তাহা ছাড়াও শত্রু (বিশেষ করিয়া জাপানীরা) সূচীভেদের নীতিতে ছোট ছোট দলে রবারের নৌকায় করিয়া শরবন, ঝোপ প্রভৃতির আড়ালে রণক্ষেত্রের সীমানা

অতিক্রম করিয়া কোন্ স্থানে নদী অতিক্রম করিবে এবং সেখান হইতে ক্রমশঃ ভিতরে ঢুকিয়া আত্মরক্ষী বাহিনীর পশ্চাতে কি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবে, তাহা কে বলিবে? মালয় যুদ্ধে জাপানীরা কুম্ভীরপূর্ণ নদীতে ও স্থানে-অস্থানে সাঁতরাইয়া পার হইয়াছে, এবং যেখান হইতে আক্রমণের আশঙ্কা সব চেয়ে কম সেই দিক হইতে অতর্কিতে আক্রমণ চালাইয়াছে। সিঙ্গাপুর অধিকার করার জন্য তাহারা নৌকাযোগে অনুরূপ নীতি অবলম্বন করিয়াছিল।

একথা হয়ত মনে হইতে পারে যে তাহা হইলে নদীর বা নদীযুদ্ধের সার্থকতা কি রহিল? সত্য সত্যই নদীকে প্রকাণ্ড বাধা বলিয়া শত্রুরা গণ্য করিবে না। কিন্তু নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে অগ্রসর হইতে হইলে শত্রুর গতি কতকটা ব্যাহত হইবেই। আর নদীর অসংখ্য স্রোত ধারা যদি সমস্ত দেশকে জালের মত বেষ্টন করিয়া থাকে সেখানে শত্রুর পথভুল হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা বর্তমান। এবং সেখানেই বাঙলার গেরিলাদের সুযোগ। এই স্রোতধারার প্রত্যেকটি তাহাদের নখদর্পণে রহিবে। নদীর কোন বাহু দিয়া হঠাৎ আসিয়া শত্রুকে অতর্কিত আক্রমণে বিধ্বস্ত করিয়া কোন পথে গেরিলাবাহিনী উধাও হইয়া যাইবে শত্রু ধারণাও করিতে পারিবেনা। পদ্মার কোথায় নূতন চর পড়িয়াছে, কোন চরের শরবনে লুকাইয়া থাকিলে শত্রু তাহার পার্শ্ব বা পশ্চাৎ অরক্ষিত অবস্থায় আমাদের দিকে ফিরাইতে বাধ্য তাহা আমাদের গেরিলারা যেমন জানিবে জাপানীরা তেমন জানিবেনা। সেইখানেই আমাদের সুবিধা। বাঙালার মত অজস্র স্রোতধারাপুষ্ট অসংখ্য শাখায় পরস্পর সম্মিলিত নদীবহুল আর কোন দেশে আধুনিক যুদ্ধ মোটেই ঘটে নাই। সেদিক হইতে আমাদের দেশে আমাদের গেরিলারা নদী যুদ্ধের কোন অভিনব কৌশল আবিষ্কার করিয়া শত্রু মিত্র সকলেই চমকিত করিবে কিনা কে বলিতে পারে?

পুস্তক-পঞ্জী

(1) People's War by Epstein. (2) Scorched Earth by Edgar snow. (3) Red star over China by Do. (4) We are Guerrillas—People's Publishing House Bombay. (5) We are Guerrillas—letters by So-lui to "People's War" weekly organ of the Communist Party of India. (6) New ways of war by Wintringham. (7) Freedom is our weapon by Do. (8) Armies of free men by Do. (9) Deadlock war by Do. (10) Politics of victory by Do. (11) Art of Guerilla Fighting and Patrol by Alfred Kerr. (12). Home guard warfare by John Langdon—Davies. (13) Home guard Encyclopaedia by Andrew George Elliot. (14) Shooting to kill by Do. (15) Home guard for victory by Hugh Slater. (16) War into Europe by Do. (17) Infantry Training Manual Published by His Majesty's Govt in England. (18) Home guard Manual of Camouflage by Roland Penrose. (19) Fifth Column by John Langdon—Davies. (20) Russia Resists by Pat Sloan. (21) Soviet German Strategy & Tactics Published by Hutchinson & Co. (22) "We made a Mistake"—Zacharoff. (23) How the Soviet People fight by Soviet writers. (24) With a Soviet unit by Polyakov (25) Writer's class Notes at Punjab Guerrilla camp dictated by Military Trainers. (26) Small Arms Manual by Lt. Colonel J. A. Barlow. (27) War of Liberation People's Pub. House Bombay. (28) North China Front by James Bertram. (29) China fights for freedom

by Anna louise Strong. (30) China fights for the word by Andersson. (31) China fights back by Agnes Smedly. (32) Red Army Marches by Do. (33) Inside Red China by Nym Wells, China builds for Democracy by Do. (34) Military strength of the powers by Max Werner. (35) Military Power of the Marhattas by Dr. S. N. Sen. (36) গরিলা যুদ্ধ ও বঙ্গদেশ by শিবশঙ্কর মিত্র। (37) ২০শ সংখ্যা "জনযুদ্ধে" শি. শি. মিত্রের প্রবন্ধ। (38) ফ্যাসিজম্ ও জনযুদ্ধ by বিনয় ঘোষ। (39) আধুনিক যুদ্ধ by ভবেশ রায় ও নরেন্দ্রনাথ সিংহ। (40) বিপ্লবী চীন by সুধাংশু লাল দাশ গুপ্ত। (41) Articlcs in Picture Post by Tom Wintringham. (42) China At war. (43) Asia (44) China after 5 years of war published at Chunking. (44) এ যুগের যুদ্ধ by Gopal Halder. (45) Home guard Trainers' Manual. উৎসাহী পাঠকের জন্য নিম্নলিখিত বইগুলির নাম উল্লেখ করা হইল :—

(1) Principles of war by Marshal Foch. (2) The Great Crisis by Winston Chvrchill. (3) Aftermath by Do. (4) Truth about the Peace Treatics by Lloyd George. (5) War Memoirs in 4 vols. by Do. (6) Memoirs of the great war in 4 Vols. by Ludendorff. (7) Memoirs by Hindenburg. (8) History of the world war by Liddel Hart. (9) Seven Pillars of wisdom by Colonel Lawrence. (10) WIth Lawrence in Arabia by Lowell Thomas, Pub. Hutchinson & Co. (11) Future of Infantry by Liddel Hart. (12) Blitzkrieg by F. O. Miksche. (13) Battle for world Power by Max Werner.

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হইবে
৪৪	৩য়	(৩)	(৩) কুষ্টি মূলক।
৪৭	১০ম	তিন লাইনে,—(বাঁ)	তিন লাইনে, লাইন (বাঁ)
৪৭	১১শ	জোরো	জোরে
৪৭	২৩	Turning or move	Turning on move
৪৭	২৪	marching in a time	marching in a line
৪৮	১৩	ইহার ড্রিল	ইহার উল্টা ড্রিল
৪৮	১৮	আশা	আসা
৪৯	১২	ভাঙিয়া	ভাঙুন
৪৯	১৩	উপর হইবে	নিম্নদেশ পর্যন্ত লইতে হইবে
৪৯	১৪	আবার হাতখানি	আবার অন্য হাতখানি
৪৯	১৬	লওয়ার	লওয়ার
৪৯	২৩	যখন সৈন্যের	যখন নিজ সৈন্যের
৪৯	২৫	অনুপ্রান্থিক	আনুপ্রান্থিক
৫০	২২	অগ্রসর হওয়া	অগ্রসর হওয়া ইহাকেই বলে
৫১	২১	সরু	সুরু
৫৩	২৩	টান	টাল
৫৪	৭	high part position	high port position
৫৫	১৯	বন্দুনে	বন্দুকের
৫৬	৬	refl	rifle